ওঁ তৎ সৎ

৯ম সংখ্যা

আর্য জ্যোতি

অক্টোবর-ডিসেম্বর'২৪

২০৮১ বিক্রমাব্দ,১৪৩১ বঙ্গাব্দ(কার্তিক-পৌষ)

বাংলাদেশ অগ্নিবীর ত্রৈমাসিক অনলাইন পত্রিকা

আর্ষ জ্যোতি

বাংলাদেশ অগ্নিবীর প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ই-পত্রিকা

৯ম সংখ্যা

স্বাধ্যায় প্রকাশনী

বিষয়সূচি

ক্রমিক - বিষয় - পৃষ্ঠা সংখ্যা

১.চার বেদের প্রথম মন্ত্র ও তাদের অর্থ - ৪

২. প্রকৃত দেবী-ভক্তের দেহে কী "মায়ের" আগমন সম্ভব ? - ৬

৩. ঈশ্বর কে ? -৭

৪. ঈশ্বর নিরাকার হলে বেদ ঈশ্বরের বাণী হয় কীভাবে ? - ১১

৫. ভূত-প্রেত-রাক্ষস-ডাইনি-অসুর- এই সবের কী অস্তিত্ব রয়েছে ? এর থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব? - ১৪

৬. মহর্ষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে নারীদের অধ্যাপিকা হওয়ার স্বাধীনতা -১৫

৭. বেদ ও বৈদিক যুগে প্রতিমাপূজা সম্পর্কে গবেষকদের সিদ্ধান্ত - ১৭

৮. সনাতন ধর্মে বউদির মর্যাদা - বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে -৩৩

৯. শ্রদ্ধার মাহাত্ম্য - ৩৩

১০. শ্রাদ্ধ মীমাংসা - ৩৯

১১. বেদানুসারে আপনার প্রকৃত বন্ধু কে ? -৪৯

১২. রাবণের দশ শিরের রহস্যভেদ -৫০

১৩. কেমন ছিলো মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের রামরাজ্য? -৫২

১৪. আত্মা কি এক না অনেক? -৫৩

১৫. কোনও জীবকে হত্যা করা পাপ, কিন্তু মশা- মাছি-কীট ইত্যাদির হত্যা করায় কোন পাপ হয় ? -৫৩

১৬. সত্যার্থ প্রকাশ তথা অন্য মতের আলোচনা - ৫৫

১৭. অগ্নিহোত্রে আজ্যাহুতি মন্ত্র এবং অষ্টাজ্যাহুতি মন্ত্র ও তাদের অর্থ -৫৭

১৮. সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী -৬০

১৯. ঈশ্বর কি নিজের ভক্তদের পাপ ক্ষমা করেন? -৬২

২০. সত্যার্থ প্রকাশের আলোচনা কি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ? - ৬২

২১. সত্যার্থ প্রকাশ এক দর্পণ স্বরূপ -৬৪

২২. অগ্নিহোত্রে স্বিষ্টকৃতের মন্ত্র ও তার অর্থ কী ? - ৬৭

২৩. মহর্ষির্দয়ানন্দঃ - ৬৭

২৪. ওঙ্কারের পতাকার সম্মান রক্ষায় প্রাণ দিয়েছিলো যে দম্পতি... - ৬৮

২৫. মুক্তিযুদ্ধে জগন্নাথ হলের উপর হামলা - ৬৯

২৬. নালন্দা কে ধ্বংস করেছিলো ? - ৭৯

২৭. মহর্ষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার ও কর্তব্য - ৮৮

২৮. পঞ্চমহাযজ্ঞের তাৎপর্য - বেদে এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা - ৯৩

২৯. আর্য সংস্কৃতির প্রবল প্রচারক — লালা রামজস - ১১৬

৩০. মহর্ষি দয়ানন্দ ও আর্যসমাজ সম্পর্কে পদ্মভূষণ রাষ্ট্রকবি রামধারী সিংহ 'দিনকর' - ১১৮

৩১. অবিদ্যা থেকে মুক্তি -১১৯

৩২. শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির ভিন্নতা - ১২২

৩৩.নেপালের রক্তঋণ -আর্যবীর পণ্ডিত শ্রী শুক্ররাজ শাস্ত্রীর বলিদান - ১২৬

৩৪. উপনিষদ্ বিষয়ক মহর্ষি দয়ানন্দের বচন - ১৩৪

৩৫. ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম - ১৩৫

৩৬. মুক্তি- ১৫৪

৩৭. প্রসঙ্গ–সামবেদ - ১৬৭

৩৮. বেদ মন্ত্রে ঈশ্বর উপাসনার শাস্ত্রীয় প্রমাণ -১৭৮

৩৯. ত্রৈতবাদের শাস্ত্রীয় স্বরূপ - ১৯৫

চার বেদের প্রথম মন্ত্র ও তাদের অর্থ

- **ঋগ্বেদ**

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ ।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥

ঋগ্বেদ ১।১।১

সরলার্থ: আমি, যজ্ঞ ও ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ কর্মের সম্পাদক এবং ধারণকারী, [সৃষ্টি নির্মাণের] পূর্বেই সমস্ত পরমাণু, প্রকৃতি এবং [সৃষ্টি নির্মাণের পরে] সৃষ্টিকে ধারণকারী, সকলের পূর্বে বিদ্যমান, জ্ঞানবান, প্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের স্তুতি করি।

- **যজুর্বেদ**

ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়বং স্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণঽআপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যাঽইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবাঽঅয়ক্ষ্মা মা বং স্তেনঽঈশত মাঘশংসো ধ্রুবাঽঅস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি॥
যজুর্বেদ ১।১

সরলার্থ: হে মানবগণ!

১. যিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তিকর্তা, সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যযুক্ত, সর্ব সুখদাতা ও সর্ববিদ্যা প্রসিদ্ধিকারী পরমাত্মা,

২. তিনি তোমাদের-আমাদের এবং আপন বন্ধুবান্ধবদের সর্বকর্মসিদ্ধিদাতা, স্পর্শগুণযুক্ত প্রাণ, অন্তঃকরণ ও যে সমস্ত ইন্দ্রিয় আছে - তাদের সকলকে অতি উত্তম সর্বোপকারক যজ্ঞাদি কর্তব্য কর্মে উত্তমরূপে [তিনি] যেন সংযুক্ত করেন।

৩. আমরা অন্ন প্রভৃতি উত্তম-উত্তম পদার্থসমূহ এবং বিজ্ঞানের ইচ্ছা ও পরাক্রম অর্থাৎ উত্তম রস প্রাপ্তির জন্য সেবায় নিযুক্ত করার যোগ্য ধন এবং জ্ঞান পরিপুরিত উক্ত গুণ যুক্ত তথা শ্রেষ্ঠ পরাক্রমাদি গুণ প্রদানকারী আপনার [পরমাত্মার] সর্বপ্রকার আশ্রয় আমরা কামনা করছি।

৪. হে বন্ধুগণ! তোমরাও এমন হয়ে উন্নতি লাভ করো এবং আমরাও লাভ করি ।

৫. হে ভগবান জগদীশ্বর! আমাদের সকলের পরম ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য যাদের বহু সন্তান আছে এং যে ব্যাধি এবং যাদের মধ্যে রাজযক্ষ্মা আদি রোগ নেই, তারা - 'অঘ্ন্যা' যে সমস্ত গরু আদি পশু বা উন্নতি করার যোগ্য রয়েছে, যারা হিংসাযোগ্য নয়, ইন্দ্রিয়সমূহ অথবা যে সমস্ত পৃথিবী আদি লোক রহিয়াছে সেগুলোকে সদৈব নিযুক্ত রাখুন।

৬. হে জগদীশ্বর! আপনার কৃপায় আমাদের মধ্যে কেউ যেন দুঃখদায়ী পাপী বা চোর ডাকাত উৎপন্ন না হয়

৭. আপনি জীবের ও পরমেশ্বর - সর্বোপকারক ধর্ম পালনকারী বিদ্বানের গৌ, অশ্ব ও হস্তি প্রভৃতি ও লক্ষ্মী এবং প্রজাকে সর্বদা রক্ষা করুন যাতে এই পদার্থসমূহ হরণ করতে কোনও পাপী চোর যেন সমর্থ না হয়।

৭. এই পৃথিবী আদি পদার্থসমূহের রক্ষা কামনাকারী ধার্মিক মানবের কাছে নিকট বহু পরিমাণে গো নিশ্চল স্থায়ী সুখের কারণ।

- **সামবেদ**

অগ্ন আ যাহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে ।

নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥

সামবেদ ১

সরলার্থ: হে সর্ব অগ্রণী, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বসুখপ্রদাতা, সর্ব প্রকাশক পরমাত্মা ! তুমি কর্তব্যের উপদেশ প্রদান করে আমাদের প্রগতির জন্য, আমাদের বিচার এবং কর্মে ব্যাপ্ত হওয়ার জন্য, আমাদের হৃদয়ে সদ্গুণ উৎপন্ন করার জন্য, আমাদেরকে স্নেহ করার জন্য, আমাদের মধ্যে উৎপন্ন কাম-ক্রোধ প্রভৃতিকে বাইরে নিক্ষেপ করার জন্য এবং দিব্য পদার্থ, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধন প্রভৃতি দান করার জন্য এসো। শক্তি দাতা এবং দুর্বলতা হরণকারী হয়ে হৃদয়রূপ অন্তরিক্ষে বিরাজমান হও।

- **অথর্ববেদ**

যে ত্রিষপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ।
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥

অথর্ববেদ ১।১।১

সরলার্থ: আমাদের চারপাশে বিচরণশীল জীব ও জড়জগৎকে যে একুশটি তত্ত্ব টিকিয়ে রাখে, সেগুলোর শক্তি ও ক্ষমতাকে, পরমেশ্বর সদাসর্বদার জন্য আমাকে অর্পণ করুন।

ত্রিষপ্তাঃ ~ এর 'ত্রি' পদ তিন কাল (ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ) তিন লোক (দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ এবং ভূলোক) তিন গুণ (সত্ত্ব, রজ এবং তম) ও তিন সত্ত্বা (ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি)।

যদি ৩+৭=১০ বোঝায় তবে,

১. চার দিক, চার বিদিক, এক উপরের এবং এক নিচের দিক। মোট দশ দিক - ১। পূর্ব,

২। পশ্চিম,

৩। উত্তর,

৪। দক্ষিণ,

৫। উত্তর-পূর্ব বা ঈশাণ,

৬। দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নি,

৭। দক্ষিণ-পশ্চিম বা নৈঋত,

৮। উত্তর-পশ্চিম বা বায়ু,

৯। আকাশ বা উর্দ্ধ এবং

১০। পাতাল বা অধঃ।

২. পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় = কান, ত্বক, নেত্র, জিহ্বা, নাসিকা এবং পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় = বাক্, হাত, পা, পায়ু, উপস্থ। অথবা, ৩×৭=২১ হলে পাঁচটি মহাভূত, পাঁচটি প্রাণ, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, একটি অন্তঃকরণ । এভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

প্রকৃত দেবী-ভক্তের দেহে কী “মায়ের” আগমন সম্ভব ?

নির্মূলনঃ- ভৌতিক দেহের চালনাকারী নিজের একটি আত্মা থাকে যার সঙ্গে পরমাত্মাও থাকেন। একটি দেহে একটি আত্মাই থাকে। আজকাল তো এই ভ্রান্তি ছড়িয়ে রয়েছে যে, প্রায়ই কোন না কোন স্ত্রীর দেহে সন্ধ্যা অথবা রাত্রির সময় দেবী মায়ের আগমন হয় শরীর কাঁপতে থাকে কেশরাশি এলোমেলো হয়ে যায় – চোখ বড় হয়ে যায় কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায় – শরীর নাচতে থাকে আর দেহে প্রবেশকারী মাতার নিকট যা কিছু জিজ্ঞাসা করবে, উত্তর পাওয়া যাবে। এই ধরনের কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। প্রায়ই এমন কথাগুলি সত্য মনে করা হয়। যদি গভীরভাবে ভাবা যায় তবে নিজের অবুঝতা ও অজ্ঞানতার উপর আমরা চিন্তন করি আমরা স্বয়ং কেঁপে উঠব।

একটু এসব প্রশ্নের উপর বিচার করুন– এ কোন মাতাজী আসা-যাওয়া করেন? মাতাজী রাতেই আসেন কেন? প্রশ্নের উত্তর স্বয়ং মাতাজিই প্রকট হয়ে প্রদান করেন না কেন? কারোর দেহে লুকিয়েই প্রদান করেন কেন? যার দেহে আগমন হয় (প্রবেশ করে) তাকে কষ্ট প্রদান করেন কেন যে, শরীর কম্পন হতে থাকে? সেই মায়ের চেতনা লুপ্ত হয় কেন যে, তার নিজের খেয়াল থাকে না? কেশ এলোমেলো করার কী প্রয়োজন? সামান্য সময়ের জন্য মায়ের আগমন হয় তবে শীঘ্রই কেন চলে যান? পুরুষের দেহে প্রকট হন না কেন? সবার দেহে কেন আসেন না? মাতা নিজের নাম স্থানে-স্থানে পরিবর্তন করেন কেন? এইরূপ বহু প্রশ্ন উৎপন্ন হয়।

বিদ্বান্ স্বয়ং যুক্তি সংগ্রহ করে, বিবেকের সহিত এর উত্তর অনুসন্ধান করতে পারেন।

প্রিয় বন্ধুগণ! এ কোন ধরনের মাতাজী আমি জানি না! মাতা তো মমতায় পুরিত হয়ে নিজ পুত্র-কন্যার জন্ম প্রদান করে, পালন-পোষণ করে, তাদের কুশল তৈরী করেন। তিনি কী কখনও কারোর দেহে প্রবেশ করবেন? জন্মদাত্রী মাতা তো এমন করেন না।

পৃথিবী মাতা- যিনি রুটি-বস্ত্র-গৃহ প্রদান করেন, ভোজনের সমস্ত সামগ্রী প্রদান করেন, কখনোই কিছু পাওয়ার আশা করেন না- তিনিই দেবী। ধরণী মা কীভাবে কারোর দেহে প্রবেশ করতে পারেন ? কখনোই না, কারণ এত বৃহৎ বিশাল পৃথিবী ক্ষুদ্র দেহে কীভাবে সমাহিত হতে পারেন! জড় হবার কারণে পৃথিবী কখনও প্রশ্ন-উত্তর প্রদান করতে পারে না। জড়ের মধ্যে জ্ঞান থাকে না।

বেদমাতা অর্থাৎ জ্ঞানমাতা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা। সবার জননী বেদমাতা-ঈশ্বর। যিনি সর্বব্যাপক, যার জ্ঞান লাভ হলে মানব মাত্রের কল্যাণ হয়, সেই পরমাত্মা "মাতা" সাজবেন কেন? সর্বান্তর্যামী হওয়ায় তিনি তো প্রথম থেকেই আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিরাজমান। এমন সর্বব্যাপক পরমপিতা পরমাত্মার অবতরণ কীভাবে সম্ভব? ঈশ্বর তো একাধিক হতে পারেন না। এক তো প্রথম থেকেই আত্মার ভিতর-বাইরে বিদ্যমান আছেন তবে তার দ্বিতীয় অবতরণ এই দেহে কীভাবে সম্ভব?

এর দ্বারা এ প্রমাণিত হয় যে, দেহে কোনও মাতার অবতরণ অথবা প্রবেশ হয় না- হতে পারে না। এ একেবারে অর্থহীন বক্তব্য। এখন যে এগুলি সত্য মনে করে যে, মাতা শরীরে আগমন করে প্রশ্নোত্তরী করে– তার কাছে আমি একথা জিজ্ঞাসা করতে চাই যে,

এ কোন মাতা যা তার দেহে প্রবেশ করে?

প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ভক্তগণ! এই কথাকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করুন যে, একটি দেহে কেবল একটি আত্মা বাস করে যার দ্বারা এই দেহের ব্যবহার হয়। অন্য কারোর আত্মা কখনো এই দেহে প্রবেশ করতে পারে না। মুক্ত

আত্মাও চাইলে ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করতে পারেন না। মুক্তাত্মা ব্রহ্মাণ্ডে স্বেচ্ছায় যেকোনো স্থানে ভ্রমণ করতে পারে, কিন্তু দেহে প্রবেশ করা, প্রবেশ করে সেখানে বাস করা, প্রশ্নের উত্তর দান করা কখনও সম্ভব নয়।

সত্য তো এই যে, এমন ভণ্ডামো করে লোকদেরকে "মায়ের জাগরণ" করার দোকানদারীর বিস্তার করা হয়। এই অজুহাতে জিনিসপত্র লুট এবং লোকদের প্রতারণা করার ক্রিয়া চালু থাকে। ধর্মের নামে এমন ঠগবাজির মুখোশ খুলে দেওয়া উচিত, যাতে ধূর্ত লোকদের জন্য প্রকৃত লোকদের আস্থা না ভঙ্গ হয়।

কিছু সময় চুল এলোমেলো করে শরীরে অঙ্গভঙ্গির মানসিক স্থিতি নষ্ট করে, শরীরে কম্পন হতে থাকে, সেই মহিলা নিজে থেকে যা খুশি বিড়বিড় করতে থাকে। নৃত্য, চুল এলো করা এগুলি ভিড় একত্র করার কৌশল মাত্র। এতটুকু সত্য যে, কোন মাতার প্রবেশ আমাদের দেহে হওয়া সম্ভব নয়।

এগুলি পূর্ণরূপে ধূর্ত লোকদের কারসাজি। এগুলি তাদের ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন-নতুন কথার দ্বারা সাধারণ লোকদের যেমন-তেমন ভাবে লুট করা তাদের ব্যবসা হয়ে গিয়েছে। ধন-সম্পদের লালসা মানুষকে শয়তান করে দিয়েছে। এই সমস্ত ভণ্ডামি থেকে দূরে থাকুন।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক।

ঈশ্বর কে ?

(ঈশ ঐশ্বর্যে) এই ধাতু [ধা০২.১০] থেকে ‘ঈশ্বর’ শব্দ সিদ্ধ হয়। ‘য ঈষ্টে সর্বৈশ্বর্যবান্ বর্ত্ততে স ঈশ্বরঃ’= যার সত্য, বিচার, শীল, জ্ঞান এবং অনন্ত ঐশ্বর্য আছে, সেই পরমাত্মার নাম ‘ঈশ্বর’।

"ঈশ্বর"

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।।

যোগ দর্শন ১/২৪

■ক্লেশ,কর্ম,বিপাক ও আশয়, এই চারটির সঙ্গে যাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই, যিনি সমস্ত পুরুষের মধ্যে উত্তম, তিনিই ঈশ্বর।

(১) ক্লেশ=অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষা ভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।।

যোগ দর্শন ২/৩

■অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ।

১। অবিদ্যা=অনিত্যাশুচিদুঃখানা ত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।। যোগ দর্শন ২/৫

■অনিত্যে নিত্য, অশুচিতে শুচি, দুঃখে সুখ, অনাত্মায় আত্মবুদ্ধি অবিদ্যা।

২। অস্মিতা=দৃগদর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।।

যোগ দর্শন ২/৬

■দৃক্ শক্তি ও দর্শন শক্তি, এই দুইটির একরুপ হয়ে যাওয়া অস্মিতা।

৩। রাগ=সুখানুশয়ী রাগঃ।।

যোগ দর্শন ২/৭

■সুখের প্রতি আসক্তিই রাগ।

৪। দ্বেষ=দুঃখানুশয়ীদ্বেষঃ।।

যোগ দর্শন ২/৮

■দুঃখের প্রতিতিই দ্বেষ।

৫। অভিনিবেশ=স্বরসবাহীবিদুষোপি তথারুঢ়োভিনিবেশ।।

যোগ দর্শন ২/৯

■স্বভাবতই চলে আসছে, বিবেকশীল পুরুষের মধ্যেও যা মূঢ় মানুষের মতো মরণভয় হলো অভিনিবেশ।

(২) কর্ম=কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতেষাম্।।

যোগ দর্শন ৪/৭

■শুক্ল অর্থাৎ পূর্ণ, কৃষ্ণ অর্থাৎ পাপ কর্ম।যোগী ব্যতিত অন্যান্যদের তিন প্রকারের।

(৩)আশয়=ক্লেশমূলঃকর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।।

যোগ দর্শন ২/১২

■দৃষ্ট বর্তমান শরীর দ্বারা এবং অদৃষ্ট শরীর দ্বারা যাহা ভুগতে হয় সেই ক্লেশমূলক কর্মসংস্কার হলো আশয়।

(৪)বিপাক=সতিমূলেতদ্বিপাকোজাত্যায়ুর্ভোগাঃ।।

যোগ দর্শন ২/১৩

■মূল বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত,যার দ্বারা পূর্ণজন্ম ও আয়ু ভোগ হতে থাকে তাহা হলো বিপাক।

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক(কর্মফলের নাম) ও আশয়(যাবতীয় কর্ম সংস্কারের নাম)– এই চারের সঙ্গে যার কোনো সম্বন্ধ নেই, যিনি সকল পুরুষের মধ্যে উত্তম, তিনিই ঈশ্বর।

১. তিনি "ক্লেশ" অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচটি থেকে মুক্ত।

২. তিনি "কর্ম" অর্থাৎ শুভ-অশুভ-মিশ্র কর্ম হতে মুক্ত।

৩. তিনি "বিপাক" অর্থাৎ কর্মফল হতে মুক্ত।

৪. তিনি "আশয়" অর্থাৎ কর্মফল দ্বারা সৃষ্ট সুখ-দুঃখ ভোগের সংস্কার হতে মুক্ত।

অতএব উপরিউক্ত বিষয় সমূহের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই তিনিই ঈশ্বর।

ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মফলাদর্শনাৎ।।

ন্যায়দর্শন- ৪/১/১৯

■জীব কর্ম করলেও কর্মফল তার অধীন নয়। কর্মফল অপর যার অধীন বলে অনুমিত হয়, সেই কারণই ঈশ্বর।

অর্থাৎ আমরা যা কর্মই করি না কেন কর্মফল দাতা একমাত্র তিনি যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন,আর তিনিই হলেন ঈশ্বর।

অতএব আমরা ঈশ্বর কে তাহা যানতে পারলাম।

এবার সেই ঈশ্বরের নাম কি সেটা জানবো।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।।

যোগ দর্শন ১/২৭

■সেই ঈশ্বরের নাম ওঽম্।।।

চলুন দেখে নেই বেদে ঈশ্বর সম্পর্কে কী বলা আছে

"ঈশ্বর হলেন তিনি যিনি বিশ্বজগতের স্রষ্টা"

■ঋগ্বেদ - ৩|৬৩|১০

"ঈশ্বর হলেন তিনি যাহাতে সর্ব জগত আশ্রয় করে আছে"

■ঋগ্বেদ - ৩।২|৮

ঈশ্বর হলেন তিনি যিনি সকলের মোক্ষ দাতা

■ঋগ্বেদ - ১|৭২|১

ঈশ্বর হলেন তিনি যিনি এক এবং অদ্বিতীয়

■অথর্ব্ববেদ - ১৩|৪|২

ঈশ্বর হলেন তিনিই যাহার নিয়মে বিশ্বসংসার চলে

■ঋগ্বেদ - ১|২২|১৯

ঈশ্বর তিনিই যিনি পবিত্র বেদের উৎপাদক

■যজুর্ব্বেদ - ৩৩|৩১

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নি মাহু, রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"

■ঋগ্বেদ - ১|১৬৪|৪৬

অনুবাদ : এক সত্তা পরব্রহ্মকে জ্ঞানীরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গরুৎমান, যম, মাতরিশ্বা আদি বহু নামে অভিহিত করেন ।

কিন্তু তাই বলে ঈশ্বর কখনো একাধিক নন। যিনি ভাবেন ঈশ্বর একাধিক তিনি কখনোই তাঁকে প্রাপ্ত হন না।

"ন দ্বিতীয়া ন তৃতীয় শ্চতুর্থ না পুচ্যতে

ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠ ন সপ্তমো না পুচ্যতে

নাষ্টমো ন নবমো দশমো না পুচ্যতে

য এতং দেবমেক বৃতং দেব"

■অথর্ব্ববেদ - ১৩|৪|২

অনুবাদ : পরমাত্মা এক, তিনি ছাড়া কেহই দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ট সপ্তম অষ্টম নবম বা দশম ঈশ্বর বলিয়া অবিহিত নহে। যিনি ঈশ্বর কে এক বলে জানেন তিনিই ঈশ্বর কে প্রাপ্ত হন।

"য এক তমু ষ্টুহি কৃষ্ঠীনাং বিচর্যণি। পতি যজ্ঞে বিষক্রতু"

■ঋগ্বেদ - ৬|৪৫|১৬

অনুবাদ : যিনি এক অদ্বিতীয়া, যিনি মনুষ্যদের সর্ব্বদ্রষ্টা, যিনি সর্বশক্তিমান ও পালক একমাত্র তাহার উপাসনা কর।

"ওঁ খং ব্রহ্ম"

■যজুর্ব্বেদ - ৪০|১৭ মন্ত্র

ঈশ্বরের অনেক নাম হওয়া সত্ত্বেও মুখ্য নাম হলো ওও৩ম্ 🕉

🔶ঈশ্বর নারী না পুরুষ ❓

এই প্রশ্নের সমাধান করতে হলে আমাদের আগে বুঝতে হবে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়ম ব্রণম স্নাবিরং শুদ্ধ মপাপ বিদ্ধম্ কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথা তথ্যতোহর্থান্ব্যদধাচ্ছা শ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ।।

যজুর্বেদ ৪০.৮

■সেই পরমাত্মা সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীররহিত, ছিদ্র রহিত, স্নায়ু আদির বন্ধন রহিত, শুদ্ধ, পাপরহিত, সর্বজ্ঞ, সমস্ত জীবের মনকে যিনি জানেন, দুষ্টের দমন কর্তা স্বয়ম্ভু। তিনি তার শাশ্বত প্রজা জীবের জন্য যথাযথভাবে সমস্ত পদার্থকে রচনা করে থাকেন।

উপরোক্ত বেদের মন্ত্র থেকে পরিষ্কার যে ঈশ্বর নিরাকার।

ন প্রতিকে ন হি সঃ-

বেদান্ত দর্শন।(৪।১।৪)

■ঈশ্বররের কোনো প্রতিক হয় না।

যেই পরমাত্মার কোন শরীরই নেই তিনি নারী-পুরুষ কোনটাই হওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না।

বৈদিক-গ্রন্থ উপনিষদের বিভিন্ন জায়গায় ঈশ্বর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,,,

🔷ঈশোপনিষদ—৮ (ঈশ্বর অকায়ম্ বা শরীররহিত)

🔷কঠোপনিষদ—১/২/২২ (ঈশ্বর অশরীরী)

🔷কঠোপনিষদ—১/৩/১৫ (ঈশ্বর অরূপ বা রূপহীন)

🔷কঠোপনিষদ—২/৩/১২ (ঈশ্বর বাক্য-মন-চক্ষুর অগোচর)

🔷মুণ্ডকোপনিষদ—১/১/৮ (অপাণিপাদম্ অচক্ষুশোত্রম অর্থাৎ ঈশ্বরের হাত,পা,চক্ষু,কর্ণ নেই)

🔷শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—২/১৫ (ঈশ্বর জন্মরহিত)

🔷শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ-৪/২১ (ঈশ্বর জন্মরহিত)

🔷শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—৬/৮ (ঈশ্বরের শরীর এবং ইন্দ্রিয় নেই)

🔷শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ—৬/৮ (ঈশ্বরের লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই এবং তাঁর কোন জনক বা পিতা নেই)

🔶ঈশ্বর কি নপুংসক বা অর্ধনারীশ্বর ❓

চলুন দেখি গীতায় কী বলা হয়েছে

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্

॥গীতাঃ ১৩/১৮॥

■তিনি সমস্ত জ্যোতিষ্কের পরম জ্যোতি। তাঁকে সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্ত স্বরূপ বলা হয়। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয় এবং তিনিই জ্ঞানগম্য। তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত।

মহাভারতে কী বলা?

ন চ স্ত্রী ন পুমাংশ্চৈব তথৈব ন নপুংসকঃ।

কেবলজ্ঞানমাত্রং তত্তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।।

মহাভারত - শান্তিপর্ব - ২১৮/৯০

■ঈশ্বর স্ত্রীও না, পুরুষও না এবং নপুংসকও না। তিনি কেবল জ্ঞানমাত্র অথচ এই সমগ্র জগতই তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে ঈশ্বর নিরাকার। যখন ঈশ্বর নিরাকার ঈশ্বরের জন্ম-মৃত্যু নেই, শরীর নেই, লিঙ্গ নেই, পিতামাতা নেই, রুপ-চিহ্ন নেই, তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং তারও ইন্দ্রিয় নেই। তাই ঈশ্বরকে পুরুষ, নারী, অথবা নপুংসক ইত্যাদি বলে সম্মোধন করা শাস্ত্র সম্মত না।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ঈশ্বর নিরাকার হলে বেদ ঈশ্বরের বাণী হয় কীভাবে ?

প্রশ্ন: ঈশ্বর নিরাকার হলে বেদ ঈশ্বরের বাণী হয় কীভাবে ? বাণী হতে হলে ঈশ্বরের মুখ, ঠোঁট, জিহ্বা, দাঁত থাকা দরকার ।

উত্তর: বেদোৎপত্তির বিষয়ে কেউ কেউ এইরকম প্রশ্ন করেন, পরমেশ্বর নিরাকার হওয়ায় কীভাবে শব্দরূপ বেদ তাঁর থেকে উৎপন্ন হতে পারে ? এর উত্তর হলো, পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান এজন্য তার প্রতি এরকম সন্দেহ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা মুখ প্রাণ ইত্যাদি উপায় ছাড়াও এই ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের কাজ করার জন্য পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি আছে। অর্থাৎ পরমাত্মা নিজের অনন্ত সামর্থ্য বলে মুখ ও প্রাণ আদি ইন্দ্রিয় ছাড়াই মুখ প্রাণ ইত্যাদির যে যে কাজ তা যথাযথভাবে করতে পারেন ।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১৯

সরলার্থঃ সেই পরমাত্মার হাত নেই, তবুও নিজের অনন্ত শক্তি দ্বারা তিনি সবকিছু গ্রহণ অর্থাৎ ধারণ করেন। তাঁর পা নেই, তবুও তিনি সর্বব্যাপক হওয়ার কারণে সর্বাধিক বেগবান। তাঁর চক্ষু নেই, তবুও তিনি সবকিছু দর্শন করেন। তাঁর কর্ণ নেই, তবুও তিনি সবই শ্রবণ করেন। তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, অথচ তাঁকে কেউ সম্পূর্ণরূপে জানে না। এজন্য জ্ঞানিগণ তাঁকে সর্বাগ্রণী, সর্বাপেক্ষা মহান পুরুষ বলেন।

এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টভাবে পরমাত্মার ইন্দ্রিয়ের প্রতিষেধ করা হয়েছে। পরমেশ্বর চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত-পদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্য ছাড়াই গ্রহণ, দর্শন, শ্রবণাদি কার্য সিদ্ধ করতে পারেন, আর এটিই তাঁর সর্বশক্তিমত্তা। সংসার সাগরে নিমজ্জিত অল্পজ্ঞ মানব সেই সর্বজ্ঞ ব্রহ্মকে জানতে পারে না। কিন্তু বৈরাগ্য-প্রাপ্ত, শ্রদ্ধাবান, ধার্মিক মনুষ্যগণ ব্রহ্মবিদ্যার চর্চা ও ধ্যানাদি যোগাভ্যাস দ্বারা তাঁকে জানতে সমর্থ হন। কিন্তু সেই বাক্যমনাতীত ব্রহ্মকে কেউ পূর্ণরূপে জানতে পারে না (কেন০ ২।৩ দ্রষ্টব্য)। তাই বর্তমান শ্রুতিতে বলা হয়েছে, তাঁর জ্ঞাতা কেউই নেই। এজন্য জ্ঞানিগণ সেই জগদীশ্বরকে সর্বাগ্রণী, সর্বাপেক্ষা মহান পুরুষ বলেন।

এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী লিখেছেন—

“পরমেশ্বরের হস্ত নেই, কিন্তু তিনি নিজের শক্তিরূপ হস্ত দ্বারা সমস্ত রচনা এবং গ্রহণ করেন। তাঁর চরণ নেই, কিন্তু তিনি ব্যাপক হওয়ার কারণে সর্বাপেক্ষা অধিক বেগবান। তাঁর চক্ষুগোলক নেই, কিন্তু তিনি সমস্ত যথাবৎ দর্শন করেন। তাঁর শ্রোত্র নেই, তবুও তিনি সকলের কথা শ্রবণ করেন। তাঁর অন্তঃকরণ নেই, কিন্তু তিনি সমস্ত জগৎকে জানেন। তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে, এমন কেউ নেই। সনাতন, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বত্র পূর্ণ হওয়ার কারণে তাঁকে ‘পুরুষ’ বলা হয়। তিনি ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ব্যতীত সব কর্ম নিজের অনন্ত সামর্থ্য দ্বারা করেন। (সত্যার্থ প্রকাশ, ৭ম সমুল্লাস)”।

সর্বশক্তিমান সম্ভব-অসম্ভব সব কিছুই করতে পারে, এ মনে করা মস্ত বড় ভুল ছাড়া আর কিছুই না । যাঁর মধ্যে সর্বপ্রকার শক্তি আছে তিনি সর্বশক্তিমান, এই হলো সর্বশক্তিমানের বাস্তবিক অর্থ। যিনি সর্বশক্তিমান হবেন তিনি জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থকে অপরের সাহায্য ব্যতীত যেমন যুক্ত করতে পারবেন, তেমনি তাদের বিযুক্তও করতে পারবেন । তিনি সমস্ত জীবকে তাদের কর্মানুয়ায়ী ফল দিতে এবং সৃষ্টি, স্থিতিও প্রলয় করতে পারবেন । তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বর তাঁর নিজের কর্ম সম্পাদনে অপর কোনো কিছুর সাহায্য গ্রহণ করবেন না । এই হল ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্ত্বা । সর্বশক্তিমানের অর্থ এ নয় যে, তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন ।

মুখ প্রাণ আদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ব্যতীত যেসব কাজ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে করতে হয় তা না করতে পারার দোষ কেবল অল্প সামর্থ্যযুক্ত জীবেরই হয়, পরমাত্মার এই দোষ নেই। আবার আমরা যেমন মনে মনে কোন চিন্তা করার সময় বাক্য রচনা ছাড়াও মনে মনে প্রশ্নোত্তরের শব্দ উচ্চারণ করতে পারি, সেভাবেই পরমেশ্বরের বিষয়ে জানা কর্তব্য । যিনি সর্বসামর্থ্যযুক্ত, তিনি কখনো কোনো কাজ করবার সময় কারো বা কিছুর সাহায্য গ্রহণ করেন না। কারণ তিনি নিজ সামর্থ্যবলেই সকল ধরনের কাজ করতে সমর্থ হন। যেভাবে অন্যের সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন কাজ করতে সক্ষম নই, ঈশ্বর তেমন নয়।

শরীরের অধীনে থেকেন ঈশ্বরকে যদি অপরের ভরসায় কাজ করতে হয়, তাহলে তিনি ‘সর্বশক্তিমান’ হবেন কেমন করে? অল্পজ্ঞ জীব যেমন শরীরের ভরসায় কাজ করে, তেমনি ঈশ্বরকেও শরীরের ভরসায় কাজ করতে হবে । তাহলে তুমিই বল, জীব আর ঈশ্বরে পার্থক্য কী রইল? মানুষকে যেমন শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ব্যাকুল করে তোলে, মানুষের যেমন রাগ-দ্বেষ, জ্বর-জ্বালা হয়, তেমনি শরীরধারী ঈশ্বরেরও হবে ।

ঈশ্বর সাকার স্বীকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে পরাধীন হতে হবে তত্ত্বতঃ তিনি স্বাধীন থাকতে পারবেন না । কখনও তাঁর খাওয়ার প্রয়োজন বা কখনও জলের, কখনও বা বস্ত্রাদির আবার কখনও নিবাস স্থানের অর্থাৎ মাথা গোঁজার মত ঠাঁইও প্রয়োজন হবে । যিনি জগতের যাবতীয় কর্ম আপন শক্তিবলে করেন, তাঁকে শরীরের সাহায্যে

করতে হবে। এ অবস্থায় তাঁকে সর্বশক্তিমান কোন্ বিচারে বলবো বলো? যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকে আপন দৃষ্টি শক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট করে জ্ঞানহারা করতে সক্ষম হয়, আর এক ব্যক্তি কাহাকেও ঔষধ প্রয়োগে জ্ঞানহারা করে বলতো, এ দুজনের মধ্যে কোন জন অধিক শক্তিশালী । এস্থলে সেই শক্তিশালী ব্যক্তি, যেজন দৃষ্টিশক্তিবলে অন্যকে জ্ঞানহারা করতে সক্ষম। যদি বলো কেনো ? কারণ এই যে, সে অপরকে সংজ্ঞাহীন করতে ঔষধের সাহায্য নেয়নি এবার তুমি বেশ ভাল করে বুঝেছ যে, ঈশ্বর সেই অবস্থায় সর্বশক্তিমান হতে পারবেন, যখন তিনি সাকার নন।

সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥১

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১৬ ও গীতা ১৩।১৪

সরলার্থঃ সেই পরমাত্মা সর্বত্র হস্ত ও চরণ বিশিষ্ট অর্থাৎ অনন্ত বলবান এবং সর্বগত; সর্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা (সবার কর্মের সাক্ষী), সর্বজ্ঞ (অনন্ত জ্ঞানবান), সর্ববক্তা (অন্তর্যামীরূপে সবার উপদেষ্টা) এবং সর্বত্র শ্রুতিযুক্ত (সর্বদিকে শ্রবণশক্তি সম্পন্ন)। তিনি জগতে সবকিছু আবৃত করে অর্থাৎ সবার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে অবস্থিত রয়েছেন।

পরমাত্মার মহিমা জগতের সর্বত্র বিস্তৃত। তাঁর হস্ত সর্বত্র বিদ্যমান, 'হস্ত' বলের প্রতীক অর্থাৎ তিনি অনন্ত বলবান ও সকল পদার্থের ধারণকারী। তিনি সর্বত্র চরণযুক্ত, 'চরণ' গমন বা গতিশক্তির প্রতীক অর্থাৎ তিনি সর্বগত, আমরা যে স্থানেই চিন্তা করি না কেন পরমাত্মা সেখানে পূর্ব থেকেই উপস্থিত আছেন। তাঁর চক্ষু সর্বত্র, 'চক্ষু' দর্শনের প্রতীক অর্থাৎ তিনি সর্বদ্রষ্টা, সকলের শুভ-অশুভ কর্মের সাক্ষী, এমন কোনো পদার্থ বা স্থান নেই যা তাঁর দৃষ্টিশক্তির অগোচরে। সেই পরমাত্মার মস্তক সর্বত্র, 'মস্তক' জ্ঞানের প্রতীক অর্থাৎ তিনি সর্বজ্ঞ, অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী। তিনি সর্বত্র মুখবিশিষ্ট, 'মুখ' জ্ঞানোপদেশের প্রতীক অর্থাৎ তিনি সর্ববক্তা, যে উপাসক হৃদয়দেশে তাঁর ধ্যান করেন, তার হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে জ্ঞানের উপদেশ (কর্তব্য ও অকর্তব্য নির্ণয় করার বিবেক-বুদ্ধি) প্রদান করেন। তিনি সর্বত্র শ্রুতিযুক্ত বা কর্ণযুক্ত, 'কর্ণ' শ্রবণের প্রতীক অর্থাৎ সকল ভক্তের স্তুতি ও প্রার্থনা তিনি শ্রবণ করেন। হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রাকৃত অথবা অপ্রাকৃত কোনোটিই পরমাত্মার নয়, এসব হচ্ছে তাঁর বিবিধ কার্য সম্পাদনের ও আশ্চর্য সামর্থ্যের আলংকারিক বর্ণনা মাত্র। পরবর্তী শ্রুতিসমূহে এই ভাব স্পষ্ট হয়েছে।

এখন পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়-রহিত বলছেন—

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।

সর্বস্য প্রভুমীশানং সর্বস্য শরণং বৃহৎ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।১৭

সরলার্থঃ সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের প্রকাশক হয়েও স্বয়ং সকল ইন্দ্রিয়-বর্জিত। তিনি সবার প্রভু, নিয়ন্তা এবং সবার মহান আশ্রয়।

মানুষ যেমন চক্ষু-কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত-পদাদি কর্মেন্দ্রিয়ের সংযোগে কর্ম করে থাকে, তেমনই পরমাত্মার কর্ম করার জন্য কোনো ইন্দ্রিয় বা করণের প্রয়োজন হয় না। তিনি প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ইন্দ্রিয়-বর্জিত, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক অর্থাৎ জীবগণের ইন্দ্রিয়সমূহে যে দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শন, চিন্তন, মনন ও বিবেচন করার

ভিন্ন-ভিন্ন শক্তি আছে, সেগুলো পরমাত্মার অনন্ত শক্তি থেকেই প্রাপ্ত। তিনিই সমস্ত জড়-চেতন জগতের স্বামী ও নিয়ামক। একমাত্র তিনিই সবার পরম আশ্রয়স্থল, কেননা জীবজগৎ তাঁর আশ্রয়েই বর্ধিত হচ্ছে।

যেমন দেখো, জগত যখন উৎপন্ন ছিলো না, সেই সময় নিরাকার ঈশ্বর সম্পূর্ণ জগৎ নির্মাণ করেন। তখন বেদ রচনায় সন্দেহ থাকতে পারে কি? যেমন বেদে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিদ্যা রচনা করেছেন, তেমনি জগতে ও প্রয়োজনীয় পদার্থ গুলি অত্যন্ত আশ্চর্য রূপে রচনা করেছেন। তাহলে বেদের রচনা নিরাকার ঈশ্বর কেন করতে পারবেন না? প্রকৃতপক্ষে তাকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আনা বা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তিনি কোন কাজ করতে পারেন বলা যেমন শাস্ত্রবিরুদ্ধ তেমন তার সর্বশক্তিমান হওয়াকে উপহাস করা । আমাদের উচিত অশাস্ত্রীয়ভাবে ঈশ্বরের দিব্য বৈশিষ্ট্যের প্রতি কুতর্ক না করে বৈদিক শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত মেনে চলা।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ভূত-প্রেত-রাক্ষস-ডাইনি-অসুর- এই সবের কী অস্তিত্ব রয়েছে ? এর থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব?

নির্মূলনঃ- এই সমস্ত ভয়ানক কথা যার প্রভাব দুর্বল ব্যক্তিদের উপর অজ্ঞানতার কারণে হয়। সংক্ষেপে বুঝে নিন –

ভূত – অতীত কালকে ভূত বলে।

প্রেত – মৃতদেহকে প্রেত বলে।

রাক্ষস – এ কাল্পনিক শব্দ। সমস্ত পাপকর্মীদের “রাক্ষস ” বলা হয়।

হিংসক ও অধর্মী বৃত্তিকে রাক্ষসী বৃত্তি বলে। রাক্ষস সেই জাতিকে জানবে যারা সদা নীচ কর্ম করে।

ডাইনি – এও রাক্ষসের মতো এক কাল্পনিক শব্দই। এ স্ত্রীলিঙ্গবাচী শব্দ। রাক্ষসের স্ত্রীলোক কেই ডাইনি বলে।

দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট – ভয়ানক দর্শনধারী – বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট – রক্ত পানকারী চার হাত বিশিষ্ট - দশ মস্তকবিশিষ্ট, নখ দিয়ে কেটে মানুষকে কাঁচা অবস্থায় ভক্ষণকারী - অন্ধকারে পিছু থেকে হামলাকারী – এই সমস্ত ভয়ের কারণে উৎপন্ন ভ্রান্তি যারা লোকের থেকে শোনা কথায় মনযোগ দিলে মনে বাসা বাঁধে। বাস্তবে এমন কিছুই হয় না।

এর থেকে মুক্ত হওয়ার – এই ভ্রান্তির সহজ ঔষধ হলো – প্রভুর নামের স্মরণ। প্রভুর নামে অনেক শক্তি রয়েছে। নামের অর্থকে খেয়াল রেখে তাকে আচরণে প্রয়োগ করা – এরই নাম শক্তি। বৈদিক সাহিত্যে স্বাধ্যায়, এবং ধার্মিক পুস্তক পাঠ করলে জ্ঞান প্রাপ্তি হয় অজ্ঞানতার পর্দা সরে যায়, এর দ্বারাই অন্ধশ্রদ্ধা এবং অন্ধবিশ্বাসের নিবারণ হয়।

©বাংলাদেশ অগ্নিবীর।

মহর্ষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে নারীদের অধ্যাপিকা হওয়ার স্বাধীনতা

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর চিন্তাধারা ছিলো, নারীদের বিদুষী হয়ে কন্যা গুরুকুলগুলোতে শিক্ষিকা হিসেবে শিক্ষা দান করা উচিত এবং কন্যা-পাঠশালাগুলোতে কন্যাদেরকে শিক্ষিত করা উচিৎ। কন্যা-পাঠশালাগুলোতে পুরুষ অধ্যাপক রাখার তিনি নিষেধ করেন -

সেখানে যে সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বা ভৃত্য ও অনুচর থাকবে, তাদের মধ্যে নারীরা কন্যা পাঠশালায় এবং পুরুষরা বালকদের পাঠশালায় থাকবে।

- সত্যার্থ প্রকাশ, ৩য় সমুল্লাস

শুধু তাই নয়, বিদ্যালয়গুলোতে সাম্যভাব বজায় রাখার জন্যও তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ -

রাজকুমার হোক কিংবা দরিদ্রের সন্তান হোক, সকলকে এক রকম বস্ত্র, খাদ্য, পানীয় ও আসন দিতে হবে। সকলকে তপস্বী হতে হবে।

- সত্যার্থ প্রকাশ, ৩য় সমুল্লাস

যাঁরা গুণকর্মানুসারে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হয় তাঁদের জন্য তিনি নির্দেশ দেন -

১। পুরুষ ব্রাহ্মণ বর্ণের হলে বালকদের এবং স্ত্রী সুশিক্ষিতা হলে বালিকাদের বিদ্যা শিক্ষা দিবে। তাঁরা বহুবিধ উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা তাদের বিদ্বান্ করবে ।

২। যদি কেউ শূদ্রকুলে উৎপন্ন হয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হয় তবে সে শূদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হবে। তেমনি কেউ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে শূদ্রের গুণ-কর্ম-স্বভাব বিশিষ্ট হলে সে শূদ্র হবে। এভাবে কেউ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র সদৃশ হলে ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রই হয়ে যায়। অর্থাৎ যে পুরুষ বা স্ত্রী চারবর্ণের মধ্যে যে বর্ণের সদৃশ হবে সে সেই বর্ণেরই হবে।

- - সত্যার্থ প্রকাশ, ৪র্থ সমুল্লাস

নিজ বেদভাষ্যে স্বামীজি লিখেছেন-

১। সর্বে বিদ্বাংসঃ স্বস্য-স্বস্য বিদুষীং স্ত্রিয়ং প্রত্যেবমুপদিশেয়ুস্ত্বয়া সর্বেষাং কন্যা অধ্যাপ্যাস্সর্বাঃ স্ত্রিয়শ্চ সুশিক্ষণীয়াঃ ॥

ঋগ্বেদ ২।৪১।১৭ ভাষ্যভাবার্থ

অর্থাৎ, সমস্ত বিদ্বান ব্যক্তি নিজ নিজ বিদুষী স্ত্রীকে এভাবে উপদেশ দেবেন যে, 'সব কন্যাদের তোমার পড়ানো উচিৎ এবং সব স্ত্রীগণকে সুশিক্ষিত করা উচিৎ'।

২। অধ্যাপকাঃ পুত্রানধ্যাপিকাঃ পুত্রীংশ্চ ব্রহ্মচর্যেণ সংয়োজ্য তেষাং দ্বিতীয়ং বিদ্যাজন্ম সম্পাদ্য জীবনোপায়ান্ সুশিক্ষ্য সময়ে পিতৃভ্যঃ সমর্পয়েয়ুঃ। তে চ গৃহং প্রাপ্যাপি তচ্ছিক্ষাং ন বিস্মরেয়ুঃ ॥

ঋগ্বেদ ১।১১৭।২৪ ভাষ্যভাবার্থ

অর্থাৎ, অধ্যাপকরা পুত্রদের এবং অধ্যাপিকারা পুত্রীদের ব্রহ্মচর্য নিয়মে সংযুক্ত করে তাঁদের দ্বিতীয় বিদ্যাজন্মকে সম্পূর্ণ করে জীবন অতিবাহিত করার উপায় ভালোভাবে শিখিয়ে যথাসময়ে তাদের পিতামাতার নিকটে প্রত্যার্পণ করবে আর গৃহে গিয়েও যেন তারা সেই শিক্ষা ভুলে না যায়।

৩। যা স্ত্রীণাং মধ্যে বিদুষী স্ত্রী স্যাৎ, সা সর্বাঃ স্ত্রিয়ঃ সদা সুশিক্ষেত, যতঃ স্ত্রীণাং মধ্যে বিদ্যাবৃদ্ধিস্স্যাৎ॥

যজুর্বেদ ২০।৮৫ ভাষ্যভাবার্থ

অর্থাৎ, নারীদের মধ্যে বিদুষী নারী থাকুক, সে সব নারীদের সর্বদা সুশিক্ষিত করবে যেন নারীদের মধ্যে বিদ্যার বৃদ্ধি ঘটে ।

৪। যথা প্রভাতবেলা জাগ্রতাং মনুষ্যাণাং সৌখ্যপ্রদা ভবন্তি, তথা বিদুষ্যঃ স্ত্রিয়ঃ কুমারীণাং বিদ্যার্থিনীনাং কন্যানাং বিদ্যাসুশিক্ষাসৌভাগ্যং বর্দ্ধয়িত্বা সদৈতা আনন্দয়ন্তু॥

যজুর্বেদ ৩৪।৪০ ভাষ্যভাবার্থ

অর্থাৎ, প্রভাতবেলা যেভাবে জেগে ওঠা একজন মানুষকে সুখ প্রদান করে, সেভাবেই বিদুষী নারীরা কুমারী বিদ্যার্থী কন্যাদের বিদ্যা, সুশিক্ষা এবং সৌভাগ্যকে বৃদ্ধি করে সবসময় এই সব কন্যাদের যেন আনন্দিত করতে থাকে।

৫। যা স্ত্রিয়ঃ সর্বান্ সাঙ্গোপাঙ্গান্ বেদানধীত্যাধ্যাপয়ন্তি তাঃ সর্বান্ মনুষ্যানুন্নয়ন্তি ॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪১ ভাষ্যভাবার্থ

অর্থাৎ, যে স্ত্রীগণ সাঙ্গোপাঙ্গ সম্পূর্ণ সর্ববেদ পড়ে ও অন্যকে পড়ায়, তাঁরা সর্ব মানবের উন্নতি করে।

৬। যা ভূমিবৎ ক্ষমাশীলাঃ শ্রীবচ্ছোভমানা জলবচ্ছান্তাঃ সখীবদুপকারিণ্যঃ বিদুষ্যোঽধ্যাপিকা স্যুস্তাঃ সকলাঃ কন্যা অধ্যাপনেন সর্বাস্ত্রিয়শ্চোপদেশেনান্দয়ন্ত্বিতি ॥

ঋগ্বেদ ৪।৪০।৭ ভাষ্যভাবার্থ

যে ভূমির মতো ক্ষমাশীল, সম্পদের মতো শোভায়মানা, জলের মতো শান্ত, বান্ধবীর মতো উপকারিণী বিদুষী অধ্যাপিকা হয়, সে কন্যাদের পড়াবে এবং সমস্ত নারীকে উপদেশ দিয়ে আনন্দিত করবে।

স্ত্রীগণ যদি অধ্যাপনা করে তো তাঁরা ঘরের কাজ কেমন করে করতে পারবে ? এই বিষয়ে স্বামীজীর বক্তব্য হলো, দরকার হলে তারা পরিচারিকা রাখতে পারে। যজুর্বেদ ১১।৫৬-এর ভাষ্যভাবার্থে তিনি লিখেছেন,

সতীভিঃ স্ত্রীভিঃ সুশিক্ষিতাশ্চতুরাঃ পরিচারিকা রক্ষণীয়া। যতঃ সর্বাঃ পাকাদিসেবা যথাকালং স্যুঃ॥

শ্রেষ্ঠ নারীদের উচিত, তারা সুশিক্ষিত, চতুর পরিচারিকা রাখা । যাতে রান্না করা থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এই মন্ত্রেরভাষ্যেই পরিচারিকার গুণও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা প্রীতিযুক্ত, উত্তম কেশযুক্ত, সুন্দরশ্রেষ্ঠ কর্মকত্রী এবং উত্তম স্বাদযুক্ত ভোজন তৈরি করতে পারে এমন গুণ থাকা উচিৎ।

আজ কন্যা গুরুকুলগুলোতে যে বিশাল সংখ্যাক আচার্যা, শিক্ষার্থী, যোদ্ধা থেকে সর্বস্তরের আদর্শ মানুষ তৈরি হচ্ছে তার পথিকৃৎ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীই । সনাতন ধর্মের এই অগ্রযাত্রায় যে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীরই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । যখন বিশ্বের সর্বত্র এই ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত হবে তখনই একমাত্র আদর্শ মানব-সমাজ গঠিত হবে ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদ ও বৈদিক যুগে প্রতিমাপূজা সম্পর্কে গবেষকদের সিদ্ধান্ত

ওঽম্ তৎ সৎ

নমস্তে ।

বর্তমান সম্পর্কে বেদ ও প্রতিমাপূজা সম্পর্কে একটি অনাবশ্যক দ্বন্দ তৈরি হয়েছে । ভূতপূর্ব সময় থেকেই বেদে যে প্রতিমাদিপূজা নেই তা স্বীকৃত । কিন্তু আধুনিককালে সম্প্রদায়গত স্বার্থে ও যেহেতু সনাতনীরা মূল বৈদিক ধারা গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারছেন তাই সব মতবাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে তাদের সিদ্ধান্তগুলোকে বেদের নামে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। বেদে সাকারবাদ অন্বেষনের পুরাতন কৌশলই । বেদে ব্রহ্ম সাকার নয় এটিই সর্বজন বিদিত। কিছু পৌরাণিক বেদে জোরপূর্বক কুভাষ্য থেকে ঈশ্বর সাকার দেখানোর চেষ্টা করেন। মজার ব্যাপার হলো সেখানে অধিকাংশস্থলেই দেবতাদেরই সাকার প্রমাণ হয় কেননা সায়ণভাষ্য অনুযায়ী দেবতা ও ব্রহ্ম তো এক নয় । আর অদ্বৈতবাদী সায়ণের ভাষ্য দ্বারা বেদে সাকারবাদ খোঁজ করা বাতুলতা । কেননা অদ্বৈতবাদীরাও মানে ব্রহ্ম নির্গুণ নিরাকার । সগুণ বা সাকার এসব দ্বৈতভাবে সাময়িক সত্য হলেও পারমার্থিক সত্য নয় । পাশাপাশি পৌরাণিক কোন বেদভাষ্য সম্পূর্ণ সঠিক তাতেও প্রমাণে আসতে রাজি না । কেননা না আছে তেমন মানদণ্ড না আছে তা প্রমাণের ক্ষমতা । বেদের ভুল অনুবাদ, উপনিষদের যথাযথ ব্যাখ্যা না করে খণ্ডিতাংশ প্রচার করে । পুরাণের বেলাতেও যদিও তাদের মধ্যেই মতভেদ বিদ্যমান যখন বিপদে পড়ে তখন রূপক বা ঐ অংশ মানি না বলে । রামায়ণ - মহাভারত পড়ার জীবনে এদের উদ্দেশ্য কেবল 'সাকার আর মূর্তিপূজা' অন্বেষণ করা । বিলুপ্ত সহস্রাধিক শাখার বিপরীতে কিছু শাখার অতিরিক্ত বা পরিশিষ্ট দিয়ে প্রতিমাপূজা প্রমাণ করতে চাওয়ারা বিধর্মীদের কাছে এই অস্ত্র তুলে দিচ্ছে যে শাখাও যেহেতু বেদ তাই ৯০% যেসব শাখা হারিয়ে গিয়েছে তাই বেদও হারিয়ে গিয়েছে। যদিও বিধর্মী ও পৌরাণিক উভয়েই বেদের প্রচার হ্রাস ও খণ্ডিতাংশ দ্বারা স্বার্থসিদ্ধি করতে পারলেই খুশি হয় । বেদ - উপনিষদের যত জায়গায় তারা সাকারবাদ বা মূর্তিপূজা দেখাতে চায় তার সব খণ্ডন পাবেন এখানে -https://back2thevedas.blogspot.com/2023/12/blog-post_27.html?m=1

এখন আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা 'বিখ্যাত' গবেষকদের মতামত সম্পর্কে জানবো যে বেদে প্রতিমাপূজা আছে নাকি নেই । বলা বাহুল্য এসবই 'দুর্জনসন্তোষ' ন্যায় অনুযায়ী নেওয়া । শাস্ত্র প্রমাণই মূল । এসব প্রমাণ প্রদর্শন কেবল সুনির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর জন্য ।

১. রমেশ চন্দ্র দত্তঃ ইনি ঋগ্বেদের বাংলা অনুবাদক । সায়ণভাষ্যানুযায়ী তিনি বেদের বাংলা অনুবাদ করেছেন। অধিকাংশ স্থলে এখনো এই অনুবাদ অনুযায়ীই চলা হয় পৌরাণিকরাও বাংলায় এটি অনুসরণ করেন । তার বই Ancient India-তে তিনি লিখেছেন যে বৈদিক যুগ এবং বেদে মূর্তিপূজা হতোনা ।

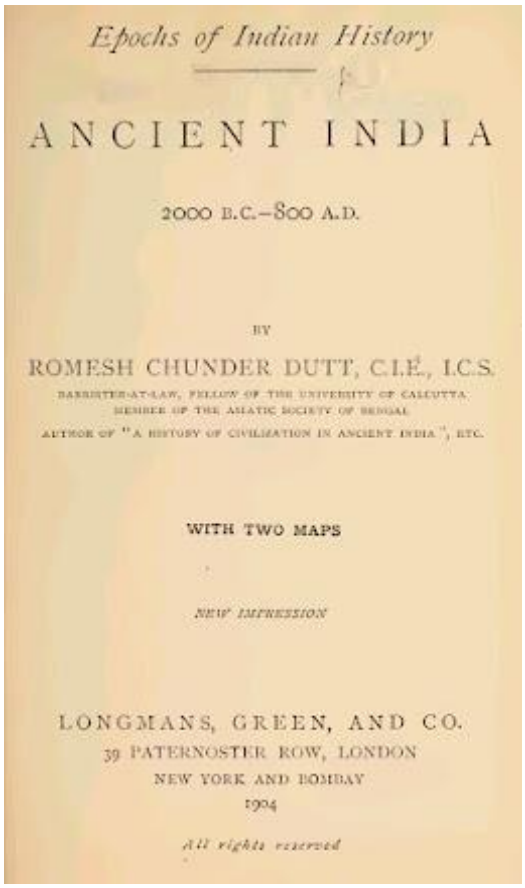

Epochs of Indian History

ANCIENT INDIA

2000 B.C.–800 A.D.

BY

ROMESH CHUNDER DUTT, C.I.E., I.C.S.

BARRISTER-AT-LAW, FELLOW OF THE UNIVERSITY OF CALCUTTA
MEMBER OF THE ASIATIC SOCIETY OF BENGAL
AUTHOR OF "A HISTORY OF CIVILISATION IN ANCIENT INDIA", ETC.

WITH TWO MAPS

NEW IMPRESSION

LONGMANS, GREEN, AND CO.
39 PATERNOSTER ROW, LONDON
NEW YORK AND BOMBAY
1904

All rights reserved

বইটির পৃষ্ঠা ৩২ - তিনি লিখেছেন, বেদে কোথাও কোন মূর্তির উল্লেখ নেই এবং প্রারম্ভিক হিন্দুরা পৌত্তলিক ছিলো না ।

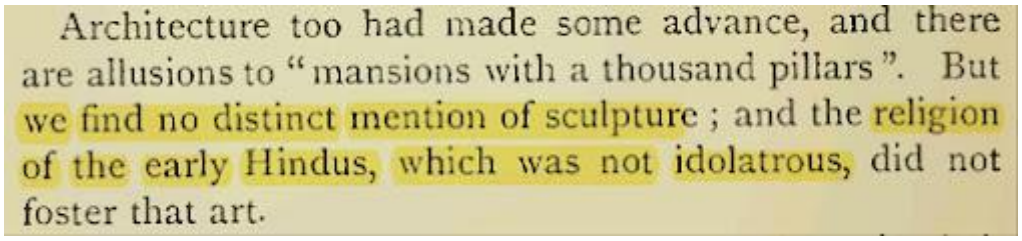

Architecture too had made some advance, and there are allusions to "mansions with a thousand pillars". But we find no distinct mention of sculpture; and the religion of the early Hindus, which was not idolatrous, did not foster that art.

বইটির পৃষ্ঠা ৬০ - তিনি লিখেছেন, বৈদিক যুগে কোন মূর্তি পুজা হতো না ।

they rich or poor, performed their little rites at their domestic firesides. No idol was worshipped, and no temple was known ; the descendants of the Vedic Hindus still went through their religious ceremonies in their own homes, and offered oblations and prayers according to ancient rule.

The History of Ancient India গ্রন্থের ভূমিকার xxxiii পৃষ্ঠাতেই একই কথা বলেছেন ।

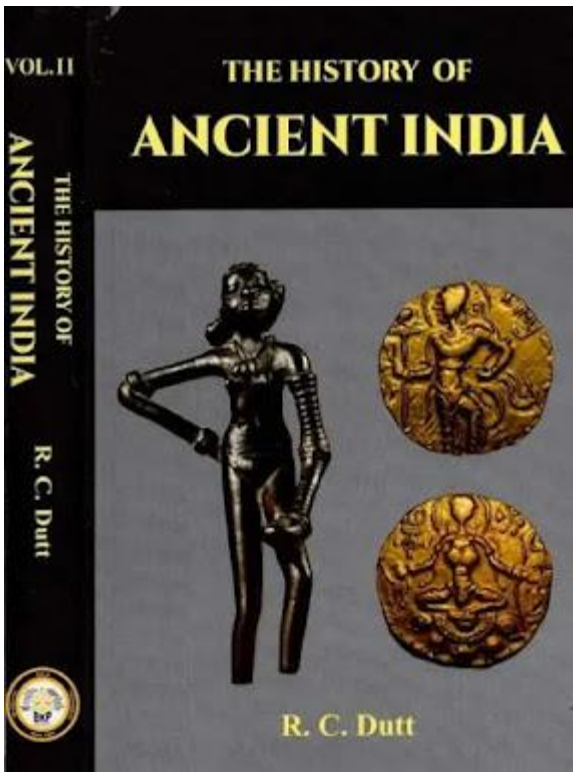

in times of peace, went out to defend his village or plunder the aborigines in times of war, and often composed spirited hymns to the martial god Indra in his hours of devotion. There were no temples and no idols; each patriarch of a family lighted the

২. ড. হংস নারায়ণ ভট্টাচার্যঃ হিন্দুদের দেবদেবী - উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন বৈদিক যুগে মূর্তি গড়ে পুজা হতো এই বক্তব্য নিছক কল্পনাভিত্তিক ।

বৈদিক যুগে দেবতাদের মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল এবং মূর্তি গড়া হোত এরূপ অভিমত নিছক কল্পনাভিত্তিক। বেদের মন্ত্রে দেবতাদের রূপগুণের বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু মন্ত্রবর্ণিত দেবতার রূপ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ দেব-বিগ্রহ নির্মাণ করা সম্ভব বিবেচিত হয় না। তাছাড়া এক দেবতার সঙ্গে অন্যান্য দেবতার রূপ এবং গুণের সাদৃশ্য এত বেশী যে, এক দেবতা থেকে আর এক দেবতাকে সম্পূর্ণ পৃথক করা দুঃসাধ্য বোধ হয়। অনেক দেবতার বর্ণনাতেই হিরণ্যবর্ণ, হিরণ্যবাহু,

বলা বাহুল্য ড. অবিনাশচন্দ্র দাস ও Dr. Bollenson এর মত এতেই খণ্ডিত হয় । সুতরাং তাদের কোন মত ধর্তব্য নয়।

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিত ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে বৈদিক যুগেই মূর্তিপূজার আবির্ভাব হয়েছে। Dr Bollenson লিখেছেন, "From the common appellation of the gods as 'divo-naras' men of sky or simply 'naras' 'men' and from the epithet 'nripesas' having the form of 'men' we may conclude that the Indians did not merely in imagination assign human forms to their gods, but also represented them in a sensible manner Thus a painted image of Rudra (R. V 2 33 9) is described with long limbs, many formed, awful, brown, he is painted with colours."[২]

ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসও এই মতের সমর্থক। তিনি একবার লিখেছেন যে ঋগ্বেদের যুগে দেবতাদের মূর্তি গড়া হোত—কিন্তু পূজা করা হোত না। "there may have existed images of the Gods, though their worship was not much in vogue and was sometimes condemned "[৩]

তিনি আর একবার লিখেছেন যে ঐ যুগে দেবতার মূর্তিপূজা হোত, এমন কি মূর্তি বিক্রয়ও হোত। "The above brief description of Indra's appearance is sufficiently anthropomorphic, and it was not unnatural that images were made of him, worshipped and sometimes sold for an adequate value "[৪]

লেফ্‌টেন্যান্ট, কেনেডি তাঁর 'Ancient and Hindu Mythology' গ্রন্থে Praep Evan-এর গ্রন্থ থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে মিশরে সর্বপ্রথম

এই দুই মতের বিরুদ্ধের মত উপরে তুলে ধরা হয়েছে ।

৩. Horace Hayman Wilson তথা H. H. Wilson ঋগ্বেদ ও বিষ্ণু পুরাণ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন । রামকৃষ্ণ মিশন অব কালচারাল ইন্সটিটিউট বহুস্থলে অনুবাদে উইলসনের অনুবাদের সাহায্য নিয়েছেন । তিনি তার ঋগ্বেদের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকার ২২ নং পৃষ্ঠায় বলেছেন, বেদে কোথাও কোন মন্দিরের উল্লেখ নেই যেখানে প্রকাশ্যে উপাসনা হতো ।

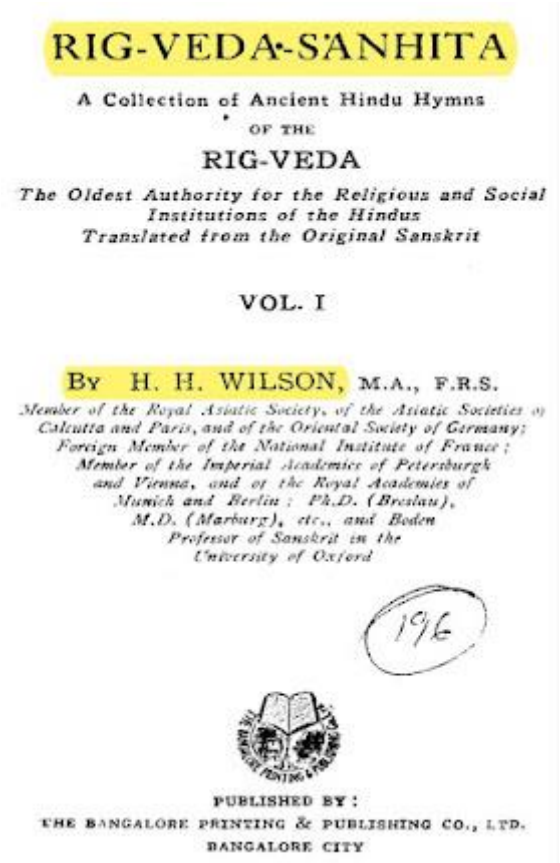

RIG-VEDA-SANHITA

A Collection of Ancient Hindu Hymns
OF THE
RIG-VEDA
The Oldest Authority for the Religious and Social Institutions of the Hindus
Translated from the Original Sanskrit

VOL. I

By H. H. WILSON, M.A., F.R.S.
Member of the Royal Asiatic Society, of the Asiatic Societies of Calcutta and Paris, and of the Oriental Society of Germany; Foreign Member of the National Institute of France; Member of the Imperial Academies of Petersburgh and Vienna, and of the Royal Academies of Munich and Berlin; Ph.D. (Breslau), M.D. (Marburg), etc., and Boden Professor of Sanskrit in the University of Oxford

196

PUBLISHED BY:
THE BANGALORE PRINTING & PUBLISHING CO., LTD.
BANGALORE CITY

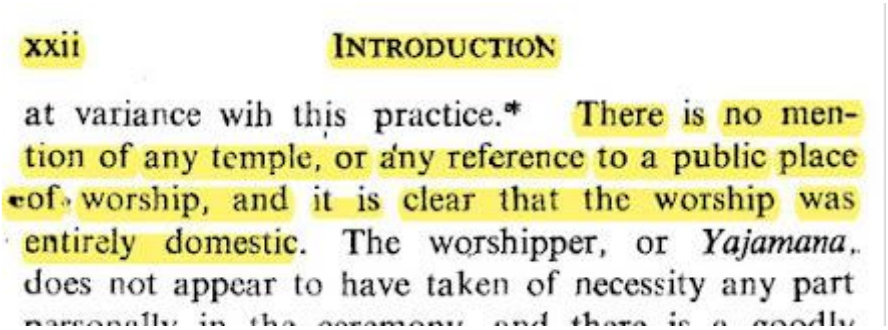

xxii INTRODUCTION

at variance wih this practice.* There is no mention of any temple, or any reference to a public place of worship, and it is clear that the worship was entirely domestic. The worshipper, or *Yajamana*, does not appear to have taken of necessity any part

উইলসন তার বিষ্ণু পুরাণের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকার ৩ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বেদে অধিকাংশ স্থলে গৃহস্থালী যজ্ঞের উল্লেখ পাওয়া যায় , কোন মন্দিরের উল্লেখ নেই.. এক কথায় বলতে গেলে বৈদিক ধর্ম মূর্তিপূজক ছিলো না ।

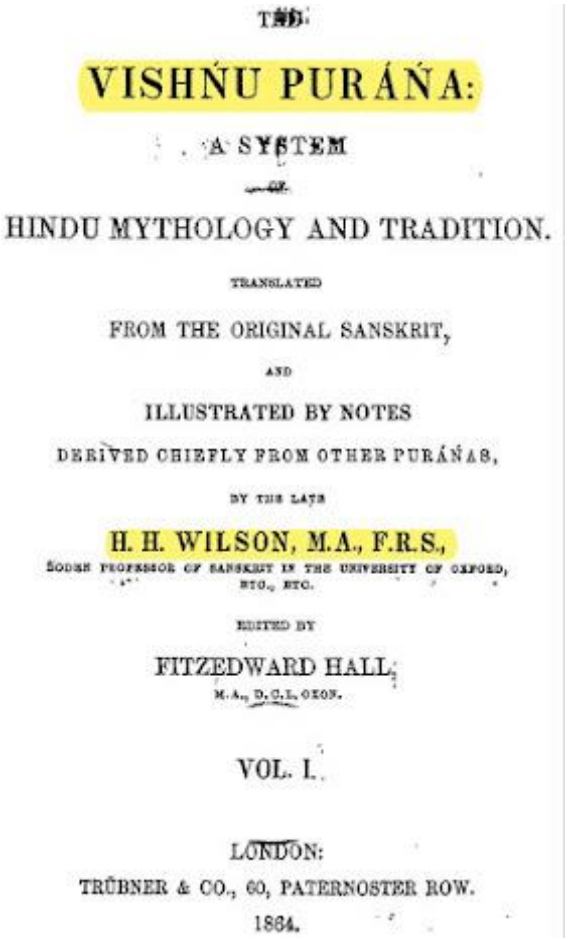

THE

VISHŃU PURÁŃA:

A SYSTEM

OF

HINDU MYTHOLOGY AND TRADITION.

TRANSLATED

FROM THE ORIGINAL SANSKRIT,

AND

ILLUSTRATED BY NOTES

DERIVED CHIEFLY FROM OTHER PURÁŃAS,

BY THE LATE

H. H. WILSON, M.A., F.R.S.,

BODEN PROFESSOR OF SANSKRIT IN THE UNIVERSITY OF OXFORD,
ETC., ETC.

EDITED BY

FITZEDWARD HALL,

M.A., D.C.L. OXON.

VOL. I.

LONDON:

TRÜBNER & CO., 60, PATERNOSTER ROW.

1864.

Indra, the firmament; Váyu, the air; Varuńa, the water; of Áditya, the sun; Soma, the moon; and other elementary and planetary personages. It is also true that the worship of the Vedas is, for the most part, domestic worship, consisting of prayers and oblations offered—in their own houses, not in temples—by individuals, for individual good, and addressed to unreal presences, not to visible types. In a word, the religion of the Vedas was not idolatry.

৪. স্বামী বিবেকানন্দঃ স্বামী বিবেকানন্দের নিঃসন্দেহে প্রতীকোপাসক ছিলেন ও এরপক্ষে নানা বক্তব্য ও যুক্তিও দিয়েছেন । যদিও তার নানা বক্তব্য নানা স্থানে নানা রকম তারপরেও দেখা যায় বেদে প্রতিমাপুজা আছে তা তিনি স্বীকার করেননি ।তার মতে, 'বেদে মূর্তিপূজার উল্লেখ নাই। স্রষ্টা এবং সখারূপে ঈশ্বরের অভাববোধের প্রতিক্রিয়া হইতেই শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের মূর্তিকে ঈশ্বর কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে।' - স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, দ্বিতীয় খণ্ড, জ্ঞান যোগ কথা

দারু ও শিলা হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষ পর্যন্ত ইহা ব্যাপৃত। সাকারোপাসনা সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সতত বিরুদ্ধভাব হইতেই ভারতে মূর্তিপূজার সূত্রপাত হইয়াছে। বেদে মূর্তিপূজার উল্লেখ নাই; স্রষ্টা এবং সর্বরূপে ঈশ্বরের অভাববোধের প্রতিক্রিয়া হইতেই শ্রেষ্ঠ আচার্যগণকে মূর্ত ঈশ্বর কল্পনা করিয়া লওয়া হইয়াছে। বুদ্ধদেব ঠিক এইভাবে মূর্ত-ঈশ্বররূপে লক্ষ লক্ষ মানুষের দ্বারা অর্চিত হইতেছেন। হিংসামূলক সংস্কার-চেষ্টার দ্বারা প্রকৃত সংস্কার সর্বদাই বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্চনার প্রবৃত্তি প্রত্যেক মানুষেরই প্রকৃতিগত; উচ্চতম দার্শনিকতার সাহায্যেই শুধু শুদ্ধ ভাবময় অবস্থায় আরোহণ করা যায়। কাজেই পূজা করিবার জন্যই মানুষ

৫. দুর্গাদাস লাহিড়ী ঋগ্বেদের মর্ম্মানুসারী ব্যাখ্যার ভূমিকায় লিখেছেন বৈদিক দেবতাদের উপাসনার পদ্ধতি ২ প্রকার - স্তোত্র পাঠ ও ঘৃতাদি আহুতি প্রদান - পৃষ্ঠা ৬০। এতেও প্রমাণিত হয় মূর্তিপূজা হতো না ।

দানব প্রভৃতির [illegible] স্তোত্র আছে। বৈদিক দেবতাগণের উপাসনা-পদ্ধতি—প্রধানতঃ দুই প্রকার। কোনও কোনও দেবতার মহিমা বর্ণনা করিয়া স্তোত্র পাঠ হইয়া থাকে; কোনও কোনও দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি আহুতি প্রদান করা হয়। এই হিসাবে, প্রথমোক্ত দেবতাগণ 'যাগার্হ' দেবতা, এবং শেষোক্ত দেবতাগণ 'স্তোত্রার্হ' দেবতা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জৈমিনির মতে,—"দেবতা কখনও শরীরী জীব হইতে পারেন না।"

৭. ড. দুর্গাদাস বসু সরস্বতী তার 'হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব' বইয়ের ১০০পৃষ্ঠাতেও বলেছেন ব্রহ্মের কোন প্রতিমা হয় না ।

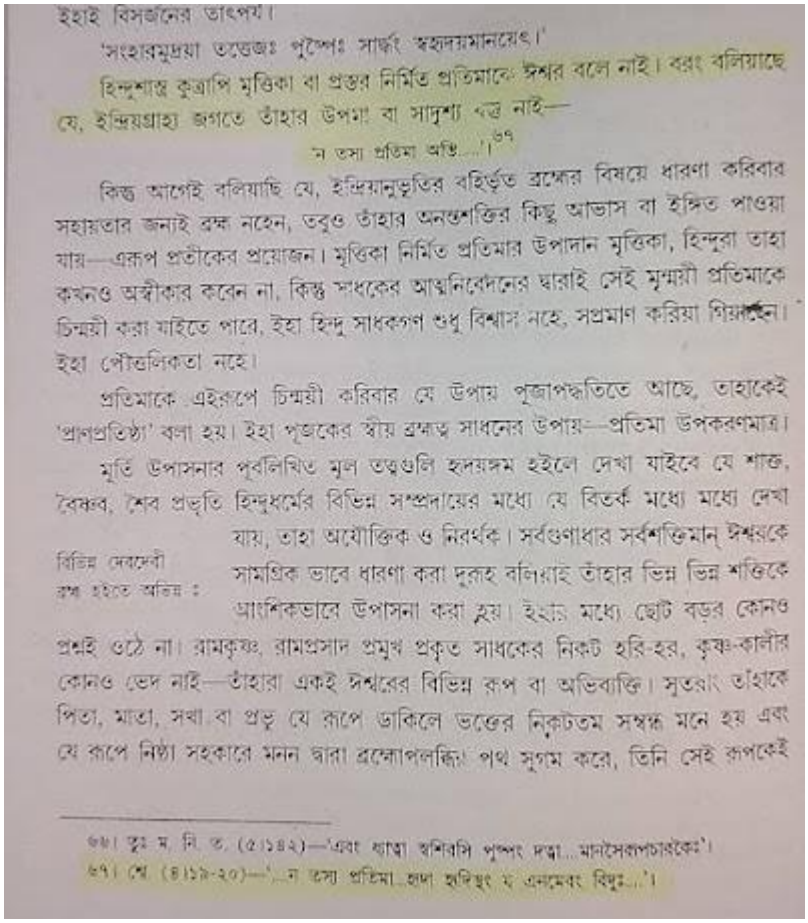

ইহাই বিসর্জনের তাৎপর্য।

'সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ পুষ্পৈঃ সার্দ্ধং স্বহৃদয়মানয়েৎ।'

হিন্দুশাস্ত্র কুত্রাপি মৃত্তিকা বা প্রস্তর নির্মিত প্রতিমাকে ঈশ্বর বলে নাই। বরং বলিয়াছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তাঁহার উপমা বা সাদৃশ্য বস্তু নাই—

'ন তস্য প্রতিমা অস্তি...'।[৬৭]

কিন্তু আগেই বলিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির বহির্ভূত ব্রহ্মের বিষয়ে ধারণা করিবার সহায়তার জন্যই ব্রহ্ম নহেন, তবুও তাঁহার অনন্তশক্তির কিছু আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়—এরূপ প্রতীকের প্রয়োজন। মৃত্তিকা নির্মিত প্রতিমার উপাদান মৃত্তিকা, হিন্দুরা তাহা কখনও অস্বীকার করেন না, কিন্তু সাধকের আত্মনিবেদনের দ্বারাই সেই মৃন্ময়ী প্রতিমাকে চিন্ময়ী করা যাইতে পারে, ইহা হিন্দু সাধকগণ শুধু বিশ্বাস নহে, সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। ইহা পৌত্তলিকতা নহে।

প্রতিমাকে এইরূপে চিন্ময়ী করিবার যে উপায় পূজাপদ্ধতিতে আছে, তাহাকেই 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' বলা হয়। ইহা পূজকের স্বীয় ব্রহ্মত্ব সাধনের উপায়—প্রতিমা উপকরণমাত্র।

বিভিন্ন দেবদেবী ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ঃ

মূর্তি উপাসনার পূর্বলিখিত মূল তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম হইলে দেখা যাইবে যে শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিতর্ক মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, তাহা অযৌক্তিক ও নিরর্থক। সর্বগুণাধার সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে সামগ্রিক ভাবে ধারণা করা দুরূহ বলিয়াই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তিকে আংশিকভাবে উপাসনা করা হয়। ইহার মধ্যে ছোট বড়র কোনও প্রশ্নই ওঠে না। রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ প্রমুখ প্রকৃত সাধকের নিকট হরি-হর, কৃষ্ণ-কালীর কোনও ভেদ নাই—তাঁহারা একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ বা অভিব্যক্তি। সুতরাং তাঁহাকে পিতা, মাতা, সখা বা প্রভু যে রূপে ডাকিলে ভক্তের নিকটতম সম্বন্ধ মনে হয় এবং যে রূপে নিষ্ঠা সহকারে মনন দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধির পথ সুগম করে, তিনি সেই রূপকেই

৬৬। তুঃ ম. নি. ত. (৫।১৪২)—'এবং ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বা...মানসৈরূপচারকৈঃ'।

৬৭। শ্বে. (৪।১৯-২০)—'...ন তস্য প্রতিমা...জন্ম অস্তিত্বং য এনমেবং বিদুঃ...'।

ড. দুর্গাদাস বসু, তিনি তার হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব গ্রন্থের ৪র্থ অধ্যায়ে লিখেছেন,

"...উপাসকের উপাসনার সহায়তার জন্যই হিন্দুধর্মে অরূপ ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা মূর্তির কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়, অশরীরী স্বরূপের পরিবর্তন হয় না।"

৮. Sir Monier Monier-Williams তার Indian Wisdom বইতে ২২৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন মনুর যুগেও মূর্তিপূজা ছিলো কিনা তা খুবই সন্দেহজনক ।

INDIAN WISDOM

RELIGIOUS, PHILOSOPHICAL, AND ETHICAL
DOCTRINES. OF THE HINDUS:

WITH A BRIEF HISTORY

OF THE CHIEF DEPARTMENTS OF SANSKRIT LITERATURE,

AND SOME ACCOUNT OF THE

PAST AND PRESENT CONDITION OF INDIA,
MORAL AND INTELLECTUAL.

BY

MONIER-WILLIAMS, M.A.

SECOND EDITION

(= *Cārvāka*, Kullūka II. 11), and *Pāshaṇḍinaḥ*, 'heretics'
(= *Śākya-bhikshu-kshapaṇakādi*, Kullūka IV. 30, I. 118).

[1] It is very doubtful whether idolatry was at all commonly practised at the time of the compilation of the Code. We have already seen that

৯. Mountstuart Elphinstone এর The *history of India* বইয়ের ৭৩ পৃষ্ঠাতে দেখি তিনি বৈদিক যুগে কোন প্রতিমা বা তার উপাসনার মন্দির অস্বীকার করেছেন ।

THE

HISTORY OF INDIA

The Hindu and Mahometan Periods

BY THE HON. MOUNTSTUART ELPHINSTONE

SEVENTH EDITION, WITH NOTES AND ADDITIONS

By E. B. COWELL, M.A.

LATE PRINCIPAL OF SANSKRIT COLLEGE, CALCUTTA

LONDON
JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET
1889

The right of translation is reserved.

of special adoration'; and Mr. Colebrooke could discover no passage in which their incarnations were suggested.

There seem to have been no images and no visible types of the objects of worship.[8]

The doctrine of monotheism prevails through- Religion

১০.

রামকৃষ্ণ মিশনেরই স্বামী নিবেদানন্দ বলেছেন,

"আমরা আরাধ্য দেবতার প্রতীক বা প্রতিমা রচনা করে তার সম্মুখে যে অর্ঘ্য নিবেদন করি, আমাদের বৈদিক পূর্বপুরুষগণ এরূপ করতেন না। পরবর্তীকালের শাস্ত্র হতে (সাধারণত তন্ত্র) বর্তমানে প্রচলিত মন্ত্র ও পূজাবিধি গৃহীত হয়েছে।"

- তথ্যসূত্র: [হিন্দুধর্ম, প্রবৃত্তিমার্গ, পঞ্চম সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৩৫]

খানিকটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কার হইলে যে ঐহিক ও পারত্রিক সুখভোগের অধিকারী হওয়া যায়, ইহা একটি শাশ্বত সত্য। প্রাচীন ঋষিগণ ইহা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। এই সত্যটির উপরেই প্রবৃত্তিমার্গ প্রতিষ্ঠিত। পুরাকালের মত এই সত্যটি যে আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। কালক্রমে হিন্দুধর্মের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রবৃত্তিমার্গের মূলতত্ত্বগুলি অবশ্য এখনও অব্যাহত আছে, কিন্তু সাধনার পদ্ধতিতে ঘটিয়াছে আমূল পরিবর্তন।

দেবযজ্ঞের কথা ধরা যাক। পুরাকালে হিন্দুরা বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে স্তুতি করিতেন এবং যথাবিহিত মন্ত্র পাঠ করিয়া দধি, ঘৃত প্রভৃতি অগ্নিতে আহুতি দিতেন। এইসব স্তব, মন্ত্র ও অনুষ্ঠান-বিধি বেদ হইতে গ্রহণ করা হইত।

আজকাল সাধারণতঃ আমরা দেবার্চনা করি ধূপদীপ, ফুলফল, মিষ্টান্নাদি দিয়া। এইসময় আমরা যেসব স্তব ও মন্ত্রপাঠ করি তাহাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। তারপর, আমরা আরাধ্য দেবতার প্রতীক[১] বা প্রতিমা রচনা করিয়া তাহার সম্মুখে অর্ঘ্য নিবেদন করি। আমাদের বৈদিক পূর্বপুরুষগণ এরূপ করিতেন না। পরবর্তীকালের শাস্ত্র হইতে (সাধারণতঃ তন্ত্র) বর্তমানে প্রচলিত মন্ত্র ও পূজাবিধি গৃহীত হইয়াছে।[২] যজ্ঞে আহুতিদান এখন কোন কোন পূজার একটি অঙ্গমাত্রে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য এখনও কদাচিৎ কেহ বিশেষ কোন

১ যেমন বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রামশিলা বা শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ। দ্রঃ পঃ ১১শ অধ্যায়।

২ দ্রঃ পঃ ১২শ অধ্যায়।

১১. রামকৃষ্ণ মিশনের *The Cultural Heritage of India* গ্রন্থ থেকে। Vol-1 পৃষ্ঠা **৫৯১**।

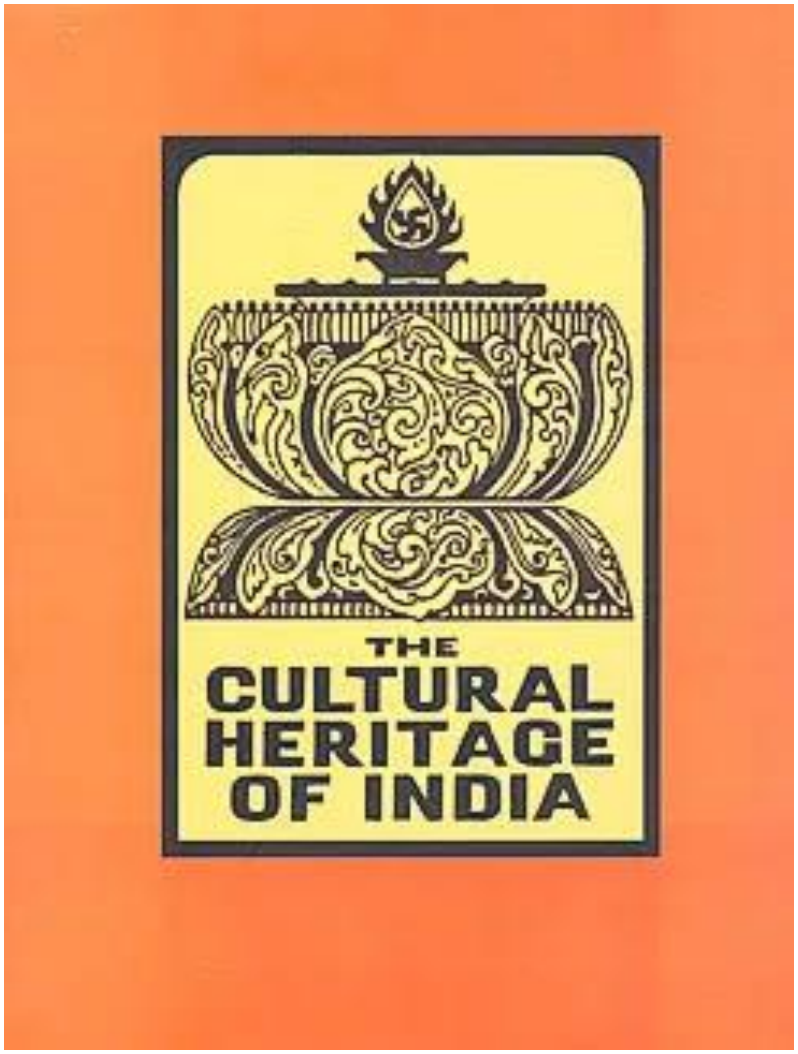

vol-1 page 591

BUDDHISM IN INDIAN LIFE AND THOUGHT

Gāndhāra school of sculpture and architecture, and in its national orientation, which found its consummation in the Gupta period, and in the cave-paintings of Ajanta, we find a resurgence of positive devotion and love. The images of the Buddha and the superb *stūpas* that have survived the ravages of time and the vandalism of barbarians bear eloquent testimony to the beneficial influence of Buddhist spiritualism.

It may be a paradox that the Buddha, who decried the worship of gods and goddesses, was himself turned into the supreme God of love and benevolence. However, the creative impulse of the followers of the Buddha spread its wholesome contagion to the Brāhmaṇas and the Jains also. The Vedic religion has no scope for the worship of images and idols, and there is considerable substance and truth in the contention of the Ārya Samājists that image-worship was only a latter-day innovation. Whatever may have been the position in the Vedic period, worship of gods and construction of temples have become widespread from the first century of the Christian era. Scholars have found in this change-over the influence of Buddhist art and architecture, which may have derived the original inspiration from the Greeks, who adopted the gospel of the Buddha.

একই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে -

proved to be the deciding factor in the battle.

VEDIC RELIGION

Vedic religion is, broadly speaking, polytheistic, and therefore affords ample scope for an exuberant growth of myths and legends. Further, like every polytheistic religion, it is conspicuously tolerant in attitude. This fact has resulted in the assimilation by it of varied mythological trends. There are, in Vedic religion, also clear traces of animism, which however has not proved very fruitful from the mythological point of view. It only indicates that Vedic religion was tending towards a sort of pantheism, and was thus gradually becoming spiritual in character. Incidentally, it may be pointed out that Vedic religion shows hardly any traces of idolatry.

The more or less comprehensive statement of the early Vedic mytho-

[11] X. 95.
[12] *Sat. Br.*, XI. 5. 1 ; *Ka. U.*, 8. 10 ; *Mbh.*, I. 75. 15 ff ; *Hv.*, 1563 ff ; *Vişnu*, IV. 6. 19 ff ; *Mat.*, 24.

230

যদি কেউ মনে করে কেবল প্রতিমাতেই ঈশ্বর আবদ্ধ বা প্রতিমাটিই ঈশ্বর তবে তার সেই জ্ঞানকে গীতা ভাষ্যকারগণ তামসিক বলেছেন।

১. কৃষ্ণানন্দ স্বামী

২২—২৩ শ্লোক অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ। ৬৯৫

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২॥
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩॥

অন্বয়বোধিনী। যৎ তু (যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্য্যে (এক বা আংশিক বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণ বলিয়া) সক্তম্ (আবদ্ধ হয়), অহৈতুকম্ (অযৌক্তিক), অতত্ত্বার্থবৎ (অযথার্থ), অল্পং চ (ও তুচ্ছ), তৎ (সেই জ্ঞান) তামসম্ (তামস) [বলিয়া] উদাহৃতম্ (কথিত হয়)॥ ২২॥

বঙ্গানুবাদ। আর যে জ্ঞানের দ্বারা কোন একটি পদার্থবিশেষে সম্পূর্ণ আত্মার বিদ্যমানতার অনুভব হয়, সেই অযৌক্তিক ও অযথার্থ জ্ঞানই তামস জ্ঞান॥ ২২॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যত্ত্বিতি। যত্তু জ্ঞানং কৃৎস্নবৎ সমস্তবৎ সর্ব্ববিষয়মিবৈকস্মিন্ কার্য্যে দেহে বহির্বা প্রতিমাদৌ সক্তমেতাবানেবাত্মেশ্বরো বা। নাতঃ পরমস্তীতি। যথা নক্তঞ্চরকাদীনাং শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা পাষাণদার্ব্বাদিমাত্রম্। ইত্যেবমেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকং হেত্বর্জ্জিতং নির্যুক্তিকং নিষ্প্রমাণকমতত্ত্বার্থবদ্যথাজ্ঞতত্ত্বার্থবৎ। যথাজ্ঞতোঽর্থস্তত্ত্বার্থঃ। সোঽস্য জ্ঞেয়ত্বতোঽস্তীতি তত্ত্বার্থবৎ। ন তত্ত্বার্থবলতত্ত্বার্থবৎ। অহৈতুকত্বাদেবাল্পং চ। অল্পবিষয়ত্বাদল্পফলত্বাদ্বা। তত্তামসমুদাহৃতম্। তামসানাং হি প্রাণিনামবিবেকিনামীদৃশং জ্ঞানং দৃশ্যতে॥২২॥

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা। তামসং জ্ঞানমাহ—যদিতি। একস্মিন্ কার্য্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্—এতাবানেবাত্মেশ্বরো বা ইতাভিনিবেশযুক্তম্। অহৈতুকং নিরুপপত্তিকম্। অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবগ্রহনশূন্যম্। অত এবাল্পং তুচ্ছম্। অল্পবিষয়ত্বাৎ। অল্পফলত্বাচ্চ। যদেবম্ভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২॥

গীতার্থসন্দীপনী। আত্মা অখণ্ড ও সর্ব্বব্যাপী। সেই পরিপূর্ণ আত্মা কোন একটি দেহবিশেষে বা কোন একটি মূর্ত্তিবিশেষে অথবা কোন একটি কার্য্যবিশেষে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ বা সংস্থিত, অর্থাৎ সেই নিরূপিত দেহ, বিগ্রহ বা কার্য্য ব্যতীত আত্মা আর কোথাও নাই, এতাদৃশ বুদ্ধি তামস জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। এই জ্ঞান আত্মার নিত্যত্ব ও বিভুত্বের বিরোধী॥ ২২॥

২. শঙ্করাচার্য

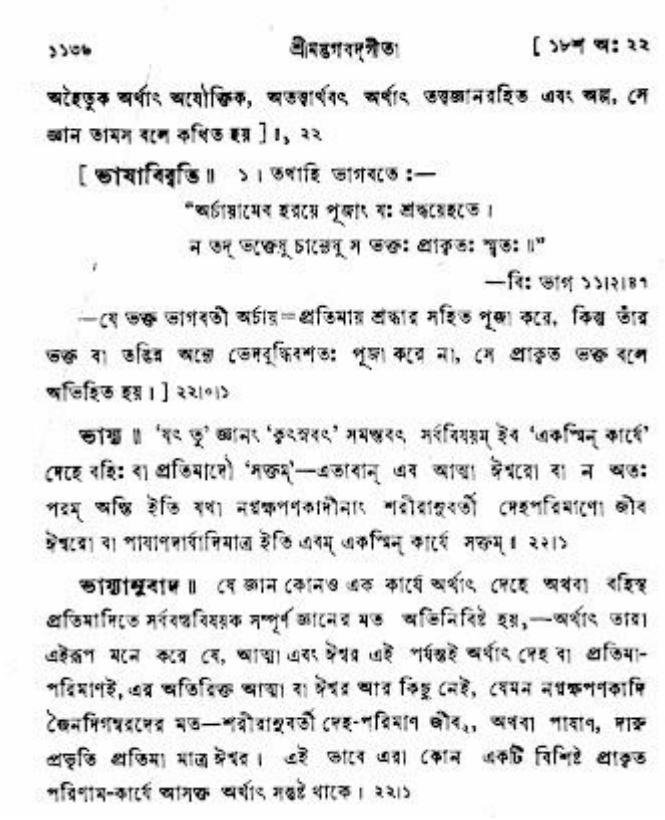

১১৩৬ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [১৮শ অঃ ২২

অহৈতুক অর্থাৎ অযৌক্তিক, অতত্ত্বার্থবৎ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরহিত এবং অল্প, সে জ্ঞান তামস বলে কথিত হয়] ।, ২২

[**ভাষাবিবৃতি** ॥ ১। তথাহি ভাগবতে :—

"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

—বিঃ ভাগ ১১।২।৪৭

—যে ভক্ত ভাগবতী অর্চায়=প্রতিমায় শ্রদ্ধার সহিত পূজা করে, কিন্তু তাঁর ভক্ত বা তদ্ভিন্ন অন্যে ভেদবুদ্ধিবশতঃ পূজা করে না, সে প্রাকৃত ভক্ত বলে অভিহিত হয়।] ২২।৩।১

ভাষ্য ॥ 'যৎ তু' জ্ঞানং 'কৃৎস্নবৎ' সমস্তবৎ সর্ববিষয়ম্ ইব 'একস্মিন্ কার্যে' দেহে বহিঃ বা প্রতিমাদৌ 'সক্তম্'—এতাবান্ এব আত্মা ঈশ্বরো বা ন অতঃ পরম্ অস্তি ইতি যথা নগ্নক্ষপণকাদীনাং শরীরানুবর্তী দেহপরিমাণো জীব ঈশ্বরো বা পাষাণদার্বাদিমাত্র ইতি এবম্ একস্মিন্ কার্যে সক্তম্। ২২।১

ভাষ্যানুবাদ ॥ যে জ্ঞান কোনও এক কার্যে অর্থাৎ দেহে অথবা বহিস্থ প্রতিমাদিতে সর্ববস্তুবিষয়ক সম্পূর্ণ জ্ঞানের মত অভিনিবিষ্ট হয়,—অর্থাৎ তারা এইরূপ মনে করে যে, আত্মা এবং ঈশ্বর এই পর্যন্তই অর্থাৎ দেহ বা প্রতিমা-পরিমাণই, এর অতিরিক্ত আত্মা বা ঈশ্বর আর কিছু নেই, যেমন নগ্নক্ষপণকাদি জৈনদিগম্বরদের মত—শরীরানুবর্তী দেহ-পরিমাণ জীব,, অথবা পাষাণ, দারু প্রভৃতি প্রতিমা মাত্র ঈশ্বর। এই ভাবে এরা কোন একটি বিশিষ্ট প্রাকৃত পরিণাম-কার্যে আসক্ত অর্থাৎ সন্তুষ্ট থাকে। ২২।১

৩. অপূর্বানন্দ

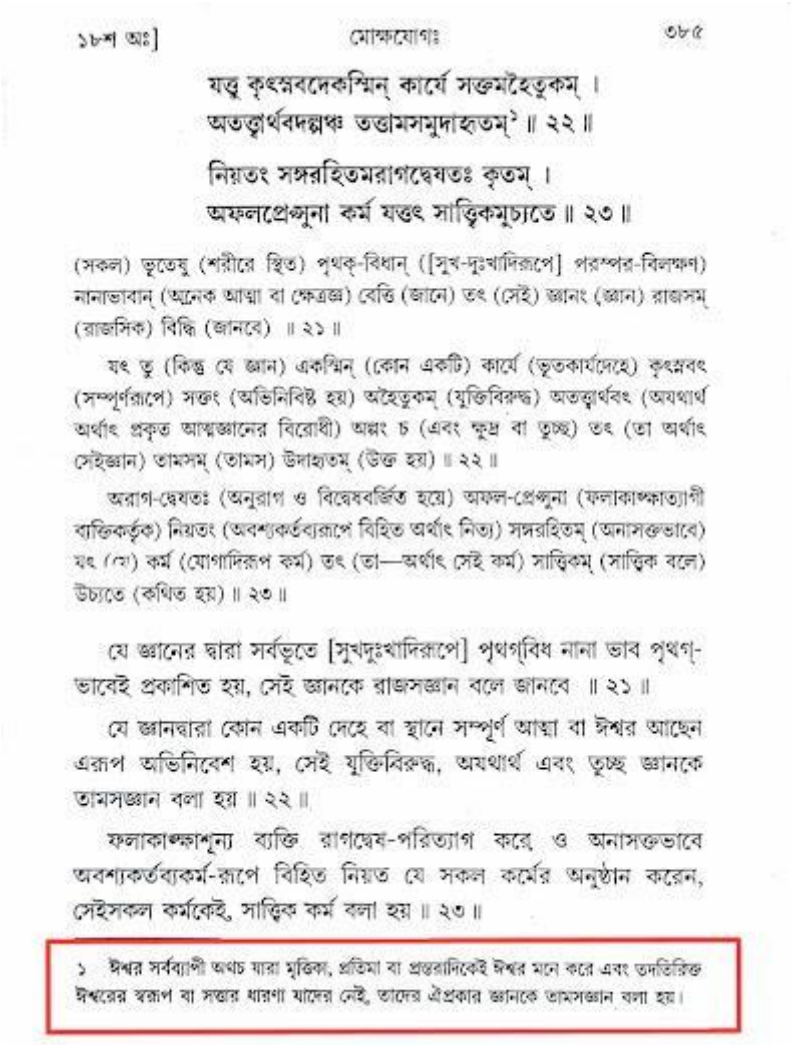

১৮শ অঃ] মোক্ষযোগঃ ৩৮৫

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্ ।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্[১] ॥ ২২ ॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

(সকল) ভূতেষু (শরীরে স্থিত) পৃথক্-বিধান্ ([সুখ-দুঃখাদিরূপে] পরস্পর-বিলক্ষণ) নানাভাবান্ (অনেক আত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ) বেত্তি (জানে) তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞান) রাজসম্ (রাজসিক) বিদ্ধি (জানবে) ॥ ২১ ॥

যৎ তু (কিন্তু যে জ্ঞান) একস্মিন্ (কোন একটি) কার্যে (ভূতকার্যদেহে) কৃৎস্নবৎ (সম্পূর্ণরূপে) সক্তং (অভিনিবিষ্ট হয়) অহৈতুকম্ (যুক্তিবিরুদ্ধ) অতত্ত্বার্থবৎ (অযথার্থ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মজ্ঞানের বিরোধী) অল্পং চ (এবং ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ) তৎ (তা অর্থাৎ সেইজ্ঞান) তামসম্ (তামস) উদাহৃতম্ (উক্ত হয়) ॥ ২২ ॥

অরাগ-দ্বেষতঃ (অনুরাগ ও বিদ্বেষবর্জিত হয়ে) অফল-প্রেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী ব্যক্তিকর্তৃক) নিয়তং (অবশ্যকর্তব্যরূপে বিহিত অর্থাৎ নিত্য) সঙ্গরহিতম্ (অনাসক্তভাবে) যৎ (যে) কর্ম (যোগাদিরূপ কর্ম) তৎ (তা—অর্থাৎ সেই কর্ম) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক বলে) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥ ২৩ ॥

যে জ্ঞানের দ্বারা সর্বভূতে [সুখদুঃখাদিরূপে] পৃথগ্‌বিধ নানা ভাব পৃথগ্‌-ভাবেই প্রকাশিত হয়, সেই জ্ঞানকে রাজসজ্ঞান বলে জানবে ॥ ২১ ॥

যে জ্ঞানদ্বারা কোন একটি দেহে বা স্থানে সম্পূর্ণ আত্মা বা ঈশ্বর আছেন এরূপ অভিনিবেশ হয়, সেই যুক্তিবিরুদ্ধ, অযথার্থ এবং তুচ্ছ জ্ঞানকে তামসজ্ঞান বলা হয় ॥ ২২ ॥

ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি রাগদ্বেষ-পরিত্যাগ করে ও অনাসক্তভাবে অবশ্যকর্তব্যকর্ম-রূপে বিহিত নিয়ত যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেইসকল কর্মকেই, সাত্ত্বিক কর্ম বলা হয় ॥ ২৩ ॥

১ ঈশ্বর সর্বব্যাপী অথচ যারা মৃত্তিকা, প্রতিমা বা প্রস্তরাদিকেই ঈশ্বর মনে করে এবং তদতিরিক্ত ঈশ্বরের স্বরূপ বা সত্তার ধারণা যাদের নেই, তাদের ঐপ্রকার জ্ঞানকে তামসজ্ঞান বলা হয়।

শ্রী অনিলবরণ রায়ের মতে প্রতিমা সিম্বল বা প্রতীক মাত্র । যদি প্রতিবাদী বলেন তাদের উদ্দেশ্যও তাই তাহলে প্রতিমার অলৌকিকতার কাহিনীর অপন্যাস কেন ?

তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।

এই লক্ষণ দেখিয়া বলিতেই হয় যে, ভগবানের অবতরণের এই এক যুগসন্ধি। সর্ব্বত্র ধর্ম্মের গ্লানি। ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম লোকে ভুলিয়াছে, কতকগুলি গতানুগতিক আচার ও অনুষ্ঠানকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। সদাচার, শুদ্ধাচার ধর্ম্মের অঙ্গ সন্দেহ নাই, কিন্তু দেশ ও কালভেদে আচারেরও ভেদ হয়—এককালে যাহা উপযোগী ছিল অন্য কালে তাহাই অনাচারে ও অত্যাচারে পরিণত হয়—হিন্দুধর্ম্মে বর্ত্তমানে তাহাই হইয়াছে। ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও প্রকৃত অর্থ লোকে ভুলিয়াছে। মন্দিরে গিয়া, কিছু পূজার অর্ঘ্য দান ও প্রতিমা দর্শন করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান হইল—ইহাই আজকাল লোকের ধারণা। কিন্তু মন্দির ও প্রতিমা কেবলমাত্র symbol—প্রতীক; আমাদের হৃদয়-মন্দিরে স্বয়ং ভগবান বিরাজ করিতেছেন, সেখানে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে হইবে, তাঁহার সহিত সজ্ঞানে যুক্ত হইয়া সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, সমগ্র জীবন যাপন করিতে হইবে—ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম,

শ্রী অরবিন্দ পুরাণের আধ্যাত্মিক ইত্যাদি বলেও শেষে বলেছেন যা বেদ ও উপনিষদ্ সম্মত না পুরাণে থাকলেও তা গৃহীত হবেনা, আর যদি বেদ-উপনিষদ্ সম্মত হয় তবে পুরাণে না থাকলেও গৃহীত হবে ।

পুরাণ স্মৃতির মধ্যে প্রধান। উপনিষদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পুরাণে উপন্যাস ও রূপকাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতের ইতিহাস, হিন্দুধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও অভিব্যক্তি, পুরাতন সামাজিক অবস্থা, আচার, পূজা, যোগ-সাধন, চিন্তাপ্রণালীর অনেক আবশ্যক কথা পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন পুরাণকার প্রায় সকলে হয় সিদ্ধ, নয় সাধক; তাঁহাদের জ্ঞান ও সাধনলব্ধ উপলব্ধি তাঁহাদের রচিত পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেদ ও উপনিষদ হিন্দুধর্ম্মের আসল গ্রন্থ, পুরাণ সেই গ্রন্থের ১ ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা আসল গ্রন্থের সমান হইতে পারে না। তুমি যে ব্যাখ্যা কর আমি সেই ব্যাখ্যা নাও করিতে পারি, কিন্তু আসল গ্রন্থ পরি-বর্ত্তন বা অগ্রাহ্য করিবার কাহারও অধিকার নাই। যাহার বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে মিল হয় না, তাহা হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, কিন্তু পুরাণের সঙ্গে মিল না হইলেও নূতন চিন্তা গৃহীত হইতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য, পৌরাণিককুলে নানাভাষ্যকার, নানা গবেষক বা আচার্য অবশ্যই বেদে প্রতিমাপূজা,শারদীয়া বা যে কোন আচার দেখাতে বা ছিলো বলে দাবি করাটা খুবই স্বাভাবিক দৃষ্টিতেই আমরা দেখি । যেমন নীলকণ্ঠ সূরীও বেদ মন্ত্রের মাধ্যমে রামায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণ লীলা দেখাতে চেয়েছেন । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা যে অসত্য এটা বলাই বাহুল্য ।

সনাতন ধর্মে বউদির মর্যাদা - বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে

সনাতন ধর্মে বউদিকে মায়ের মতো সম্মান দেওয়া হয়েছে। ভগবান মনু তাঁর মনুস্মৃতিতে বলেছেন,

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য ভার্যা যা গুরুপত্ন্যনুজস্য সা ।
যবীয়সস্তু যা ভার্যা স্নুষা জ্যেষ্ঠস্য সা স্মৃতা॥
মনুস্মৃতি ৯।৫৭

অর্থাৎ, বড় ভাইয়ের স্ত্রী ছোট ভাইয়ের কাছে [অর্থাৎ দেবরের কাছে] গুরুপত্নীর মতো পূজনীয়া, আর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী বড় ভাইয়ের কাছে [অর্থাৎ ভাসুরের কাছে] পুত্রবধূর মতো সম্মাননীয়া।

তাই আসুন, সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসার করি । পারিবারিক দৃঢ় বন্ধন বজায় রাখি । কামনাযুক্ত তত্ত্ব প্রচারকারী গোষ্ঠী থেকে পারিবারিক বন্ধন বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ থেকে বিরত থেকে সত্য সনাতন ধর্মের পথে চলি ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

শ্রদ্ধার মাহাত্ম্য

দৃষ্টা্ব রূপে ব্যাকরোৎসত্যানৃতে প্রজাপতিঃ । অশ্রদ্ধামনৃতে দধাচ্ছ্রদ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ । ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়ং বিপানং শুক্রমন্ধসহইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদম্পয়োমৃতম্মধু ॥

যজুর্বেদ ১৯।৭৭

= প্রজাপালক পরমেশ্বর তাঁর জ্ঞান শক্তিদ্বারা সত্য এবং অসত্যের স্বরূপকে পৃথক করেন। সেই পরমেশ্বর অসত্যে অশ্রদ্ধা ধারণ করান এবং সত্যে শ্রদ্ধা ধারণ করান।

'শ্রদ্ধা'র অর্থ

শ্রদ্ধা শব্দ শ্রৎ এবং ধা— এই দুই শব্দের সমন্বয়ে তৈরি হয়। শ্রৎ অর্থ সত্য এবং ধা অর্থ ধারণ করা। কায়মনোবাক্যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সুপরীক্ষিত সত্যকে ধারণ করার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হৃদয়ের একটি সূক্ষ্ম, পবিত্র তথা ভব্য ভাবনা।

শ্রদ্ধা মানবজীবনের মূলস্বরূপ। এটা ছাড়া মানবজীবনরূপী ভবন ভিত্তি লাভ করতে পারেনা। চোখ ছাড়া দেখা যায়না এবং কান ছাড়া শোনা যায়না, একই ভাবে শ্রদ্ধা ছাড়া জীবন তৈরি হতে পারেনা। যারা এই জীবনে সংসারে উন্নতি করেছে, তাদের জীবনে শ্রদ্ধা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। মানবজীবনে শ্রদ্ধার স্থান তেমনই যেমনটা প্রদীপে তেলের। যদি দাহকশক্তি না থাকে তো আমরা সেটিকে অগ্নি বলতে পারিনা, সমুদ্রে তরঙ্গ না থাকলে

আমরা সেটিকে সমুদ্র বলতে পারিনা এবং যে নবযুবকে উদ্যম থাকেনা তাকে যুবক বলা যায়না; একইভাবে আমরা সেই মানুষকে মানুষ বলতে পারিনা, যার মধ্যে শ্রদ্ধা নেই। যেভাবে পুষ্প এবং ফলহীন বৃক্ষ সামান্য কাঠমাত্র হয়, একইভাবে শ্রদ্ধাহীন মানুষও সামান্য কাঠের সমান হয়।

বর্তমানে অধিকাংশ লোক শ্রদ্ধাবিহীন, এটাই কারণ যে বর্তমানে মানব আর মানব নেই, দানব হয়ে গিয়েছে। শ্রদ্ধার অভাবে আজ সন্তান পিতার অনাদর করে, শিষ্য গুরুদের তিরষ্কার করে। এর বিপরীতে প্রাচীনকালে মানুষকে শ্রদ্ধার প্রতীক করা হতো। আচার্য শিষ্যদের এমন শিক্ষা দিতেন—

মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্যদেবো ভব।

অতিথিদেবো ভব।।

তৈ০উ০ ১।১১।২

= মাতাকে শ্রদ্ধা করো, পিতাকে সেবা করো, গুরু এবং অতিথিদের সম্মান করো। কারণ তারা দেব ।

এই শিক্ষার কারণেই আমরা প্রাচীনকালের মহামানবগণের জীবনে মাতা, পিতা এবং গুরুজনদের কথা ওতপ্রেতভাবে পেতাম। আসুন, প্রাচীন ইতিহাসের কিছু গৌরবপূর্ণ গাথা অবলোকন করি।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের ঘোষণা হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু পরদিনই দৃশ্য বদলে গেলো। প্রাতকালে কৈকেয়ী শ্রীরামকে ডাকেন। যখন শ্রীরাম মহলে পৌঁছান তখন তার পিতাকে দীন এবং কাতর অবস্থায় দেখে মাতা কৈকেয়ীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কৈকেয়ীর বললেন যে,"যদি তুমি মহারাজের আজ্ঞাকে স্বীকার করো.. " একথা শুনে শ্রীরামচন্দ্র বড়ই ব্যথিত হলেন। তিনি বললেন—

অহো ধিঙ্ নার্হসে দেবি বক্তুং মামীদৃশং বচঃ।

অহং হি বচনাদ্রাজ্ঞঃ পতেয়মপি পাবকে।।

ভক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষ্ণং মজ্জেয়মপি চার্ণবে।।

বা০ রা০ অযো০ ১৮। ২৭-২৮

= হা আমারকে ধিক্কার! হে দেবী! তোমার এমন কথা বলা উচিত নয়। অন্য বিষয়ে কী বা বলার আছে, মহারাজের আজ্ঞাতে আমি অগ্নিতে ভস্ম হতেও তৈরি আছি, বিষও পান করতে পারি, সমুদ্রে ঝাঁপ দিতেও তৈরি।

এই হলো পিতার জন্য শ্রদ্ধা!

মহাভারতের ভীষণ সংগ্রামে অভিমন্যু বীরগতি লাভ করেন। যখন অর্জুন এই কথা শুনলেন তখন তিনি তার পুত্রের হত্যাকারী জয়দ্রথকে বধ করার প্রতিজ্ঞা করলেন। জয়দ্রথকে মৃত্যু থেকে বাঁচাতে আচার্য দ্রোণ শকট- বূহ্য রচনা করলেন। একই সাথে ভীষণ যুদ্ধ করতে লাগলেম। যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যদি অর্জুন এভাবেই লড়াই করতে থাকে তাহলে জয়দ্রথ-বধ অসম্ভব। অর্জুনকে বললেন,' আমাদের বেশি সময় যেন এখানেই না লেগে যায়, তাই দ্রোণাচার্যকে ছেড়ে সামনে অগ্রসর হও।' অর্জুন বললেন,'যেমন আপনার ইচ্ছা।' এবং তারপর তিনি আচার্যকে পরিক্রমা করে বেড়িয়ে গেলেন। এটা দেখে দ্রোণাচার্য বললেন—

ততোঽব্রবীৎস্বয়ং দ্রোণঃ ক্বেদং পাণ্ডব গম্যতে।

ননু নাম রণে শত্রুমজিত্বা ন নিবর্তসে॥

মহা০ দ্রোণপর্ব ৯১।৩৩

= পাণ্ডুনন্দন! তুমি এভাবে কোথায় যাচ্ছ? তুমি তো রণক্ষেত্রে শত্রুকে পরাজিত না করে কখনো এভাবে চলে যেতে না?

একথা শুনে অর্জুন বললো—

গুরুর্ভবান্ন মে শত্রুঃ শিষ্যঃ পুত্রসমোঽস্মি তে।

ন চাস্তি স পুমাঁল্লোকে যস্ত্বাং যুধি পরাজয়েৎ॥

মহা০ দ্রোণপর্ব ৯১।৩৪

= আপনি আমার গুরু, শত্রু নন। আমি আপনার পুত্রসম প্রিয় শিষ্য। এই সংসারে এমন কোন পুরুষ নেই যে আপনাকে পরাজিত করতে পারে।

এই হলো শিষ্যের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু তবুও শ্রদ্ধায় একটুও কমতি নেই।

শ্রদ্ধায় প্রচুর বল আর শক্তি আছে। শ্রদ্ধার মাধ্যমে সবকিছু হতে পারে। শ্রদ্ধার মাধ্যমে যেন বড়-বড় পর্বতকেও টলানো যায়। "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" ভালো কাজে নানা ধরনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু শ্রদ্ধা দ্বারা জীবনের প্রত্যেক বাধাকে দূর করা যায়। শ্রদ্ধার মাধ্যমে প্রত্যেক ইচ্ছা পূরণ করা যায়।

শ্রদ্ধা বিশ্বাসের জননী। যেখানে শ্রদ্ধা আছে সেখানেই বিশ্বাসও অবশ্যই আছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জীবনে আমাদের এই বৈদিক সত্যের সাক্ষাকার পাওয়া যায়। একবার স্বামী শ্রদ্ধানন্দেরর কাছে ব্রহ্মকুমারী সংস্থার কয়েকজন প্রচারক এলেন আর বললেন, 'আমরা আপনাকে দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যই ভগবানের দর্শন করাতে পারি।' স্বামীজি বললেন, ' ভগবান ১০-১৫ মিনিট দূরে কীভাবে থাকতে পারে? আমি সেই ভগবানকে মানিনা যে চাইলে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও দূরে চলে যান। আমার ভগবান তো সবসময় আমার সাথে থাকেন।' স্বামীজির ঈশ্বরের প্রতি এমন অটল বিশ্বাস শ্রদ্ধার কারণেই ছিল।

সাল ১৯০২ থেকে ১৯১২ অবধি সময় আর্যসমাজের জন্য বড়ই সংকটকালীন সময় ছিলো। আর্যসমাজের উপর ইংরেজদের বক্রদৃষ্টি ছিলো। আর্যসমাজকে রাজদ্রোহী সংস্থা এবং সত্যার্থ প্রকাশ কে রাজদ্রোহী গ্রন্থ মানা হতো। আর্জসমাজকে অপরাধী (out law) ঘোষিত করা হয়েছিলো। রাজদণ্ডের সকল ব্যবস্থার প্রয়োগ আর্যসমাজ এবং আর্যসমাজীদের বিরুদ্ধে করা হচ্ছিলো। এই সঙ্কটকালে যেসকল সরকারী চাকুরিজীবী আর্য ছিলো, আর্যসমাজ থেকে নিজেদের তাদের পরিবার সম্পর্ক-বিচ্ছেদ করানোর জন্য চাপ দেওয়া শুরু করলো, যুবকরা দ্বিধায় পড়লো পরিবারের দিকে তাকাবে নাকি আর্যসত্যের দিকে । স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কানে খবর পৌঁছে গেলো । সেসময় নিজের দৃঢ় বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাকে প্রকাশ করে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তার পত্রিকা 'সদ্ধর্ম প্রচারক'-এ লিখলেন—

"আর্যগণ! তোমাদের কি পরমাত্মায় প্রকৃত বিশ্বাস নেই? যদি থাকে তো দুই হাতের মানুষ তোমাকে যা দেয় তার জন্য সহস্রহাতে সম্পদ দাতা সহস্রবীর্য ভগবানকে কেন অনাদর করছো ? দুইহাতওয়ালা যে ব্যক্তি তোমার রোজগার ছিনিয়ে নিতে পারে সহস্র মানুষের পালক সহস্রাবাহুর ন্যায় বলবালী ভগবান কী তোমাকে এর থেকেও বেশি রোজগার দিতে পারবে না ?"

এই হলো স্বামীজির ঈশ্বরের প্রতি মহান শ্রদ্ধাপূর্ণ উদ্গার! সকল ধরনের উত্তম কাজে শ্রদ্ধা থাকা পরম আবশ্যক। কেননা শাস্ত্রে বলে 'শ্রদ্ধা আপঃ' = শ্রদ্ধা জলের মতো । যেভাবে জলের অভাবে বৃক্ষ শুকিয়ে যায়, একইভাবে

শ্রদ্ধারূপী জলের অভাবে যজ্ঞ, দান, তপ সব ভালো কাজ ব্যর্থ হয়ে যায়, এজন্যই তো যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন —

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎপ্রেত্য নো ইহ ॥

গীতা ১৭।২৮

= শ্রদ্ধা ব্যতীত কৃত যাগ-যজ্ঞাদি, সমর্পিত দানাদি, কৃত তপশ্চর্যা, এমন কী শ্রদ্ধা ব্যতীত সম্পাদিত কোন কর্মই ফলপ্রদ হয়না, ব্যর্থ হয়ে যায়। হে অর্জুন! শ্রদ্ধারহিত কর্মের মাধ্যমে এই লোকে কোন রকম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়না, তাহলে পরলোকে কীভাবে প্রাপ্ত হতে পারে। তাই উপনিষদের ঋষি বলেছেন—

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। –তৈ০ উ০ ১১।৪

শ্রদ্ধাপূর্বক দানাদি করা উচিত।

মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মার বিকাশ, সত্য এবং আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তি - এগুলো শ্রদ্ধার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে।

মানুষের উচিত শান্ত এবং উদার হয়ে তথা বিষয়-বিকারাদি থেকে দূরে থেকে, সহনশীল তথা শ্রদ্ধাধনে ধনী হয়ে নিজের আত্মার দর্শন করা।

বেদের আদেশও আছে—

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ ।

শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি ॥

ঋ০ ১০।১৫১।১

= শ্রদ্ধার দ্বারা আত্মাগ্নি প্রদীপ্ত হয়, তাতে শ্রদ্ধাপূর্বকই অহংকৃতির আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা সমস্ত কল্যাণকারী সাধনসমূহের সর্বোচ্চে বিরাজমান আছে। শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন কার্য হতে পারেনা।

এই ভাবই প্রকাশ করে বেদে অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে—

'শ্রদ্ধয়া বিন্দতে বসু' ঋ ১০। ১৫১।৪

= শ্রদ্ধার মাধ্যমে মানুষ ধন লাভ করে।

বিদ্যাধন, বুদ্ধিধন, জ্ঞানধন, বিজ্ঞানধন, বলধন এবং ঐশ্বর্য —সবকিছু শ্রদ্ধার মাধ্যমেই লাভ হয়। সদাচার, সদবিচার, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য আদি আধ্যাত্মিক ধনও শ্রদ্ধার মাধ্যমেই লাভ হয়। যার মধ্যে শ্রদ্ধা নেই সে কোনো ধরনের সম্পদ লাভ করতে পারেনা। সেই মানুষ বড়ই ভাগ্যহীন যার ধন নেই, এর বিপরীরে শ্রদ্ধাবান মনুষ্য ধন-ধান্য না রাখলেও অনেক ভাগ্যবান হয়, কেননা শ্রদ্ধা আছে তো সবকিছুই পাবে এবং যদি শ্রদ্ধা না থাকে তো যা কিছু আছে তা-ও চলে যাবে, তাই মানুষের শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হওয়া উচিত।

যোগদর্শনেও প্রভুপ্রাপ্তির জন্য শ্রদ্ধাকে সর্বপ্রথম স্থান দেওয়া হয়েছে। যে সাধক পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাযুক্ত নয়, সেই সাধকের যোগসাধন কীভাবে হবে, এর বর্ণনা করে সেখানে বলা হয়েছে—

শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাং ॥

যো০ দ০ ১।২০

= সত্যকে ধারণ করার নাম শ্রদ্ধা। যখন মানুষের মধ্যে এই শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় তখন ব্যাসভাষ্যানুসারে 'সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি'—এই শ্রদ্ধা যোগীকে মায়ের মতো রক্ষা করে। এই শ্রদ্ধার মাধ্যমে যোগীর হৃদয়ে বিশ্বাস এবং আহ্লাদ উৎপন্ন হয়। সেই বিশ্বাস এবং আনন্দ দ্বারা যোগী বীর্যবান্ = শক্তিশালী এবং উৎসাহী হয়, পুনরায় তার স্মৃতি জাগ্রত হয়। স্মৃতির দৃঢ়তায় চিত্ত নিশ্চল হয়, তখন সমাধি সম্পন্ন হয়, যার মাধ্যমে বিবেক-বুদ্ধির প্রকাশ হয়। এভাবে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে যোগী তত্ত্বজ্ঞানী হয়।

শ্রদ্ধা তিন প্রকার হয়। গীতায় বলা হযেছে—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥

গীতা ১৭।২

= দেহধারী মানুষের স্বভাব থেকে উৎপন্ন শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী ও রাজসী এবং তামসী–এই তিন প্রকারই হয়। তা তুমি বিস্তারিত শ্রবণ করো।

তামসিক শ্রদ্ধা সেটিই, যা অপরের ক্ষতি করার জন্য হয়, সংসারে অশান্তি বিস্তারের জন্য হয়। রাজসিক শ্রদ্ধা সেটিই, যা নিজের সাংসারিক কল্যাণের জন্য হয় এবং সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা হলো সেটিই যা মানব জীবনকে সফল বানাতে হয়। যখন সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তখন সেই শ্রদ্ধা মনুষ্যের সকল দুর্গুণ এবং দুর্ব্যসন দূর করে প্রভুর নিকট নিয়ে যায়, যেমনটা মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে—

তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চরন্তঃ ।

সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ স পুরুষো হ্যব্যযাত্মা ॥

মুণ্ডক ১।২।১১

= যাঁরা সমাহিতচিত্ত, বিদ্বান, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে বনে অথবা একান্তদেশে বাস করে তপ ও শ্রদ্ধার সেবন করেন, তাঁরা নির্মল হয়ে সূর্যের রশ্মি দ্বারা সেখানে গমন করেন, যেখানে নিশ্চিতরূপে সেই অমর, অব্যয়াত্মা পরম-পুরুষ আছেন

যাগ-যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের ফল প্রতিপাদন করে এখন প্রসঙ্গবশত জ্ঞানকাণ্ডের ফল বর্ণনা করছেন। বিষয়সমূহের অসারতা অনুভব করে যাঁর ইন্দ্রিয় ও মন শান্ত হয়েছে এবং কর্মফলের ক্ষীণতা দেখে যাঁর আত্মা অবিদ্যার অন্ধকারকে ভেদ করে বিদ্যার বিমল প্রকাশে পৌঁছেছে অর্থাৎ নিজের বাস্তবিক স্বরূপ সম্বন্ধে যাঁর বোধ হয়েছে, যিনি বনে বা একান্তে বাস করে স্বাধ্যায়াদি তপ ও বেদবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার সেবন করেন, নিষ্কামভাবে নিজের আশ্রমবিহিত কর্মের আচরণ করে সর্বদা ব্রহ্মের উপাসনায় তৎপর থাকেন, নিঃসঙ্গ ও নির্বিকল্প হয়ে অপরিগ্রহ-বৃত্তি দ্বারা যা কিছু লাভ করেন, তা দ্বারাই নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন; এরূপ আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ যে-কোনো (ব্রহ্মচর্যাদি) আশ্রমে থেকে কর্ম করলেও তিনি কর্মবন্ধনে লিপ্ত হন না, তিনি সেই অবিনাশী ব্রহ্মকে লাভ করার অধিকারী।

এইভাবে যজুর্বেদে সত্য লাভের উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

ব্র॒তেন॑ দী॒ক্ষামা॑প্নোতি দী॒ক্ষয়া॑প্নোতি॒ দক্ষি॑ণাম্। দক্ষি॑ণা শ্র॒দ্ধামা॑প্নোতি শ্র॒দ্ধয়া॑ স॒ত্যমা॑প্যতে ॥

যজু০ ১৯।৩০

= ব্রহ্মচর্য আদি উত্তম ব্রতসমূহ হতে দীক্ষা=অধিকার প্রাপ্ত হয়। দীক্ষা থেকে দক্ষিণা=উৎসাহ প্রাপ্তি ঘটে এবং দক্ষিণা থেকে শ্রদ্ধা লাভ হয় তথা শ্রদ্ধা থেকে সত্য লাভ হয়।

এরূপ বেদ-উপনিষদাদিতে শ্রদ্ধার মহিমার উচ্চস্বরে কীর্তন করা হয়েছে। এই হলো শ্রদ্ধার মহত্ত্ব, এর বিপরীত অশ্রদ্ধা মানব হৃদয়কে নিরস এবং কুতার্কিক করে নাস্তিকতার রূপ ধারণ করে। এমন লোক পরমাত্মাকে দোষী মনে করতেও লজ্জিত হয়না।

একবার এক ব্রজবাসী ঘুরতে ঘুরতে কাবুল পৌঁছে গেল। সেখানে আঙুরের বাগান তথা অনেক প্রকারের ফুল এবং ফল তথা শুকনো মিষ্টি এবং ব্রজভূমির আকন্দ-পলাশ দেখে এবং ববুল আদি বৃক্ষসমূহের স্বরণ করে সে বলতে লাগলো—

হায় দই! গোপাল কী পড়ী মতি পে ধুর।

কাবুল মেং মেবা ভই, ব্রজ মেং বোয়ে ববুর।।

অর্থাৎ হায় রে ভাগ্য, গোপালের মতিভ্রম হয়েছে। কাবুলে মিষ্টি আর ব্রজে কাঁটাগাছ ।

এই হলো নাস্তিকতার ভয়ঙ্কর পরিণাম! ভুলে যাওয়া যে সব জায়গাতেই ভালো আছে, খুঁজে নিতে হয়, কোন সাময়িক মোহে যা আছে তার প্রতি বিশ্বাস হারানো উচিত না। এতটুকুই নয় অশ্রদ্ধাশীল মানুষ নিজেই নিজেকে হীন এবং নপুংসক মনে করে। স্বভাবে ক্রুরতা, রুক্ষতা এবং খিটখিটেভাব আসে, ক্রোধের মাত্রা বাড়ে। লোক এবং পরলোকের কথা ভালো লাগেনা, শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি অবিশ্বাসী হয়ে যায় এবং তখন তার কী দশা হয় ?

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি

গীতা ৪।৪০

= মূর্খ, কারো ওপর শ্রদ্ধা রাখেননা —এমন সংশয়যুক্ত ব্যক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে [২৬৪.১৫] বলা হয়েছে—

অশ্রদ্ধা পরমং পাপং শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচনী।

অর্থাৎ অশ্রদ্ধা থেকেও বড় কোন পাপ নেই এবং শ্রদ্ধা হচ্ছে পাপ-পুঞ্জ ভস্ম করে জ্ঞানের প্রকাশ উৎপন্নকারী।

যখন মানুষের মন-মন্দিরে শ্রদ্ধাবৃত্তি জাগ্রত হয় তখন তার ফল কী হয়, তা অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে দেখুন—

ওজশ্চ তেজশ্চ সহশ্চ বলং চ বাক্চেন্দ্রিয়ং চ শ্রীশ্চ ধর্মশ্চ ॥

অথর্ব০ ১২।৫।৭

অর্থাৎ, শ্রদ্ধাবান মানুষের জীবনে পরাক্রম, তেজ, সহনশক্তি, শারীরিক আরোগ্যতা, প্রিয় এবং মধুর-ভাষণ, ইন্দ্রিয়সমূহের সংযম, শ্রী, ধর্ম আদি দৈবীগুণ প্রকট হয়।

গীতায় বলা হয়েছে—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ।

জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥

গীতা ৪।৩৯

= শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সংযম করে তৎপরা এবং সাধনাপূর্বক জ্ঞানের প্রাপ্তি করে নেয়। জ্ঞানোদয় হলে তার মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং সে পরমসুখের অনুভব করে।

শ্রদ্ধার মাধ্যমে অসীম আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু বর্তমানে সংসারে শ্রদ্ধা বিষয়ে অনেক ভ্রান্তির বিস্তার আছে। কিছু মানুষের ধারণা এমন যে যুক্তি-তর্ক এবং শ্রদ্ধার পারস্পরিক বিরোধ আছে। তাদের মতে, তর্ক এবং শ্রদ্ধা একসাথে থাকতে পারেনা, পরন্তু এই ধারণা একদম মিথ্যা, কেননা মানুষ স্বভাবতই অনেক কথাই তর্ক ছাড়াই মেনে নেয়, কারণ—

' শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষঃ' গীতা ১৭।৩

= মনুষ্য স্বভাব থেকেই শ্রদ্ধাশীল। যদি মানুষ প্রত্যেক কথাতেই তর্ক শুরু করে তবে জীবনে চলাই অসম্ভব, এজন্য মহর্ষি ব্যাস লিখেছেন—

'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১

তাৎপর্য, যদি আমরা প্রত্যেক বাক্যে তর্কাকর্কি শুরু করি তো আমরা একটি ছোট্ট কাজও পূর্ণ করতে পারবোনা। তর্ক মস্তিষ্কের বস্তু এবং শ্রদ্ধা হৃদয়ের ভাবনা, উভয়ের মেলবন্ধনেই জীবনে উন্নতি এবং সফলতা প্রাপ্ত হতে পারে অন্যথা নয়, এজন্য অথর্ববেদে বলা হয়েছে —

'মূর্ধানমস্য সংসীব্যাথর্বা হৃদয়ং চ যৎ' অথর্ব০ ১০।২।২৬

= হে নিশ্চল আত্মন! মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের ভাবনাকে অর্থাৎ তর্ক এবং শ্রদ্ধাকে মিলিত করো ।

মহর্ষি দয়ানন্দের জীবনে উভয়ের সমাবেশ ছিল। তিনি অদ্ভুত তার্কিক হয়েও মহান শ্রদ্ধালু ছিলেন।

'শ্রদ্ধা প্রাণঃ' অথর্ব০ ৯।৫।২১ = শ্রদ্ধা মানবজীবনের প্রাণ। তাই নিজের জীবনে শ্রদ্ধার আহ্বান করো।

শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি ।

শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধে শ্রদ্ধাপয়েহ নঃ ॥

ঋ০ ১০।১৫১।৫

ডাকো ! আমন্ত্রণ করো শ্রদ্ধাকে । আমরা প্রাতকালে শ্রদ্ধাযুক্ত হই, মধ্যাহ্নে শ্রদ্ধাযুক্ত হই, সায়ংকালে শ্রদ্ধাযুক্ত হই এবং রাত্রিতেও শ্রদ্ধাযুক্ত হই। আমরা জীবনের প্রত্যেক ক্ষণে এবং প্রত্যেক কাজে শ্রদ্ধা দ্বারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত । হে শ্রদ্ধা! আমাদের জীবনকে শ্রদ্ধাযুক্ত করো।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

শ্রাদ্ধ মীমাংসা

শ্রাদ্ধ কী ? শ্রাদ্ধ অর্থ সত্যকে ধারণ করা অথবা যাকে শ্রদ্ধাপূর্বক ধারণ করা যায়। শ্রদ্ধাপূর্বক মনে প্রতিষ্ঠিত করে, বিদ্বান, অতিথি, মাতা-পিতা, আচার্য ইত্যাদি গুরুজন সবাইকে সেবা করার নামই শ্রাদ্ধ।

শ্রাদ্ধ জীবিত মাতা-পিতা, আচার্য, গুরু আদি পুরুষদেরই হতে পারে, মৃতদের নয়। মৃতদের শ্রাদ্ধ কেবল মিথ্যাবাদীদের কর্ম। বৈদিক যুগে তো মৃতক-শ্রাদ্ধের নামও কোথাও ছিলনা। মৃতকশ্রাদ্ধের ইতিহাস অনেক অর্বাচীন। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৯১তম অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে একটি আখ্যানের উল্লেখ আছে, যা থেকে এটা

স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে দুর্জনসন্তোষ ন্যায় অনুযায়ীও এই প্রথা মহাভারতকাল থেকে শুরু হয়েছে। আখ্যানটা এরকম–

মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে প্রশ্ন করলেন যে, মৃতক শ্রাদ্ধ কখন এবং কে চালু করেন? তিনি উত্তর দিলেন, দত্তাত্রেয় নিমির অনেক সৌভাগ্যশালী শ্রীমান্ পুত্রের জন্ম হলো। বহু বছরের দুষ্কর তপস্যা করে তার পুত্র মারা গেল। শাস্ত্র-মর্যাদানুসারে নিমি রাজা শৌচ-স্নান করেও পুত্রে জন্য অত্যন্ত শোক করছিলেন। তারপর তিনি মনে মনে শ্রাদ্ধের সামগ্রী কল্পনা করে আমাবস্যার দিনে ব্রাহ্মণ-ভোজন করালেন তথা নিজের পুত্রের নাম-গোত্র আদি উচ্চারণ করে পিণ্ডদানও করলেন, কিন্তু এই সময়ে তিনি ধর্ম-ভঙ্গ দেখে অনুশোচনা করে বললেন—

অকৃতং মুনিভিঃ পূর্বং কিং ময়ৈতদনুষ্ঠিতম্ ।
কথং নু শাপেন ন মাং দহেয়ুর্ব্রাহ্মণা ইতি ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ, এর আগে মুনিগণ এমনটা কখনো করেননি, আমি এটা তা কেন করলাম ? ব্রাহ্মণরা আমাকে তাদের অভিশাপে না ভস্ম করে দেয়।

এরপরে অত্রি এসে একে প্রাচীন কালের বলে বৈধতা দেন 'পূর্বদৃষ্টো ধর্মোঽয়ং ব্রহ্মণা স্বয়ং' । এই আখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, মৃতক শ্রাদ্ধের প্রথা নিমী'র সময় থেকেই প্রাচলন হয়েছিলো। অত্রির নাম উল্লেখ করে একে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র, কেননা যদি নবীন না হতো তবে নিমির অযথা শোকের কারণ কী ? বা অত্রিরই কেন এই সাধারণ বিষয় সুনিশ্চিত করার জন্য ব্রহ্মার কথা নিয়ে আসতে হবে, বিধি বর্ণনা করতে হবে ? যদি অত্রির মতে এটি বিধিবদ্ধ হয়েই থাকে তবে তো নতুন করে বলার কিছু নেই বা নিমির শোকেরও কারণ নেই । অতএব এই প্রথা সর্বথা অর্বাচীন এবং অবৈদিক, কেননা চার বেদে মৃতের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া প্রতিপাদকও কিছুই নেই। বেদ স্পষ্ট শব্দে মাতা-পিতা, গুরু এবং বড়দের সেবা করার আদেশ দেয়, যথা—

অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।

অথর্ব০ ৩। ৩০। ২

= পুত্র পিতার অনুকুল কর্ম সম্পাদনকারী এবং মাতার সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শনকারী হোক।

মৃতকের জন্য জিনিসপত্র দিতে হবে, তা সেখানে পৌঁছে যাবে, মৃতকের শ্রাদ্ধ হওয়া আবশ্যক তথা এভাবে হতে হবে এবং তিনি সেখানে পৌছে যাবেন, এরূপ কোন বেদমন্ত্রের বিধান নেই।

শ্রাদ্ধ কেবল জীবিতদেরই হতে পারে, মৃতদের নয়। পিতর সংজ্ঞাটিও জীবিতদের জন্যই প্রযুক্ত হয়, কেবল মৃতদের জন্য নয়। বৈদিক সনাতন ধর্মের এই সত্য সিদ্ধ করতে সর্বপ্রথম ‘পিতর’ শব্দের বিশ্লেষণ করবো আমরা। 'পিতা পাতা বা পালয়িতা বা ', নিরুক্ত ৪.২১ অনুযায়ী পিতর শব্দ ‘পা রক্ষেণ’ ধাতু দ্বারা সৃষ্টি হয়, অতএব পিতর অর্থ পালক, পোষক, রক্ষক তথা পিতা হয়ে থাকে। জীবিত মাতা-পিতাই রক্ষণ এবং পালণ-পোষণ করতে পারেন। যিনি মৃত তিনি অপরের রক্ষা কী করবে সে-তো নিজের রক্ষাই করতে পারেনা, অতএব মৃতকদের পিতর মনে করা মিথ্যা তথা ভ্রমমূলক। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, প্রচলিত পুরাণ, ব্রাহ্মণগ্রন্থ তথা মনুস্মৃতি আদি শাস্ত্রসমূহের অবলোকন দ্বারা এটা স্পষ্টই বিদিত হয় যে, পিতর সংজ্ঞাটি জীবিতদের জন্যও, কেবলমারর মৃতকদের জন্য নয়। বরং পুরাণে পরবর্তীতে এই পিতরকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে শ্রাদ্ধের বেলাতে ব্যবহার করে অর্থ সংকুচিত করা হয়েছে। কিছু প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা হলো—

আচ্যা জাতু দক্ষিণতো নিষদ্যেদং নো হবিরভি গৃণন্তু বিশ্বে।।

অথর্ব০ ১৮।১।৫২

= হে পিতরগণ ! আপনি জানু কুঞ্চিত করে এবং দক্ষিণাভিমুখী হয়ে বসে আমাদের এই অন্নকে গ্রহণ করুন।

এই মন্ত্রের অর্থ করার সময় কাণ্বশাখায় সায়ণ, মাধ্যন্দিন শাখায় মহীধর, উবট এবং গ্রিফিথ সাহেব – সকলেই নতজানু হয়ে বেদীর দক্ষিণদিক সংলগ্ন হয়ে বসতে বলছেন। এখন পৌরাণিকদের মতে এই কথা মৃতকের জন্য বলা । তাহলে তাদের যেহেতু দেহ নেই তারা এটা করতে পারবে না, তাহলে বেদমন্ত্র কী ব্যর্থ ? মৃতদের আত্মার কি হাঁটু থাকে? এই বর্ণনার দ্বারা ভালো করেই প্রমাণিত হয় যে জীবিতদের জন্যই পিতর সংজ্ঞা প্রযোজ্য ।

উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু ।

তঽআ গমন্তু তঽইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তে বন্ত্বস্মান্ ॥

যজু০ ১৯।৫৭

ভাবার্থ হলো, আমাদের মাধ্যমে আহ্বানের পর সোমরস পানকারী পিতর প্রীতিকারক যজ্ঞ তথা আমাদের কোষসমূহে আগমন করুন। সেসব পিতরগণ আমাদের বচনসমূহ শ্রবণ করুন, আমাদের উপদেশ দিন তথা আমাদের রক্ষা করুন।

এই মন্ত্রে মহীধর তথা উবট এই কথাটা এক প্রকারে স্বীকার করেছেন যে, পিতর জীবিতই হয়ে থাকেন, মৃত নয়, কেননা মৃত না-তো আসতে পারে, না-তো শুনতে পারে, না-তো উপদেশ দিতে পারে আর না-তো রক্ষা করতে পারে। মন্ত্রে 'অবন্তু' এখানে অব্ ধাতু রক্ষণ, গতি, কান্তি, প্রীতি, তৃপ্তিসহ ১৯ প্রকার অর্থ প্রদান করে যার কোনটিই মৃত পিতর করতে সক্ষম না। তাই পৌরাণিক ও তাদের ভাষ্যকারগণ যতই আড়াল করার চেষ্টা করুন না কেন মন্ত্র নিজেই তার সঠিক অর্থের প্রমাণ দিচ্ছে ।

একইভাবে পৌরাণিকভাষ্যকাররা মৃত পিতর করতে না পেরে পিতর অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ করে যেসব ভাষ্যে লুকোচুরি করতে চেয়েও পারেনি তা নিম্নরূপ -

১। অক্ষন্.. শুন্ধধ্বম্ (যজু০ ১৯.৩৬) - পিতর হাত ধোবে বা আচমন করবে (সামশ্রমী)। বিনিয়োগে এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গারে জল প্রদান আছে, অথচ মন্ত্রে আছে ভিন্ন কথা। জল অগ্নিতে দেওয়ার বিনিয়োগে পিতর আসবে কীভাবে? অর্থাৎ এই মন্ত্র জীবিত পিতরদেরই বলছে।

২। যজুর্বেদ ১৯।৫৭-৫৯ অনুযায়ী পিতরদের যজ্ঞে আসতে, প্রার্থনা শুনতে, উপদেশ দিতে, আসনে আসীন হতে বলা হচ্ছে। যজুর্বেদ ১৯.৬৩ ও অথর্ববেদ ১৮.৩.৪৩ অনুযায়ীও একই নির্দেশনা পাওয়া যায়।

৩। যজুর্বেদ ২।৩৩ পিতরদের কাছে কুমারকে পোষণ করতে বলা হয়েছে। এখানে পিতর অর্থ মৃতক করা বুদ্ধিহীনতা।

৪। যজুর্বেদ ১৯.৩৭ এখানে পিতা - পিতামহ - প্রপিতামহ পর্যন্ত উল্লেখ জীবিত পিতরদেরই দ্যোতক।

৫। যজুর্বেদ ১৯.৫১ প্রচলিত ভাষ্যে পিতরদের বসিষ্ঠ গোত্রীয় বলা হচ্ছে। আমাদের সবার গোত্র ভিন্ন। তাই এই ভাষ্য অযথার্থ ও মৃতদের উল্লেখ এই মন্ত্রে করা হয়নি ।

৬। যজুর্বেদ ১৯.৩৭ - সোমযাগী পিতর আমাকে পবিত্র করুন। যজুর্বেদ ১৯.৬৭ পিতরকে যতি বলেছে এই বিশেষণও জীবিতদের পক্ষেই যথাযথ।

৭। যজুর্বেদ ১৯.৪৯ - ঋতজ্ঞাঃ অর্থাৎ যাজ্ঞিক স্বাধ্যায়নিষ্ঠ পিতর উব্বট উল্লেখ করেছেন, মৃত স্বাধ্যায় করে?

৮। ঋ০ ১.১২১.৫ পিতরৌ অর্থাৎ মা-বাবাকে বোঝায় যারা গোদহন করেন, ঋ০ ৩.৫৪.১৬ সত্যাচারী এবং নিজ কুলে যশস্বী পিতরকে বোঝায়, ঋ০ ৬.৭৫.৯ আয়ুযুক্ত সেনাযুক্ত ও শস্ত্রযুক্ত ইত্যাদি ৯টি বিশেষণযুক্ত পিতরকে নির্দেশ করে। ঋ০ ৩.৩৯.৪ যোদ্ধা পিতরকে বোঝায়, সায়ণভাষ্যে 'যোধাঃ যোদ্ধারোবর্তন্তে'। ঋ০ ১.৬২.২ পিতরদের পদজ্ঞাঃ অর্থাৎ ব্যাকরণজ্ঞ বলছে, ঋ০ ৪.৩৩.৩ 'পিতরা যুবানাং' অর্থাৎ যুবা বলে বিশেষায়িত করছে। ঋ০ ১০.১৪.৪ পিতরদের মধ্যে 'সংবিদানঃ' অর্থাৎ আলোচনার উল্লেখ করে, ঋ০ ১০.১৪.৮ 'সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ' পিতরদের সাথে চলার কথা বলে । ঋ০ ১.১০৬.৩ 'সু প্রবাচনাঃ' অর্থাৎ উত্তম প্রবচনদাতা, ঋ০ ৭.৭৬.৪ সত্যজ্ঞানী, ক্রান্তদর্শী, আত্মদর্শী ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত পিতর উল্লেখ করে। এসবই জীবিতদের বেলাতেই সম্ভব।

৯। অথর্ববেদ ১৮.৩.১০ ঘৃত ও মধুদাতা পিতরের উল্লেখ করে 'মধুনা ঘৃতেন' ইত্যাদি।

১০। যজুর্বেদ ১৯.৬১ তে পিতরদের 'ঋতুমান্' অর্থাৎ ঋতু অনুকূল আচার-ব্যবহার পালনকারী বলা । এটিও জীবিতদের লক্ষণ।

পাশাপাশি,

শতমিন নু শরদো অন্তি দেবা যত্রা নশ্চক্রা জরসং তনূনাম।

পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি মা নো মধ্যা রীরিষতায়ুর্গন্তোঃ॥আ

ঋ০ ১।৮৯।৯

যখন পুত্র পিতর হয়ে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত হে পরমাত্মন্! আপনি আমাদের আয়ুর নাশ না করুন, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পুত্র পিতর হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যেন আমরা জীবিত থাকি।

এবার একটু বিচার করুন যে সংসারে এমন কোন অভাগা মাতা-পিতা আছেন যারা প্রভুর নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, আমরা যেন ততক্ষণ জীবিত থাকি, যতক্ষণে আমাদের পুত্র চোখের সামনে মৃত্যু বরণ করে, অতএব এই মন্ত্রে এটাই সিদ্ধ হয় যে, পুত্র হওয়ার পর পুত্রদের জন্যও পিতর অর্থাৎ পিতা সংজ্ঞা প্রযুক্ত হয় –

মর্ত্যাঃ পিতরঃ [শতপথ০ ২।১।৩।৪] = মর্ত্যা অর্থাৎ মরণশীল মনুষ্যই পিতর।

বিশঃ পিতরঃ [শতপথ০ ১৩।৪।৩।৬] = প্রজাগণই পিতর। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বয়স্করাই অভিপ্রেত। বেদেও গুরুজনদেরই সেবার উপদেশ বিদ্যমান ।

দেবা বা এতে পিতরঃ [গোপথ০ ২।১।২৪] = বিদ্বানই পিতর।

মনঃ পিতরঃ [শতপথ০ ১৪।৪।৩।১৩] = মনই পিতর।

অসৌ (দ্যৌ) পিতাঃ [তৈ০ব্রা০ ৩।৮।৯।১] = দ্যুলোকই পিতর।

এষ বৈ পিতা য এষ (সূর্য) তপতি [শতপথ০ ১৪।১।৪।১৫] = সূর্যই পিতা।

পিতরো নমস্যাঃ [শতপথ০ ১।৫।২।৩] = পিতর অন্ন ও নমস্কার যোগ্য।

বাল্মীকি রামায়ণ, গীতা তথা পুরাণ থেকেই এটাই প্রতীয়মান হয় যে, জীবিতের নামও পিতর হয় , কেবল একপাক্ষিক মৃতের নয়। যেমন -

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতা বাপি যশ্চ বিদ্যাং প্রয়চ্ছতি।

ত্রয়স্তে পিতরো জ্ঞেয়া ধর্মে চ পথি বর্তিনঃ॥

বা০ রা০ কিষ্কি০ ১৮।১৩

অর্থাৎ, ধর্মপথে চলা বড় ভাই, পিতা এবং বিদ্যাদাতা এই তিনজন 'পিতর' জানবে।

বিদ্যাদাতাঽন্নদাতা চ ভয়ত্রাতা চ জন্মদঃ।

কন্যাদাতা চ বেদোক্তা নরাণাং পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥

ব্রহ্ম০ বৈ০ পু০ গণপতি খণ্ড ৮। ৪৭

অর্থাৎ, বিদ্যাদাতা, অন্নদাতা, ভয় হতে রক্ষাকারী, জন্মদাতা, কন্যাদাতা এই মানবগণকে পিতর বলা হয়।

চাণক্য নীতিতেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—

জনিতা চোপনেতা চ যস্তু বিদ্যাং প্রয়চ্ছতি ।

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥

চাণক্য নীতি ৫.২২[৪.১৯]

এ সম্বন্ধে গীতার একটি শ্লোকও খুবই মাহাত্ম্যপূর্ণ। যখন উভয় সেনাগণ যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত হয়ে তৈরি ছিল সে সময় অর্জুন যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন — "আমার রথ উভয় সেনাদের মধ্যে দাঁড় করাও।" অর্জুনের এরূপ কথার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের রথ উভয় সেনাগনের মধ্যে দাড় করিয়ে দিলেন। তখন—

তত্রাপশ্যৎস্থিতান্পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্

গীতা ১।২৬

= অর্জুন সেখানে দাড়িয়ে পিতর এবং পিতামহগণকে দেখলেন।

যেখানেতো মহর্ষি ব্যাসদেব পৌরাণিকমণ্ডলের মেরুদণ্ডই ভেঙে দিলেন, কেননা জীবিত পিতরই কেবল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, মৃত নয়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এই কথন অনুসারে—

তৈব স্ত্রী ন পুংমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ।

যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স লক্ষ্যতে।। –৫।১০

এই আত্মা না তো স্ত্রী, না তো পুরুষ এবং না তো নপুংসক, কিন্তু যেই যেই শরীরকে গ্রহণ করে, সেসবেই চিহ্নিত করা হয়।

তাহলে, মৃত্যুর পর পিতর সংজ্ঞা কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

কিছু পদ বেদে শ্রাদ্ধ আছে বলে পৌরাণিকরা তুলে ধরে । যেমন,

'অগ্নিষ্বাত্তাঃ' । অথর্ববেদ ১৮.৩.৪৪ এ সায়ণ এর অর্থ করেছে 'সোমযাগ যে করেনি', উবট যজুর্বেদ ১৯.৫৮তে এর অর্থ করেছে যে 'শ্রৌত স্মার্ত যজ্ঞ করেনি', আর মহীধর উলটো লিখেছে যে 'শ্রৌতস্মার্তযজ্ঞকারী' । অর্থাৎ তাদের অর্থ পরস্পরবিরুদ্ধ । অগ্নিষ্বাত্ত অর্থ যদি অগ্নি দ্বারা ভক্ষণকৃত করা হয় তবে তা ভুল, কেননা 'অদ্ভক্ষণে' ধাতুর সাথে 'ক্ত' প্রত্যয় হলে 'অদো জগ্ধি..' (অষ্টা০ ২.৪.৩৬) অনুযায়ী জগ্ধ হবে, অত্ত না। কেউ কেউ বলে 'অগ্নিনা স্বাত্তঃ স্বাদিতঃ' হবে এটাও ভুল, কেননা 'ক্ত' প্রত্যয় হলে 'স্বাদিন' হবে, 'স্বাত্ত' না ।

অগ্নি+সু+আত্ত এই ৩ পদ। আ পূর্বক 'দা' ধাতুতে 'ক্ত' প্রত্যয়ে অষ্টা০ ৭.৪.৪৭ অনুযায়ী 'আত্ত' হয়। 'দা' ধাতু থেকে 'আ' উপসর্গ যোগে এর অর্থ হয় 'গ্রহণ করা'। যেমন 'আদদাত'= 'আ দান' । 'আ'ত্ত শব্দের অর্থ গৃহীত।

যে অগ্নিকে গ্রহণ করেছে 'সুষ্ঠু আত্তো গৃহীতোঽগ্নির্যেন স অগ্নিষ্বাত্তঃ'। অষ্টা০ ২.২.৩৭ অনুযায়ী 'স্বাত্তাগ্নি' না হয়ে 'অগ্নিষ্বাত্ত' হয়েছে। অর্থাৎ অগ্নিহোত্র কর্ম, অগ্নিবিদ্যায় নিপুণ বা আগ্নেয়াদি অস্ত্র কৌশলী অগ্নিষ্বাত্ত। যদি 'অগ্নিনাস্বাত্তঃ' = স্বাদিত ইতি অগ্নিষ্বাত্তঃ ধরেন তাও এর অর্থ 'অগ্নিদগ্ধ' হবে না কেননা, এরা সবাই ঋষি মরীচির পুত্র বা ব্রহ্মার মানসপুত্র আপনাদের মতেই ।

যজুর্বেদ ১৯.৬০, ঋগ্বেদ ১০.১৫.১৪ ও অথর্ববেদ ১৮.২.৩৫ এ অগ্নিষ্বাত্ত ও অগ্নিদগ্ধ এবং অনগ্নিষ্বাত্ত ও অনগ্নিদগ্ধ পর্যায়বাচী তাই এদের অর্থও একই প্রকার হবে । আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার হলো পৌরাণিকরা এর অর্থ অগ্নিতে জ্বলিত করলেও সায়ণ - মহীধর ও উবট এই অর্থ করেনি ।

একটি উদাহরণ দেই, ‘প্রভিন্ন কমলোদরে মধূনি মধুকরঃ পিবতি’ অর্থাৎ কমলের উদরের মধু যে পান করে সে হলো ‘মধুকর’। এখন মধুকর আসলে কে তা অজ্ঞাত? কিন্তু অর্থ এখানে “ভ্রমর” ধরা হয় কেননা সে-ই কমলের মধু পান করে। একইভাবে বেদে অগ্নিষ্বাত্ত ইত্যাদি পিতরের বৈশিষ্ট্য আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি । তাই তা যে জীবিতদের জন্যই যথাযথ অর্থ প্রদর্শন করে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। “দেবযান” অর্থাৎ বিদ্বানরা যে পথে আসেন পিতররাও একইভাবে আসেন । দেব অর্থ বিদ্বান প্রসিদ্ধ (শত০ ৩.৭.৩.১০) ।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১.৬.৯.৬ অনুযায়ী, সোম প্রযাজকারী পিতর, যজ্ঞকারী পিতর বর্হিষদ্ আর যজ্ঞ না করা অগৃহস্থ = সন্ন্যাসী হলো অগ্নিষ্বাত্ত । যদি কেউ ‘গৃহমেধিনঃ’ মানে তাতেও অযাজ্ঞিক গৃহস্থ হয়, জ্বলে যাওয়া না । শত০ ব্রা০ ২.৪.১.৭ এ “স্বদয়তি” অর্থ হবে সু+অদয়তি, যেখানে স্বদ্ = স্বাদ নেওয়া । সুতরাং অগ্নি যাকে স্বাদ প্রদান করে, লাভ প্রদান করে বা অগ্নি যার কলাকৌশল যজ্ঞ ও জীবন-নির্বাহের সাধন । ব্রাহ্মণে প্রসঙ্গও যজ্ঞেরই চলছে । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ অনুযায়ী, যে সোম দ্বারা যাগ করছে সে পিতর, যে দান দ্বারা লোক জয় করে যে বর্হিষদ্ আর যে পূর্বের দুটোর কোনটা না করে অগ্নির দ্বারা লাভবান হয় সে অগ্নিষ্বাত্ত ।

বর্হিষদ্ = যে বর্হি বা কুশাসনে বসে, গৃহমেধী । তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ কিংবা অথর্ববেদ ১৮.১.৫১ সায়ণভাষ্যেও পাবেন এই অর্থ । অর্থাৎ দর্ভ বা কুশে বসে যোগাভ্যাসী সন্ধ্যাকারী পিতর । যেমন বিধান মনুস্মৃতি ২.১০৪ বা সামবেদ ১৪৩ এ উল্লেখিত রয়েছে। সোম্যাসঃ অর্থ হলো যে সোমরস প্রস্তুতকারক বা তা পানের যোগ্য, এটিও জীবিতদের বেলাতেই সম্ভব, মৃতদের জন্য না।

যে নিখাতা যে পরোপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতাঃ ।

সর্বাস্তানগ্ন আ বহ পিতৃন্হবিষে অত্তবে॥

অথর্ববেদ ১৮.২.৩৪

এখানে,

নিখাতাঃ = ভূমিতে প্রোথিত

পরোপ্তাঃ = ভাসিয়ে দেওয়া

দগ্ধাঃ = জ্বালানো

উদ্ধিতাঃ = নিক্ষিপ্ত

এই চার প্রকার মৃতের সংস্কার আছে বলে অনেকে দাবি করেন। এখন মন্ত্রের শেষভাগে “সর্বাস্তানগ্ন আ বহ পিতৃন্হবিষে অত্তবে” = সবাইকে অগ্নি অন্ন গ্রহণে নিয়ে আসুক - এতে আপত্তি নেই । আসুন বাকিগুলো দেখি।

গীতা ২.২৩-২৪ অনুযায়ী,

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।

ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।। ২/২৩

অর্থ: এই (আত্মাকে) অস্ত্রসকল ছেদ করতে পারে না, আগুন একে পোড়াতে পারে না, জল একে ভিজাতে পারে না, বাতাস একে শুকাতে পারে না।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২/২৪

অর্থ: এই আত্মা অচ্ছেদ্য, এই আত্মা অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং নিঃসন্দেহেই অশোষ্য। এই আত্মা নিত্য, সর্বত্রগমনকারী, স্থির, অটল, সনাতন।

শব্দার্থ হলো, অচ্ছেদ্য = কাটা যায় না। অদাহ্য = পুড়িয়ে দেওয়া যায় না। অক্লেদ্য = জলে ভেজানো যায় না। অশোষ্য = শুকানো যায় না।

উক্ত অথর্ববেদীয় মন্ত্রের পৌরাণিক অর্থ জীবাত্মার বেলায় প্রযোজ্য হবে না কেননা জীবাত্মাকে দগ্ধ, প্রোথিত করা যায় না । যজুর্বেদ ৪০.১৫ অনুযায়ী দাহসংস্কারই একমাত্র সংস্কার মৃতদেহের, ৪ প্রকারপদ্ধতির প্রশ্নই আসে না । যদি বলেন এটা জীব তথা দেহকে বলা তাহলে পরের অর্ধেক বৃথা কেননা দেহকে তো আর কেউ ডেকে আনতেও পারবে না ও দেহ আসেও না । যদি বলেন জীবদেহ ও আত্মা উভয়কে বলা তবে তা আর মৃতের শ্রাদ্ধ হলো কীভাবে ? কারণ দেহে আত্মা থাকলে সে তো জীবিতই ।

এখানে নিখাত - ভূগর্ভবিদ্যা পণ্ডিত, উদ্ধিত - ভূপৃষ্ঠ ও আকাশমার্গবিদ্ তথা খনিজ পদার্থ বহির্গতকারী পণ্ডিত, দগ্ধ - অগ্নিবিদ্যার পণ্ডিত পরোপ্ত - জলযান পণ্ডিত এই অর্থই যথাযথ ও বেদের প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রকাশ করে । যেভাবে স্নাতক অর্থ স্নান করা ব্যক্তি হলেও মূল লক্ষ্য হলো, গুরুকুল থেকে সমাবর্তনে স্নান করা বিদ্যার্থী এখানেও তেমনই ভাবে গ্রহণ করতে হবে ।

মনুস্মৃতি ৩.১৯৯ অনুযায়ী অগ্নিদগ্ধ ও অনগ্নিদগ্ধ কবি পুত্র এবং বর্হিষদ অগ্নিষ্বাত্ত সৌম্য ব্রাহ্মণদের পিতর । এখানেও এই পিতরদের অর্থ জ্বালানো হতে পারে না । এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত তা প্রমাণ করা যায় । কেননা কোথাও এই অর্থ নেই । মহাভারত বনপর্ব ৫০.৫ "সাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তথা" অনগ্নি ও সাগ্নি ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, এরা কেউ মৃত না । তাই মনুস্মৃতির উক্ত শ্লোক প্রক্ষিপ্ত । বনপর্বের ২৪.১৪-১৫ অনগ্নিকে নিরগ্নি ও সাগ্নিকে সাগ্নিহোত্র বলা হয়েছে । অর্থাৎ গীতা ৪.৩৩ অনুযায়ী যথাক্রমে জ্ঞানযজ্ঞ ও দ্রব্যযজ্ঞের যাজ্ঞিক এরা ।

বিষ্ণু পুরাণ ১.১০.১৮ অনুযায়ী,

অগ্রিষ্বাত্তা বহির্ষদোঽনগ্রয়ঃ সাগ্নয়শ্ব যে ।

তেভেয়ঃ স্বধা সুতে জজ্ঞ মৈনাং বৈধারিণীং তথা ॥

বর্হিষদ্, অগ্নিষ্বাদ্, অনগ্নি, সাগ্নি চার পিতর ব্রহ্মা উৎপন্ন করেন । যদি ব্রহ্মাই উৎপন্ন করেন তবে তাদের অর্থ প্রজ্বলিত পিতর কীভাবে হয়?

শিবপুরাণ রুদ্রসংহিতার সতীখণ্ড ৩.৪৮-৫০ অনুযায়ী,

মচ্ছরীরাত্তু ঘর্মাম্ভো যৎপপাত দ্বিজোত্তম ॥

ধর্মাম্ভো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণা জাতাঃ পিতৃগণাস্ততঃ ॥

ভিন্নাঞ্জননিভাস্সর্বে ফুল্লরাজীবলোচনাঃ ॥

নিতান্তয়তয়ঃ পুণ্যাস্সংসারবিমুখাঃ পরে ॥

সহস্রাণাং চতুঃষষ্টিরগ্নিষ্বাত্তাঃ প্রকীর্তিতা ॥

ষডশীতিসহস্রাণি তথা বর্হিষদো মুনে ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মার স্বেদ থেকে অগ্নিষ্বাত্ত পিতরের জন্ম । তাদের থেকে ৬৪ হাজার অগ্নিষ্বাত্ত ও ৮৬ হাজার বর্হিষদ্ বলা হয় ।

আমাদের জন্য পুরাণাদি প্রমাণ না, তারপরেও দুর্জনসন্তোষ ন্যায় অনুযায়ী বিপক্ষীরা যে তাদের গ্রন্থের এই অর্থও অস্বীকার করতে পারবেন না এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে ।

শ্রাদ্ধে কিভাবে ব্যক্তিগণকে ভোজন করানো উচিত, এ বিষয়ে বিচার করে দেখা গেল মৃতের শ্রাদ্ধই হতে পারেনা। উদাহরণার্থ—

যাবতো গ্রসতে গ্রাসানহব্যকব্যেষ্বমন্ত্রবিৎ ।

তাবতো গ্রসতে প্রেতো দীপ্তশূলষ্ট্যযোগুডান্ ॥

প্রক্ষিপ্ত শ্লোকযুক্ত মনুস্মৃতি ৩। ১৩৩

অর্থাৎ, অবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্য কব্যে যত সংখ্যক গ্রাস ভোজন করেন, পরলোকে (শ্রাদ্ধকর্তা) তত সংখ্যক জ্বলন্ত শূলষ্টি নামক লৌহপিণ্ড ভোজন করেন।

যস্য মিত্রপ্রধাননি শ্রাদ্ধানি চ হবীংষি চ।

তস্য প্রেত্য ফলং নাস্তি শ্রাদ্ধেষু চ হবিঃষু চ ॥

প্রক্ষিপ্ত শ্লোকযুক্ত মনুস্মৃতি ৩। ১৩৯

যার শ্রাদ্ধে ও দেবকার্যে মিত্রভোজন করান হয়, পরলোকে সে ঐ কার্যসমূহের ফল পায় না।

চিকিৎসকান্দেবলকান্মাংসবিক্রয়িণস্তথা ।

বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যযোঃ॥

প্রক্ষিপ্ত শ্লোকযুক্ত মনুস্মৃতি ৩। ১৫২

অর্থাৎ - বৈদ্য, পুজারী, কসাই, বণিক এসকলকে শ্রাদ্ধ ভোজন করানো উচিত নয়।

এরকম একটি লম্বা লিস্ট দেওয়া আছে, (৩.১৫৩-১৬৬) যেখানে গ্রামবাসীর বা রাজার ভৃত্য,পশুপালক, নট, অন্ধ,যিনি বেতন নিয়ে অধ্যাপনা করেন, যে বেতন দিয়ে পড়ে, শূদ্রের শিষ্য (অর্থাৎ শূদ্র অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়নকারী), শূদ্রের গুরু, যে সমুদ্রযাত্রা করে, স্তুতিপাঠক, যে তৈলের জন্য তিলাদি পেষণ করে, কূটসাক্ষী, রোগার্ত, অভিশাপগ্রস্ত,ধনু ও শরনির্মাতা, যে পুত্রের নিকট বেদশিক্ষা করে, শ্বেতীরোগী, দুষ্ট, উন্মত্ত, অন্ধ, বেদনিন্দুক, হস্তী গাভী অশ্ব ও উষ্ট্রের প্রশিক্ষক, নক্ষত্রাদি গণনাদ্বারা জীবিকার্জনকারী, পক্ষিপোষক, যুদ্ধার্থ অস্ত্রশিক্ষক, সেতুভঙ্গদ্বারা প্রবহমান স্রোত যে দেশান্তরে নিয়ে যায়, ঐরূপ স্রোত আবরণ করে, জীবিকার্থে যে গৃহনির্মাণ শিক্ষা দেয়, দূত, (বেতনভোগী) বৃক্ষরোপক, ক্রীড়ার্থ কুকুরপোষক, শ্যেনপক্ষীদ্বারা জীবিকার্জনকারী, যে কন্যাগমন করে, শূদ্রবৃত্তিধারী, (বিনায়কাদি) গণযাগকারী, আচারভ্রষ্ট, ক্লীব, সর্বদা যাজ্ঞাকারী, কৃষিজীবী,

মেষপালক, মহিষপালক, পুনর্ভূপতি ও ধনগ্রহণপূর্বক প্রেতদাহদিকারী যত্নসহকারে নিষেধই নয় বরং ভোজন সম্পাদনকারী এবং ভোজনকারীদের দণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। মৃতের শ্রাদ্ধকারী পৌরাণিকদের উচিত দণ্ড থেকে বাঁচার জন্য এই তর্কশূন্য, বেদাশাস্ত্রবিরুদ্ধ, অবৈদিক মর্যাদাকে সর্বথা ত্যাগ করা। একে তো শ্রাদ্ধ করাই অবৈদিক এবং তার ফলস্বরূপ আবার দণ্ড ভোগ করা এটা কোথাকার বুদ্ধিমত্তা?

যদি দুর্জনতোষণন্যায়বশত মৃতক শ্রাদ্ধকে স্বীকার করে নেওয়া যায় তাহলে এতে অনেক দোষের উৎপত্তি হবে। সর্বপ্রথম দোষ হবে কৃতহানির। কর্ম যে কেউ করুক আর ফল অপর কারো প্রাপ্ত হয়, এরূপ হলে তাকে কৃতহানি বলা হয়। পুত্র বি.এ. পরীক্ষা দিলো আর ডিগ্রি পেল পিতা! পরিশ্রম কোন একজন করলো আর ফল কোন অপরজন পেলো । দান পুত্র করলো আর ফল মাতা-পিতার প্রাপ্ত হলো তো তাতে কৃতহানির দোষ আসবে।

অপর দোষ অকৃতভ্যাগমের হবে। কর্ম না করেই ফল প্রাপ্ত হওয়া, তাকে অকৃতাভ্যাগম বলা হয়। মানুষ এমন করে অন্যায়ভাবে যে কেউ কষ্ট করে অথচ ফল দেয় অন্যকে, কিন্তু পরমাত্মার ন্যায়ে এমন কখনো হতে পারেনা। পৌরাণিকরআ বলে, যে ফল অর্পণ করার কারণে তা অপরজন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এই কথাটি ঠিক নয়। পুত্র কোন ব্যক্তিকে খুন করে তার ফল পিতাকে অর্পণ করলে কি পিতার ফাঁসী হয়ে যাবে। যদি এমনটা হয়ে যায় তাহলেতো লোকজন পাপের সঙ্কল্পও পৌরাণিক পণ্ডিতগণের দ্বারা করিয়ে নিবেন। এই দোষসমূহের কারণেও মৃতক শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় হয় না।

এবার প্রশ্ন এটা যে, মৃত পিতরদের কাছে ভোজন কী করে পৌঁছায়? মৃত্যুর পর জীব কোথাও জন্ম নেয়, যেমনটা গীতায় বলা হয়েছে -

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২/২২

= যেমন মানুষ জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইভাবে আত্মা জীর্ণ শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর আশ্রয় করে।

এখন বিচারণীয় বিষয় এটা যে তারা ভোজন কীভাবে পাবে ? ভোজন সেখানে পৌঁছায় নাকি পিতরগণ শ্রাদ্ধবাড়িতে ভোজন করতে আসেন। যদি এটা বলো যে সেখানেই পৌঁছায় তবে তা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিরুদ্ধ, কেননা তৃপ্তি ব্রাহ্মণের হয় । যদি ভোজন পিতরগণের নিকট পৌঁছে যেত তাহলে তো তারা শত শত ঘরে ভোজন করতে পারতো।

মনে করো, ভোজনই সেখানে পৌঁছে যায় তাহলে প্রশ্ন হলো, সেসব সামগ্রীই পৌঁছায় কি যা পণ্ডিতমশাইকে খাওয়ানো হয় নাকি পিতর যে যোনিতে জন্ম নেয় তেমনই পায় ? যদি সেসব সামগ্রীই লাভ করে যা ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় আর পিতর যদি নতুন জন্মে হয় পিঁপড়া, তাহলে তো পিতর সেই দানের চাপে পিষ্ট হয়ে মরে যাবে আর যদি পিতর হাতি হয় তাহলে তার উপর কি-ই বা প্রভাব পড়বে ? যদি যোনি অনুসারে দ্রব্য লাভ হয় আর পিতর মৃত্যুর পর মলভোজী কীট হয় তাহলে কি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ যা খেলো সেসব তার বিষ্ঠার রূপে খাবার হিসেবে লাভ হবে? এটা কতটা অন্যায় এবং অনাচার যে, ব্রাহ্মণদের ক্ষীর-পুলি খাওয়াতে হয় আর তার পরিবর্তে প্রাপ্ত হলো সে মল।

এই সিদ্ধান্তানুসারে শ্রাদ্ধকারীর উচিত, ব্রাহ্মণদের যেন কখনো ঘাস খাওয়ায়, কখনো মাংস, কখনো গোবর এবং কখনো লতাপাতা কেননা নানা প্রাণীর নানা খাদ্য এসবই। যোনিসমূহ অনেক এবং প্রত্যেকের ভোজন ভিন্ন ভিন্ন হয়, অতএব বদলে বদলে ভোজন করানো উচিত, কেননা না জানি পিতর কোন যোনিতে আছেন।

এবার অপর পক্ষেও কিছুর বিচার করে নেওয়া যাক। পিতর ভোজন করতে সেখানে আসেন। যখন মারা যাওয়া মানুষের আত্মীয় ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করতে আসেন তখন পিতর প্রসন্ন হয় এবং ব্রাহ্মণের পেটে এসে বসে যান।

শ্রাদ্ধকর্ত্রা তু যদ্যেকঃ শ্রাদ্ধে বিপ্রো নিমন্ত্রিতঃ ।

উদরস্থঃ পিতা তস্য বামপার্শ্বে পিতামহঃ ॥

প্রপিতামহো দক্ষিণতঃ পৃষ্ঠতঃ পিণ্ডভক্ষকঃ ।

শ্রাদ্ধকালে যমঃ প্রেতান্পিতৄংশ্চাপি যমালয়াৎ ॥

গরুড় পু০ প্রে০ ১০। ২৭-২৮

অর্থাৎ, শ্রাদ্ধকারীর পিতা পেটে বসে, পিতামহ বাম পার্শ্বে বসে, প্রপিতামহ ডান পার্শ্বে বসে ভোজন করেন।

পৌরাণিকগণ ! এটা ভোজন করানোর কেমন প্রক্রিয়া ? প্রথমে পিতর ভোজন করে নাকি ব্রাহ্মণ ? মিথ্যা ভোজন কে করে ? পিতর কি তবে ব্রাহ্মণের মল এবং রক্ত ভোজন করে ?

আরেকটা কথা পিতর শরীরসহিত আসে নাকি শরীর ব্যতীত ? যদি শরীরসহিত আসে তাহলে পেটে এতটা জায়গা নেই যে সবাই সেখানে বসে থাকবে আর তাছাড়া আসতে কেউ দেখলোও না, অতএব শরীর ব্যতীতই আসেন হয়তো। পিতরের আসা-যাওয়ায়, ভোজন করানোর জন্য সময়তো নিশ্চয়ই লাগে । অতএব পিতর আগের যে যে শরীর রেখে এখানে খেতে আসে সেই শরীরকে তো ততোক্ষণে ভস্ম করে দেওয়া হবে, বা দেহ পচে যাবে ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ [শ্রীকৃষ্ণ০ ১১৫.১১১] ও ভাগবতে শ্রাদ্ধে মাংস নিষিদ্ধ হলেও স্মৃতিতে ও পুরাণে মাংসের বিধানও আছে। বলতেই পারেন যে কলিযুগে এসব মান্য না , কিন্তু বিধান আছে এটা মানতে তারা বাধ্য । মাংসাহারী পিতর এরা কী আদৌ জীবাত্মা নাকি পিশাচ ? যেমন মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৮৮ অধ্যায়ে,

শ্রাদ্ধকালে যে সমস্ত ভোজ্য প্রদান করা যায় তন্মধ্যে তিলই সর্বপ্রধান। শ্রাদ্ধে মৎস্য প্রদান করিলে পিতৃগণের দুই মাস, মেষমাংস প্রদান করিলে তিন মাস, ও শশ মাংস প্রদান করিলে চারি মাস, অজমাংস প্রদান করিলে পাঁচ মাস, বরাহ মাংস প্রদান করিলে ছয় মাস, পক্ষীর মাংস প্রদান করিলে সাত মাস, পৃষৎ নামক মৃগের মাংস প্রদান করিলে আট মাস, রুরু মৃগের মাংস প্রদান করিলে নয় মাস, গবয়ের মাংস প্রদান করিলে দশমাস, মহিষ মাংস প্রদান করিলে একাদশ মাস এবং গোমাংস প্রদান করিলে এক বৎসর তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে। ঘৃত পায়স গোমাংসের ন্যায় পিতৃ গণের প্রীতিকর ; অতএব শ্রাদ্ধে ঘৃতপায়েস প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য।

বলা বাহুল্য গীতাপ্রেস এই সম্পূর্ণ অংশ লোকলজ্জার ভয়ে বাদ দিলেও, হরিদাসে যথাবৎ আছে।

বিষ্ণুপুরাণ ৩.১৬ অনুযায়ী,

ঔর্ব্ব কহিলেন, শ্রাদ্ধের দিনে ব্রাহ্মণদিগকে হবিষ্য করাইলে, পিতৃগণ একমাস পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, মৎস্য প্রদানে দুইমাস, শশক মাংস প্রদানে তিন মাস, পক্ষী মাংস প্রদানে চারিমা, শূকর মাংস প্রদানে পাঁচ মাস, ছাগ মাংস প্রদানে ছয় মাস, এণ মাংস দিলে সাত মাস, রুরুমৃগমাংস প্রদান করিলে আট মাস, গবয় মাংস প্রদানে

নয় মাস, মেষমাংস প্রদানে দশ মাস, পায়স প্রদান করিলে এগার মাস পর্যন্ত পিতৃগণ পরিতৃপ্ত থাকেন। পরন্তু যদি বার্ধ্রীণস মাংস দেওয়া যায় , তাহা হইলে পিতৃলোক চিরদিন তৃপ্ত থাকেন। হে রাজন! গণ্ডারের মাংস, কৃষ্ণশাক ও মধু এই সমুদায় দ্রব্য শ্রাদ্ধকর্মে অত্যন্ত প্রশস্ত ও অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক।

এভাবে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত যে শ্রাদ্ধ জীবিত মাতা-পিতারই হতে পারে। মহর্ষি দয়ানন্দেরও এটাই অটল সিদ্ধান্ত। মৃতক শ্রাদ্ধ অবৈদিক এবং অশাস্ত্রীয়। এটা তর্কদ্বারাও প্রমাণিত হয়না। এটা স্বার্থপর, ঠকবাজ এবং পৌরাণিকদের মায়াজাল। সাবধান! পৌরাণিক লেটার বক্সে ছেড়ে আসা এই পার্সেল তার গন্তব্যে পৌঁছায়না ! তাই আসুন জীবিত পিতা-মাতা-গুরুজনদের সেবা করি ।

ইত্যোম্

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদানুসারে আপনার প্রকৃত বন্ধু কে ?

ন স সখা যো ন দদাতি সখ্যে সচাভুবে সচমানায় পিত্বঃ । অপাস্মাৎপ্রেয়ান্ন তদোকো অস্তি পৃণন্তমন্যমরণং চিদিচ্ছেৎ ॥

=[ঋগ্বেদ-১০।১১৭।৪]=

[১] (স সখা ন)=সে বন্ধু নয়, (য়ঃ)=যে (সখে) তার বন্ধুর জন্য,(সচাভুবে)= সবসময় পাশে থাকা মানুষের জন্য, সুখ-দুঃখে সাহায্যকারী এবং (সচমানায়) সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য(পিত্বঃ ন দদাতি) অন্ন প্রদান করে না। যখন আমাদের প্রয়োজন ছিল, তখন সেই বন্ধু আমাদের সাহায্য করেছিল, কখনো আমাদের ছেড়ে যায়নি। কিন্তু আজ হঠাৎ তার অন্নের প্রয়োজন হলো, আর আমরা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম, তাকে অন্ন দিলাম না এবং তাকে অভুক্ত অবস্থায় মরতে দিলাম—এটা কি বন্ধুত্ব হতে পারে? এর চেয়ে বড় শত্রুতা এবং অকৃতজ্ঞতা আর কিছু হতে পারে না।

[২] বেদ বলে (অস্মাৎ) এর থেকে (অপ প্রেয়াৎ) দূরে সরে যাওয়াই উচিত। (তৎ ওকঃ ন অস্তি) এটি আর ঘর থাকে না। (পৃণন্তম্) যিনি অন্নাদি দান করেন, (অন্যম্) অন্যকে (অরণং চিৎ) এমনকি পরকেও (ইচ্ছেৎ) -ক্ষুধার্তকে অন্ন দানকারী, অপরের ঘরকেও নিজের ঘর করে নেয়। কিন্তু যে অন্ন দান করে না, তার নিজের ঘরও পর হয়ে যায়।

ভাবার্থ: যে ক্ষুধার্তকে অন্ন দেয় না, তার নিজের ঘরও পর হয়ে যায়। আর যে অন্ন প্রদান করে, সেই পর ঘরও নিজের হয়ে যায়।

রাবণের দশ শিরের রহস্যভেদ

রামায়ণে রাবণের দশ শিরের উল্লেখ আছে। তাছাড়া যুদ্ধে রাম বাণ দিয়ে যে শির কাটতেন সেই স্থলে পুনরায় অন্য শির গজিয়ে উঠতো এইরকম বর্ণনাও লক্ষিত হয়-

📖 সন্ধায় ধনুষা রামঃ শরমাশীবিষোপমম্।

রাবণস্য শিরোঽচ্ছিন্দচ্ছ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।

তচ্ছিরঃ পতিতং ভূমৌ দৃষ্টং লোকৈস্ত্রিভিস্তদা ॥

তস্যৈব সদৃশং চান্যদ্ রাবণস্যোত্থিতং শিরঃ।

[যুদ্ধকাণ্ড ১০৭.৫৩-৫৫]

রাম সর্পবিষসদৃশ বাণ ধনুকে সংযোজন করে রাবণের শির ভূপাতিত করলেন। সকলে সেই দৃশ্য দর্শন করলেন। সেই কর্তিত স্থানে পুনরায় নতুন শির গজিয়ে উঠলো।

এখন এখানে বিচার্য এই যে, শরীরের কোন অঙ্গ কর্তিত পুনরায় সেখানে সেই অঙ্গ উৎপন্ন হতে পারে না। হস্ত কর্তিত হলে পুনঃ হস্ত উৎপন্ন হতে পারে না। সেইরূপ পদ ও মস্তকের সম্বন্ধেও বুঝতে হবে।

রাবণের এক মস্তক ও দ্বিহস্ত সম্পর্কে বহু প্রমাণ পাওয়া যায় যা নিম্নে লিখিত হল-

সুন্দর কাণ্ডে দেখা যায়, রামের চররূপে হনুমান গভীর রাত্রে রাবণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন-

📖 কাঞ্চনাংগদসন্নদ্ধৌ দদর্শ সঃ মহাত্মনঃ।

বিক্ষিপ্তৌ রাক্ষসেন্দ্রস্য ভুজাবিন্দ্রধ্বজোপমৌ ।।

[সুন্দরকাণ্ড ১০.১৫]

সুবর্ণময় অঙ্গদে ভূষিত মহাকায় রাক্ষসরাজ রাবণের বাহুদ্বয় ইন্দ্রধ্বজের মত শয্যার ওপর ছড়ানো রয়েছে।

এখানে 'ভুজ ইন্দ্রধ্বজোপমৌ' শব্দটি দ্বিবচনান্ত; বহুবচনান্ত নয়।

📖 তস্য রাক্ষসরাজস্য নিশ্চক্রাম মহামুখাৎ।

শয়ানস্য বিনিঃশ্বাসঃ পূরয়ন্নিব তদ্ গৃহম্।।

মুক্তামণিবিচিত্রেণ কাঞ্চনেন বিরাজতা।

মুকুটেনাপবৃত্তেন কুণ্ডলোজ্জ্বলিতাননম্।।

[সুন্দরকাণ্ড ১০.২৪-২৫]

মণিমুক্তাখচিত কুণ্ডলেল উজ্জ্বল আভায় রাবণের মুখখানাও উজ্জ্বল তাঁর মুখবিবর হতে বহির্গত ভুক্তান্ন ও পানের গন্ধপূর্ণ নিঃশ্বাসে ঘর ভরে আছে।

এখানে 'মহামুখাৎ' এবং 'আননম্' শব্দদ্বয় একবচনে।

পঞ্চবটি থেকে সীতা হরণের পূর্বে রাবণ সীতাকে বলেছিলেন -

📖 উদ্বাহেয়ং ভুজাভ্যাং তু মেদেনীমস্বরে স্থিতঃ।

আপিয়েয়ং সমুদ্রং চ মৃত্যুং হন্যাং রণে স্থিতঃ ।।

[অরণ্যকাণ্ড ৪৯.৩]

আমি আমার বাহুবলে পৃথিবী উত্তোলন করতে পারি, সমুদ্র শোষণ করতে পারি, রণে স্থিত হয়ে মৃত্যুকে পরাজিত করতে পারি।

'ভুজাভ্যাং' দ্বিবচনান্ত বিধায় তা দুই হাত নির্দেশ করে।

রাবণাদি এরা মায়া রচনা করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

যেমন-

১) মারিচ মায়াবী মৃগরূপ ধারণ করেছিলেন, রৌপ্য বিন্দু যুক্ত স্বর্ণিম দেহ তৈরি করা হয়েছিল সেইরূপও বলা হয়েছে।

📖 সোবর্ণস্তং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।

আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমূখে চর।।

[অরণ্যকাণ্ড ৩৬.১৮]

হে মারীচ, তুমি সূবর্ণ চিত্ত রজতবিন্দু যুক্ত হয়ে রামের আশ্রমে সম্মুখে বিচরন করো।

২) রাবণ লঙ্কায় রামের কৃত্রিম কর্তিত শির সীতার সম্মুখে রেখেছিলেন যে শিরের নির্মাতা ছিলেন মধুজিহ্ব নামক রাক্ষস।

📖 মোহয়িষ্যাবহে সীতাং মায়য়া জনকাত্মজাম।

শিরো মায়াময়ং গৃহ্য রাঘবস নিশাচর।।

[যুদ্ধ০ ৩১.৭-৮]

হে মধুজিহ্ব! তুমি রামের কর্তিত শির তৈরি করে নিয়ে এসো। আমি তাই দিয়ে সীতাকে প্রতারিত করবো।

৩) ইন্দ্রজিত ও কৃত্রিম সীতা যুদ্ধের মধ্যে রামের সম্মুখে বধ করেছিলেন।

📖 ইন্দ্রজিৎ তু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তথা।

বলেন মহতাকৃষ্য তস্যা বদমরোচয়ৎ।।

[যুদ্ধ০ ৮১.৫]

ইন্দ্রজিত মায়াময়ী সীতাকে রথে উপবিষ্ট করিয়ে তাকে বধ করলেন।

এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাবণের শিরগুলি জন্মজাত ছিলো না কেননা জন্মজাত হলে পুনরায় সেখানে শিরের উদয় হওয়া সম্ভব হতো না। রামায়ণের বচনে শিরের স্থানে অন্য নতুন শির গজিয়ে উঠলো ঠিক এইরকম শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। সেখানে শির উত্থিতং অর্থাৎ উঠে এলো এইরূপ বলা হয়েছে। সুতরাং রাবণের দশ শির কৃত্রিম বা মেকি বুঝতে হবে। রাবণাদি মায়াবী অর্থাৎ ইন্দ্রজাল বিশেষজ্ঞ ছিলেন, রামায়ণে কয়েকটি স্থলে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। যা আমরা উপরে দেখে এসেছি।

এইরূপ রাবণের দশ শির কৃত্রিম ছিলো এটা স্বীকার করা যেতে পারে। যুদ্ধকালে শত্রুকে প্রতারিত করার জন্য এইরকম কৌশল করে থাকবে যে শত্রু বাস্তবিক শির যেন ছেদন না করতে পারে যা তার নিম্নে লুকায়িত থাকতো। এই ভেদ বিভীষণ রামকে বলে দিয়েছিলেন। সেই কর্তিত স্থানে নতুন শির উঠে আসতো। এই হলো রাবণের দশ শিরের রহস্য।

কেমন ছিলো মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের রামরাজ্য?

চলুন বাল্মীকি রামায়ণ থেকে জেনে নেই।

📖 ন পর্যদেবন্ বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্।
ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।। ১

■শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালে কোনদিন বিধবাদের বিরহ-বিলাপ শোনা যায়নি। সর্পাদি শ্বাপদের ভয় অথবা রোগভয় কখনও প্রাদুর্ভূত হয়নি।

📖 নির্দুস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশত্।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রোতকার্যাণি কুর্বতে।। ২

■সমগ্র রাজ্যের কোথাও চোর-ডাকাতের নাম পর্যন্ত শোনা যেত না। রাজ্যে কেউ অনর্থকারী কার্যে লিপ্ত হোত না কিংবা বৃদ্ধগণের কদাপি নবীনদের জন্য অন্ত্যেষ্টি সৎকার করার প্রয়োজন পড়ত না।

📖 সর্বং মুদিতমেবাসীত্ সর্বো ধর্মপরোऽভবত্।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্।। ३

■সকলে সদা আনন্দে থাকত এবং ধর্মাচরণ করত।
শ্রীরামচন্দ্রের শাসনে একে অন্যকে হিংসা করত না।

📖 আসন্ বর্ষসহস্রাণি তথা পুত্রসহস্রিণঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ্চ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।। ४

■শ্রীরামচন্দ্রের শাসনকালে প্রজাগণ সহস্র বৎসর যাবৎ জীবিত থাকত, সহস্র পুত্রের জনক হোত এবং নীরোগ ও শোকশূন্য হয়ে বসবাস করত।

📖 রামো রামো রাম ইতি প্রজানামভবন্ কথাঃ।
রামভূতং জগদভূদ্ রামে রাজ্যং প্রশাসতি।। ५

■রামরাজ্যে প্রজাবর্গের মুখে-মুখে কেবল রাম, রাম নাম এবং রামকথা শোনা যেত। অখিল রাজ্য রামময় হয়ে থাকত।

📖 নিত্যমূলা নিত্যফলাস্তরবস্তত্র পুষ্পিতাঃ।
কামবর্ষী চ পর্জন্যঃ সুখস্পর্শশ্চ মারুতঃ।। ६

■তথায় বৃক্ষরাজি সর্বত্র ফল-মূল, পত্র-পুষ্পাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। মেঘ প্রয়োজনানুসারে বর্ষিত হোত এবং পবন সদা সুখকর হয়ে প্রবাহিত হোত।

📖 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শুদ্রা লোভবিবর্জিতাঃ।
স্বকর্মসু প্রবর্তন্তে তুষ্টাপ্যঃ স্বৈরেব কর্মভিঃ।। ७

■ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চতুর্বর্ণের প্রজাই নির্লোভ ছিলেন। সকলেই স্ব স্ব বর্ণাশ্রমের কর্তব্যে পালনে সুপ্রসন্ন এবং নিজ নিজ কর্মে রত থাকতেন।

[বাল্মীকি রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড ১২৮/৯৮-১০৪]

[গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর রামায়ণ]

আত্মা কি এক না অনেক?

🔷নাদ্বৈতমাত্মনো লিঙ্গাৎ তদ্ভেদপ্রতীতেঃ।। (সাংখ্যদর্শন ৫/৬১)

সূত্রার্থ- লক্ষণের ভেদ প্রতীতি হওয়ায় আত্মাকে অদ্বৈত(এক) বলা যায় না।।

ব্যাখ্যাঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভেদে আত্মা দুই প্রকার। এদের পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদ দেখা যায়। যেমন পরমাত্মা সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান কিন্তু জীবাত্মা একদেশী, অল্পজ্ঞ ও অল্প শক্তির অধিকারী। এর দ্বারা আত্মার একাত্মতার খণ্ডন হয়।

এবার যদি বলি জীবাত্মা কি এক না অনেক? উত্তর হলো 'অনেক'। যদি জীবাত্মা এক হতো তবে-

(১) সকল জীবের জন্ম-মৃত্যু একই সময়ে হতো, উদাহরণস্বরূপ পিতা ও পুত্রের বয়স একই হতো।

(২) একজন মাত্র জীব মুক্তি পেলে বিশ্বের সকল জীবাত্মাই মুক্তি লাভ করতো।

(৩) সৃষ্টির সকল জীবাত্মা একই সময়ে একই সাথে সুখী ও দুখী হতো।

কিন্তু বাস্তবে এসবের কোনোটাই দেখা যায় না।

অতএব, আত্মার একাত্মতা নিছক অদার্শনিক কল্পনামাত্র।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর।

কোনও জীবকে হত্যা করা পাপ, কিন্তু মশা- মাছি-কীট ইত্যাদির হত্যা করায় কোন পাপ হয় ?

নির্মূলনঃ- হত্যা করা পাপ একদম সঠিক, কিন্তু যে দুষ্কর্ম করে এবং যে মানব-জাতির জন্য ক্ষতিকারক তাকে সরকারও ফাঁসির শাস্তি ঘোষণা করে।

মশা-মাছিকে গৃহে প্রবেশ থেকে বাধা প্রদান করা যেতে পারে, এতে কোন পাপ নেই। কিন্তু যে মশা-মাছি-জীব-জন্তু-কীট ক্ষতি করে সেগুলিকে শেষ করা অথবা মারা উচিত, কারণ মনুষ্য-যোনি সর্বশ্রেষ্ঠ, এদের রক্ষা করা মানুষের পরমকর্তব্য। যার দ্বারা মানবের নিজের জীবনে বিপদ হতে পারে, তাকে হত্যা করায় কোন আপত্তি নেই। মানব যদি মানব জাতির জন্য ঘাতক হয় তবে তার হত্যা করায় পাপ হয় না।

মহাভারত যুদ্ধ এর প্রমাণ এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও অর্জুনকে বোঝাতে গিয়ে (সংসারকে বলেছেন) বলেছেন যে, যে অধর্মী তার দেহ নষ্ট করাই ধর্ম, কারণ শরীর দ্বারা ধর্মাধর্মের কার্য হয় আত্মা কখনও মরে না। কৌরবদের হত্যায় শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সঙ্গ এইজন্যই দিয়েছিলেন যে, কৌরবরা অধর্মের কার্যই করত কেবল। তাদের থামানোর জন্যই পাণ্ডবদের ছাড় দেওয়া হয়েছিল যে, যুদ্ধের মাধ্যমে কৌরবদের সমাপ্ত করতে হবে। অসুরদের হত্যা করায় কোন পাপ নেই – এ তো পুণ্যকর্ম। শত্রুর হত্যাতেই পুণ্য, নতুবা শত্রুর হাতে নিজের প্রাণ হারানো কোথাকার বুদ্ধিমানী ?

এমনই জীব-জন্তু-কীট ইত্যাদিও (সাপ-বিছে-সিংহ ইত্যাদি বন্যপ্রাণী) ঈশ্বরের দ্বারা নির্মিত আর এদের হত্যা করার আমাদের কোন অধিকার নেই, কিন্তু যখন এই জীবগুলি মানুষের ক্ষতি করে তখন এদের হত্যা করতেই হয়, একে আপাতধর্মও বলে অর্থাৎ এ ধর্ম বিরুদ্ধ তো ঠিকই, কিন্তু এছাড়া আর কোনো
উপায় নেই।

ঘরে তোতাপাখি আসলে আমরা তাকে বড়ই প্রীতির সঙ্গে দেখি। তাকে স্পর্শ করার চেষ্টাও করি। তাকে হত্যার সামান্য বিচার আমাদের আসে না, কারণ তার দ্বারা আমাদের কোনো ক্ষতি হয় না। চড়ুই-পায়রা ইত্যাদি পক্ষী ঘরে আসে। তাদেরকে আমরা হত্যা করি না, তাড়িয়ে দিই যাতে তারা ঘরের মধ্যে এখানে- ওখানে কোন ক্ষতি না করে, এদের হত্যা করার ভাবনা কখনো উৎপন্ন হয় না। অতএব যার দ্বারা মনুষ্য-জাতির কোন ক্ষতি হয় না, সেই সমস্ত জীবকে হত্যা করা পাপ, যেমন – কুকুর, ঘোড়া, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদি। সিংহ জঙ্গলে থাকে কিন্তু যদি সে শহরের দিকে অগ্রসর হয় আর নরসংহার শুরু করে দেয় তবে তার হত্যাতেই কল্যাণ।

যে জীব আমাদের (মানব জাতিকে) বিরক্ত করে না, আমাদেরও তাদেরকে আঘাত করা উচিত নয়, বরং তাদের প্রতি স্নেহ রাখা দরকার - তাদের কখনও হত্যা করা উচিত নয়। পশু-পক্ষী আমাদেরই তো সেবা করে। কীট-পতঙ্গ ভক্ষণ করে, নোংরা পরিষ্কার করে। মাছেরা জলে বাস করে জল পরিষ্কার করে, অতএব কোনও জলের প্রাণীকে হত্যা করা উচিত নয়।

গরু সমস্ত পশুর প্রতিনিধি, অতএব গরু হত্যা করা ভয়ংকর পাপ। বেদে বলা হয়েছে (ঈশ্বরের আদেশ) যে, 'গোহত্যা কখনোই করবে না', এর এ অর্থ নয় যে, অন্যান্য পশুদের হত্যা করো। গাভীর মধ্যে সমস্ত অহিংসক পশুর গণনা করো, কারণ গোরু সমস্ত পোষ্যদের প্রতিনিধি।

তাই যতটা সম্ভব মশা-মাছি ইত্যাদি প্রাণীর হত্যা না করে, ঘরে এদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করুন। ব্যর্থ হত্যা ত্যাগ করে এগুলির থেকে রক্ষা পাবার উপায় করা উচিত।

©বাংলাদেশ অগ্নিবীর।

সত্যার্থ প্রকাশ তথা অন্য মতের আলোচনা

সত্যার্থ প্রকাশ সম্পর্কে লোকেরা এই অভিযোগ করে যে, এর মধ্যে অন্যান্য মতের আলোচনা করা হয়েছে। যারা অন্যের আলোচনা করে বা তাদের ভুল বের করে তাকে ধর্ম বলে স্বীকার করা যায় না কেননা মনু ধৃতিঃ, ক্ষমা ইত্যাদিকে ধর্মের লক্ষণ বলেছেন। খন্ডনকারীকে ক্ষমাশীল কীভাবে বলা যেতে পারে? তাকে তো অসহিষ্ণু নাম দেওয়া দরকার। তারা কবীরকে-

পখর পূজে হরি মিলে, তো ম্যায় পূজঁ পহার।
উসসে তো চক্কী ভলী, পিস খায় সংসার।।
(পাথর পূজায় যদি হরি পাওয়া যায়, তাহলে আমি পূজি
পাহাড় তার চেয়ে তো চাকী ভালো যা পিশে খায় সংসার।)

বলতে শুনবে, কিন্তু কবীরের গণনা নিজেদের সাধু-সন্তের মধ্যে গর্বের সঙ্গে করবে। অথচ সত্যার্থ প্রকাশে মূর্তি পূজার সমালোচনা তার কাছে অসহ্য। সর্বপ্রথম বিচার্য বিষয় এই যে, সত্যার্থ প্রকাশের এই সমালোচনা সত্য না অসত্য। যদি সেখানে অসত্য সমালোচনা করা হয়ে থাকে তবে তার প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু প্রতিবাদ কী করে করবে? কেননা সত্যার্থ প্রকাশ তাদেরই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের সত্য সমীক্ষা করা হয়েছে। আলোচ্যের আলোচনা হতেই হবে। যদি তার দ্বারা আলোচনা সত্য হয় তবে মনুষ্যের ধর্ম, কর্তব্য এই যে, সত্য গ্রহণ করতে এবং অসত্য ত্যাগ করতে সর্বদা উদ্যত থাকা দরকার। দ্বিতীয়ত, যদি অন্যের সমালোচনা করা ঠিক না হয় তাহলে সাহিত্য ইত্যাদি প্রত্যেক প্রণালীর উপর যে সব আলোচনাত্মক গ্রন্থ লেখা হয়ে থাকে তার উপর প্রতিবন্ধকতা আসবে। আমাদের কাছে এম.এ. প্রশ্নের উত্তর পুস্তিকা পরীক্ষণের জন্য আসে। যে সব ছাত্র প্রশ্নের উত্তর আলোচনা-প্রত্যালোচনাপূর্বক দেয় তাদেরকে আমরা ভাল নম্বর দিই এবং যারা সাধারণ উত্তর দেয় তাদেরকে সাধারণ নম্বর দেওয়া হয়। এখানেও সব বিদ্বানদের উপর প্রতিবন্ধকতা লাগিয়ে দেওয়া উচিত যে, যেসব ছাত্র আলোচনা-প্রত্যালোচনা পূর্বক লিখবে তাদেরকে উত্তীর্ণ করা হবে না এবং যারা সাধারণ উত্তর দেবে তাদেরকে বেশী নম্বর দিয়ে উত্তীর্ণ করা হবে। এর ফলে কি বিদ্যার স্তর উঁচু হতে পারবে? বা কোন চিন্তাবিদ এটা মানতে রাজি হবে? যখন শিক্ষায় নিরন্তর সংস্কার হেতু আলোচনা প্রয়োজন তখন ধর্মের সংস্কার হেতু আলোচনার প্রয়োজন কেন নেই? আপনি কি ধর্মে বিকৃতি কামনা করেন, সংস্কার নয়? মনে রাখবেন, যেমন আহারের বিকৃতি শরীরকে অসুস্থ করে দেয় সেইরূপ ধর্মের বিকৃতি অন্তঃকরণকে অসুস্থ করে দেয় এবং অসুস্থ মানসিকতাকেও ভালো করে না। আবার যদি ভুলকে ভুল না বলে ঠিক বলা হয় তবে সেই ভুলই ব্যক্তির সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায়। যদি যে যেমন চায় সেইরকম করতে দেওয়া হয় তাহলে শিক্ষক ছাত্রদের খাতা দেখেন কেন? সব ঠিক আছে লিখে দিলেই হলো। আপনি কি আপনার শিশুদের জন্য এমন শিক্ষক পছন্দ করবেন যিনি ভুল প্রশ্নের উপর ঠিক চিহ্ন লাগান। করবেন না তো? তাহলে ধর্মের ব্যাপারে ভুলের উপর ভুল চিহ্ন লাগানোকে অসহিষ্ণু কী করে বলতে পারেন?

জনৈক আর্য পুরুষ একটা শিক্ষণ সংস্থা চালান। একদিন তাঁর কাছে একজন অভিভাবক এলেন। আর্য মহাশয় সে সময় সত্যার্থ প্রকাশ পাঠ করছিলেন। তাঁকে পড়তে দেখে সেই ভদ্রলোক বললেন "আপনি কি এটাও পড়েন? এটা ভালো গ্রন্থ নয়। এর মধ্যে সবই খন্ডন করা হয়েছে। লোকের উচিত নিজের কথা বলা, কারও খন্ডন করা উচিত নয়। এমন ব্যক্তিকে লোকেরা অসহিষ্ণু মনে করে। আমার দৃষ্টিতে এমন করা ভুল। সবার স্বাধীনতা থাকা চাই, যে যেমন ইচ্ছা, তেমন লিখতে পারে।"

তাঁর চলে যাওয়ার পর আর্য ভদ্রলোক তৃতীয় শ্রেণীর, যাতে উক্ত মহাশয়ের ছেলে পড়ে, অধ্যাপিকাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন মনোজ ক্লাসে কেমন পড়াশুনা করছে? তিনি বললেন- অন্যান্য বিষয়ে তো সাধারণ কিন্তু গণিত দুর্বল। তখন আর্য ভদ্রলোক বললেন "আজ সে গণিতের যে প্রশ্নের সমাধান করবে তা না দেখে সবার উপর ঠিক চিহ্ন লাগিয়ে দেবেন।" অধ্যাপিকা বললেন যে, তার বাবা প্রতিদিন তার খাতা দেখে, যদি আমি ভুলের উপর ঠিক চিহ্ন লাগাই তাহলে কালই এসে হাজির হবেন। তিনি বললেন যে, আপনি চিন্তা করবেন না, আমি সব সামলে নেব। অধ্যাপিকা এইরকমই করলেন। সেই দিন সেই ভদ্রলোক খাতা দেখে রাগে ফেটে পড়লেন। ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন গাধা আজ তোর গণিতের খাতা পরীক্ষা করেছে? শিশু উত্তর দিল যে, মমতা ম্যাডামই দেখেছেন। তিনি বললেন গাধা, পালা গাধা। ভুল প্রশ্নের উপরও ঠিক চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে। পরদিন পিতা খাতা নিয়ে হাজির হয়ে রেগে বললেন তৃতীয় শ্রেণির অধ্যাপিকাকে ডাকুন। আপনি এমন এমন অধ্যাপিকাকে রেখেছেন যারা কিছু জানেনা। আপনি তাদের সরিয়ে দিয়ে যোগ্য অধ্যাপিকা রাখুন। আর্য ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন কী ব্যাপার? আজ আপনি অত্যন্ত রেগে আছেন, দেখছি। তিনি বললেন রাগের ব্যাপারই বটে। এই গণিতের প্রশ্নগুলি দেখুন। সমস্ত ভুল প্রশ্নের উপর ঠিক চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে। আর্য ভদ্রলোক বললেন এতে তাঁর কোন দোষ নেই। কাল আমিই বলেছিলাম যে, কারও খন্ডন করবে না। খন্ডনকারীকে অসহিষ্ণু বলা হয়, যে যেমন ইচ্ছা বলুক বা লিখুক। তিনি বললেন এই ভাবে সমস্ত শিশুরা ফেল হয়ে যাবে। দেখুন, ভুলকে ভুল বলা উচিত এবং ঠিককে ঠিক। এই রকম না করলে বালক জানবে কী করে যে, তার কোন প্রশ্নোত্তর অশুদ্ধ এবং সে তার ভুল কীভাবে সংশোধন করবে?

আর্য ভদ্রলোক বলতে লাগলেন আমি আপনার কালকের আদেশ পালন করেছি মাত্র। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, যখন আমরা এরকম করি তখন আপনি বলেন যে, খন্ডন আবশ্যক এবং যখন এই কাজ সত্যার্থ প্রকাশ করে তাহলে ভুল কী করে হয়ে গেল? সেই ভদ্রলোক ঘাড় নিচু করে চলে গেলেন। তার পর উনি কখনও বলেননি যে খন্ডন করা উচিত নয়।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

অগ্নিহোত্রে আজ্যাহুতি মন্ত্র এবং অষ্টাজ্যাহুতি মন্ত্র ও তাদের অর্থ

আমরা বৃহৎ বৈদিক যজ্ঞে আজ্যাহুতি ও অষ্টাজ্যাহুতি দিয়ে থাকি।

প্রথমে আসি আজ্যাহুতি মন্ত্রে। এ মন্ত্র আমরা যেভাবে পড়ি তা হলো:

ওঽম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।

অগ্ন আয়ুংষি পবস আ সুবোর্জমিষং চ নঃ।

আরে বাধস্ব দুচ্ছুনাং স্বাহা।।

ইদমগ্নয়ে পবমানায়- ইদং ন মম।।১।।

[ঋগ্বেদ ৯।৬৬।১৯]

হে প্রাণের প্রাণ, দুঃখবিনাশক, প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মন্। আপনি আমাদের জীবনের রক্ষা করেন, আপনি আমাদেরকে বল ও অন্নাদি প্রাপ্ত করান এবং দুষ্ট জীব-জন্তু থেকে আমাদের রক্ষা করুন। এই আহুতি পতিতপাবন পরমাত্মার জন্য, আমার জন্য নয়।

ওঽম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।

অগ্নির্ঋষিঃ পবমানঃ পাঞ্চজন্যঃ পুরোহিতঃ।

তমীমহে মহাগয়ং স্বাহা।।

ইদমগ্নয়ে পবমানায়- ইদং ন মম।।২।।

[ঋগ্বেদ ১।৬৬।২০]

জ্ঞানস্বরূপ, সর্বব্যাপক পরমাত্মা আমাদের পবিত্রকারী মন্দ চিন্তা থেকে রক্ষা করেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে শুভ মার্গে চালনা করেন, সকলের হিতকারী, সকলের অগ্রণী পরমাত্মাই। সেই স্তুতিযোগ্য পরমেশ্বরকে আমরা প্রাপ্ত করি। এই আহুতি পতিত পাবন পরমাত্মার জন্য, আমার জন্য নয়।

ওঽম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।

অগ্নে পবস্ব স্বপা অস্মে বর্চঃ সুবীর্য়ম।।

দধদ্রয়িং ময়ি পোষং স্বাহা।।

ইদমগ্নয়ে পবমানায়- ইদং ন মম।।৩।।

[ঋগ্বেদ ৯।৬৬।২১]

হে প্রকাশস্বরূপ প্রভো! আপনি উত্তম কর্মের অধিষ্ঠাতা, আপনি আমাদেরকে বল ও পরাক্রম প্রাপ্ত করান। আমার মধ্যে অন্নাদি এবং শরীরের পুষ্টিকে ধারণ করান। এই সুন্দর আহুতি মহাপরাক্রমী এবং বলের আশ্রয়দাতা পরমাত্মার জন্য আমার জন্য নয়।

ওঽম্ ভূর্ভুবঃ স্বঃ।

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব।

যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা।।

ইদং প্রজাপতয়ে- ইদং ন মম।।৪।।

[ঋগ্বেদ ১০।১২১।১০]

হে প্রজাপালক পরমেশ্বর। সকল উৎপন্ন জড় চেতনাদিকে আপনি অধিকার পূর্বক রচনা করেছেন, আপনি ব্যতীত সৃষ্টি আদিকে নির্মাণ করার সামর্থ্য অন্য কারও নাই। যে যে পদার্থের কামনাযুক্ত হয়ে আমরা আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি সেই সেই আমাদের কামনা সিদ্ধ হোক, যাতে আমরা ধনৈশ্বর্য্যের স্বামী হতে পারি। এই আহুতি ধনৈশ্বর্য্যের ভান্ডার ঈশ্বরের জন্য আমার জন্য নয়।

■ এভাবে আজ্যাহুতি দেওয়ার পর অষ্টাজ্যাহুতি দিতে হয়। যা নিম্নে প্রদত্ত মন্ত্রগুলি দ্বারা ঘৃত ও হবন সামগ্রীর আহুতি দিতে হবে।

ওঽম্ ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্ দেবস্য হেডোऽয়াসিসীষ্ঠাঃ।

য়জিষ্ঠো বহ্নিতমঃ শোশুচানো বিশ্বা দ্বেষাংসি প্রমুমুগ্ধ্যস্মৎ স্বাহা।

ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্ ইদং ন মম।। ১।।

[ঋগ্বেদ ৪।১।৪]

-হে প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মন্! আপনি আমাদের সব দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা। আপনি যজ্ঞকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত তেজস্বী প্রকাশময়। শ্রেষ্ঠ, গ্রহণ করবার যোগ্য বিদ্বানের অনাদর থেকে আমাদেরকে পৃথক রাখুন এবং সর্ব প্রকারের দ্বেষভাবকে আমাদের থেকে দূরে রাখুন। এই আহুতি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার জন্য, আমার জন্য নয়।

ওঽম্ স ত্বন্নো অগ্নেऽবমো ভবোতী নেদিষ্ঠো অস্যা উষসো ব্যুষ্টৌ।

অব য়ক্ষ্ব নো বরুণং ররাণো বীহি মৃড়ীকং সুহবো ন এধি স্বাহা।।

ইদমগ্নিবরুণাভ্যাম্- ইদং ন মম।। ২।।

[ঋগ্বেদ ৪।১।৫]

-হে দিব্যগুণের ভান্ডার প্রভো! আপনি সমীপ হয়ে আমাদের রক্ষা করেন, এই প্রভাতবেলায়, যজ্ঞাদি শুভ কর্মে আমাদের অত্যন্ত সমীপ হোন। আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্দিগের সৎসঙ্গ প্রাপ্ত করান এবং তাঁরা আমাদের জন্য সুখকারী জ্ঞানকে প্রকাশিত করে আমাদেরকে উত্তম প্রকারে প্রাপ্ত হোন। এই আহুতি শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার জন্য, আমার জন্য নয়।

ওঽম্ ইমং মে বরুণ শ্রুধী হবমদ্যা চ মূড়য়।

ত্বামবস্যুরা চকে স্বাহা।।

ইদং বরুণায়- ইদং ন মম।। ৩।।

[ঋগ্বেদ ১।২৫।১৯]

-হে সর্বশ্রেষ্ঠ বরণীয় পরমেশ্বর। আজ নিজের রক্ষা ও বিজ্ঞান কামনা করে আমি আপনার উত্তম প্রকার স্তুতি করি। আপনি এই স্তুতিকে শ্রবণ করুন এবং আমাকে বিদ্যা দান দ্বারা সুখ প্রদান করুন। স্বীয় রক্ষার ইচ্ছুক আমি আপনাকে আহ্বান করে এই আহুতি প্রদান করছি।

ওঽম্ তত্ত্বা য়ামি ব্রহ্মণা বন্দমানস্তদশাস্তে য়জমানো হবির্ভিঃ।

অহেডমানো বরুণেহ বোধ্যুরুশংস মা ন আয়ুঃ প্রমোষীঃ স্বাহা।

ইদং বরুণায়- ইদং ন মম।। ৪।।

[ঋগ্বেদ ১।২৪।১১]

-হে বরুণ। শুভকর্ম অথবা সত্যবাণী বেদ দ্বারা বন্দনা করে আমি আপনাকে প্রাপ্ত করি। আমি আপনার নিকট সেই পূর্ণ আয়ুর যাচনা করি, যে আয়ুর যজ্ঞকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আশা করে। হে প্রশংসনীয় প্রভো! আপনি আমার প্রার্থনা শুনুন। আমার জীবন অসময়ে নষ্ট না হয়। আমি পূর্ণ আয়ু প্রাপ্ত করে শুভ কর্মের আচরণ দ্বারা উচ্চে অবস্থান করি, এই ভাবনা দ্বারা এই আহুতি আপনাকে সমর্পিত করা হচ্ছে।

ওঽম্ য়ে তে শতং বরুণ য়ে সহস্রং য়জ্ঞিয়াঃ পাশা বিততা মহান্তঃ।

তেভির্নো অদ্য সবিতোত বিষ্ণুর্বিশ্বে মুঞ্চন্তুমরুতঃ স্বর্কাঃ স্বাহা।।

ইদং বরুণায় সবিত্রে বিষ্ণবে বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো মরুদ্ভ্যঃ স্বর্কেভ্যঃ- ইদং ন মম।। ৫।।

[কাত্যায়ন শ্রৌত ২৫।১১]

-হে বরণীয় প্রভো! মহান্ যজ্ঞের সম্পর্কে যে বন্ধন বা বাধা ছড়িয়ে আছে, তাদেরকে সকল জগতের রচয়িতা সর্বব্যাপক আপনি তথা পূজনীয় বিদ্বানগণ আজ আমাদের কাছ থেকে দূর করুন। এই সুন্দর আহুতি বরুণ, সবিতা, বিষ্ণু নামক পরমাত্মা ও বহু প্রশংসাযুক্ত বিদ্বান্দিগের জন্য, আমার জন্য নয়।

ওঽম্ অয়াশ্চাগ্নেঽস্যনভিশস্তিপাশ্চ সত্যমিত্ত্বময়াসি।

অয়া নো য়জ্ঞং বহাস্যয়া নো ধেহি ভেষজং স্বাহা।।

ইদমগ্নে অয়সে- ইদং ন মম।। ৬।।

[কাত্যায়ন শ্রৌত ২৫।১১]

-হে প্রকাশ স্বরূপ পরমেশ্বর! আপনি সর্বত্র ব্যাপক। সর্বব্যাপক হয়েই আপনি সর্বত্র আমাদের রক্ষা করেন, আমাদের কল্যাণ করেন, আপনি নির্দোষকে পবিত্র করেন। হে সর্বব্যাপক প্রভো! আপনি আমাদের এই যজ্ঞকে সফল করুন এবং আমাদিগকে রোগ নিবারক শক্তি প্রদান করুন। এই সব যা কিছু আপনার, আপনাকে অর্পণ, এর মধ্যে আমার কিছু নাই।

ওঽম্ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বি মধ্যমং শ্রথায়।

অথা বয়মাদিত্য ব্রতে তবানাগসো অদিতয়ে স্যাম স্বাহা।।

ইদং বরুণায়াSSদিত্যায়াSদিতয়ে চ- ইদং ন মম।।৭।।

[ঋগ্বেদ ১।২৪।১৫]

-হে বরুণ! সুদৃঢ়পাশবন্ধনকে দূর করুন, আমাদেরকে কুরুচিকর মিথ্যা ভাষণাদি থেকে দূরে সরে দিন, মধ্যম প্রকারের রাগ দ্বেষাদিকে শিথিল করে দিন, যাতে লোকেরা আপনার সত্যাচরণরূপী ব্রতকে ধারণ করে পাপ কর্ম থেকে দূরে থেকে অখন্ড আনন্দযুক্ত মোক্ষকে প্রাপ্ত করতে পারে। সর্বশ্রেষ্ঠ, অবিনাশী, মোক্ষদাতা প্রভুকে এই আহুতি সমর্পিত করা হচ্ছে।

ওঽম্ ভবতন্নঃ সমনসৌ সচেতসাবরেপসৌ।

মা য়জ্ঞং হিং সিষ্টং মা য়জ্ঞপতিং জাতবেদসৌ শিবৌ ভবতমদ্য নঃ স্বাহা।।

ইদং জাতবেদোভ্যাম্- ইদং ন মম।।৮।।

[যজুবেদ ৫।৩]

-হে যজ্ঞরূপ প্রভো! আমাদের মধ্যে পাপরহিত, শ্রেষ্ঠজ্ঞানযুক্ত, উত্তম মনসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ হোক এবং তারা যজ্ঞের লোপ না করুক এবং যজ্ঞ পালককে যেন পীড়া না দেয়। বৈদিক বিদ্বান্ আজ আমাদের জন্য কল্যাণকারী হোক, এই আহুতি জ্ঞানের ভান্ডার পরমাত্মার নিমিত্ত, আমার জন্য নয়।

ওঁ সর্বং বৈ পূর্ণ স্বাহা।।

এই মন্ত্র দ্বারা শেষ ঘৃতকে স্রবায় ভরিয়া তথা অবশিষ্ট সাকল্য = সামগ্রি দ্বারা তিনবার পূর্ণাহুতি দিবে।

প্রভু কৃপায় যজ্ঞের সমস্তক্রিয়া নিশ্চয় পূর্বক পূর্ণ হয়েছে যা আমি সত্য বলেছি তথা স্বয়ংকে প্রভুর প্রতি সমর্পিত করছি।

সমস্ত ব্যক্তিগণ নিশ্চয়পূর্বক সেই অখন্ড একরস পরব্রহ্ম দ্বারা ওত-প্রোত হয়ে যাক। সেই সর্ববিধপূর্ণ ব্রহ্মের জন্য আমার সর্বস্ব সমর্পিত করা হয়েছে।

এজন্য আসুন আমরা যজ্ঞ করার সময় আজ্যা ও অষ্টাজ্যা মন্ত্রসমূহ সম্পর্কে জানি এবং সেই মন্ত্রটি নিজের জীবনে ধারণ করি।

সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

(ক) **"**মহর্ষি দয়ানন্দ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য হয়, এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। অন্য কোন প্রতিভাশালী পুরুষ অপেক্ষা এবং যা কিছু উপকার দেশ ও জাতির হয়েছে, সর্বপ্রথম স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীই আমাদের সামনে রাখলেন... যদি আমরা ঋষিদের সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি এবং এর জন্য আমরা গর্ববোধ করে থাকি তাহলে বলতে হবে যে, ঋষি দয়ানন্দ থেকে বেশী আমাদের উপকার এদিকে কোন অন্য মহাপুরুষ করেনি, যিনি স্বয়ং কিছু না নিয়ে আমাদের অপার জ্ঞান-রাশি বেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।**"**

"বিভিন্ন মত-পথের প্রচলন দেশের পতনের কারণ, স্বামীজির এ ধারণা নির্ভুল ছিল। তিনি মত-মন্বন্তরের উপর প্রমাণ সহিত অভিযোগ উঠালেন... তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, এই মতবাদের অজ্ঞান-পঙ্ক থেকে দেশকে বের করে বৈদিক শুদ্ধ শিক্ষা দ্বারা নিষ্কলঙ্ক করা।**"**

"আর্যাবর্তের অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের বেশি সংখ্যক শ্রেয় আর্য সমাজকে দেওয়া যেতে পারে।**"**

-পঃ সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা'

(খ) ১৮৮৩ সালে স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যু হয় এবং ১৮৮৪ সালে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের। স্বামী দয়ানন্দ ২০ বছর কাজ করেছেন এবং ভারতেন্দু ২১ বছর। এই দুজন মহানুভব এমন সাংস্কতিক প্রভাব ছেড়ে গেছেন যা দিন দিন শীঘ্র গতিতে বেড়েই চলেছে এবং যারা সম্পূর্ণ উত্তর ভারতে জাগরণের এক নতুন তরঙ্গ উৎপন্ন করে দিলেন। স্বামী দয়ানন্দের প্রবচনে অধিক আকর্ষণ এই ছিল যে, তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। অন্ধ সংস্কারের বিরোধী এবং প্রগতির সমর্থক ছিলেন। একদিকে তিনি প্রাচীনতম বৈদিক সংস্কৃতিকে দৃঢ়তা পূর্বক ধরে ছিলেন। অন্যদিকে

তিনি নতুন নতুন সংস্থারকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং জনসাধারণকে তাঁর উপর অগ্রসর হওয়ার জন্য বলতেন। তিনি পাশ্চাত্য ক্রমোৎকর্ষের সমর্থক ছিলেন কিন্তু বাস্তবে বৈদিক সাংস্কৃতিময় ছিলেন।

-আচার্য চতুরসেন শাস্ত্রী

(গ) **"**সংঘর্ষরত হিন্দুত্বের যেমন নির্ভীক নেতা স্বামী দয়ানন্দ হয়েছেন সেই রকম আর কেউ হয়নি। দয়ানন্দের সমকালীন অন্যান্য সংস্কারকরা কেবল সংস্কারক ছিলেন কিন্তু দয়ানন্দ বিপ্লব গতিতে এগিয়ে চললেন। তিনি হিন্দু ধর্মের রীতিকালের ঠিক রক্ষক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বমানবতারও নেতা ছিলেন।**"**

"রীতিকালের ঠিক পরবর্তী কালে হিন্দী ভাষা-ভাষীর ক্ষেত্রে যে সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক ঘটনা ঘটল, তা স্বামী দয়ান্দের পবিত্রতাবাদী বিচার ছিল। এই যুগের কবিদের শৃঙ্গার রসের কবিতা লেখার সময় এই রকম মনে হত যেন স্বামী দয়ানন্দ পাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছেন।**"**

-ডঃ রামধারী সিংহ 'দিনকর'

(ঘ) **"**স্বামী দয়ানন্দ যুগ দ্রষ্টা, যুগ নির্মাতা ছিলেন। আমার সংস্কারের উপর ঋষি দয়ানন্দের যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। স্ত্রীদেরকে বেদাধিকার প্রদান করে তিনি মহিলাদের মধ্যে নবীন বিপ্লবের বীজ রোপন করেন। নারীর বেদনা দেখে তিনি বলতেন ভাই, এর চেয়ে বেশি হৃদয় বিদারক দুঃখ কী হতে পারে? বিধবাদের দুঃখপূর্ণ আর্তনাদে এই দেশের সর্বনাশ হচ্ছে। দয়ানন্দ বেদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে, বৈদিক অধ্যয়ন প্রণালীতে একটা নতুন যুগের সূত্রপাত করলেন। এই সব কাজের জন্য আমরা তাঁর কাছে ঋণী।**"**

-মহাদেবী বর্মা

(ঙ) **"**স্বামী দয়ানন্দের বাক্য আমি বেদবাক্যবৎ মান্য করি, এবং তাঁর কথা আমার পক্ষে উদাহরণস্বরূপ।"

হিন্দুদের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ ভগবানের বিভূতি।

"লোকেরা স্বামী দয়ানন্দকে মূর্তিপূজা না মানার কারণে মন্দ বলে কিন্তু কাশীর পণ্ডিতদের উপর সহস্র ঔরংজেব আক্রমণ করুক। দন্ডী বিরজানন্দ সত্য বলেছিলেন কথং কাশী বিদুষ্মতী?**"**

-বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আচার্য পঃ রাধাচরণ গোস্বামী

(চ) **"**...স্বামী দয়ানন্দ যুগ নির্মাতার মতো দেশের সুপ্ত মস্তিস্ককে প্রবুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন... সত্যার্থ প্রকাশ এই দিক দিয়ে তাঁর মহত্ত্ব বজায় রাখে। সামাজিক জীবনকে প্রেরণা দান করা এবং অতীত সাংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত... আর্যসমাজের কাজ প্রশংসনীয় রয়েছে। তাতে প্রতিক্রিয়া ভাবনার বদলে নবনির্মাণের বাস্তবিক চাহিদা মুখ্য রেয়েছে।**"**

-জয়শংকর প্রসাদ

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ঈশ্বর কি নিজের ভক্তদের পাপ ক্ষমা করেন?

উত্তর: না, কারণ পাপ ক্ষমা করলে তাঁর ন্যায় নষ্ট হয়ে যাবে। ন্যায় নষ্ট হলে মনুষ্যরা মহাপাপী হয়ে যাবে। কেননা, ক্ষমার কথা শুনে তারা পাপকর্মে নির্ভীক হয়ে উঠবে। রাজা অপরাধীদের ক্ষমা করলে তারা উৎসাহের সঙ্গে আরও গুরুতর পাপ করতে থাকবে। কারণ, রাজা তাদের অপরাধ ক্ষমা করলে তাদের এই ভরসা যে, রাজার সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ালে রাজা তাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। ফলে যারা অপরাধ করে না, তারাও নির্ভয়ে পাপকর্মে প্রবৃত্ত হবে। সুতরাং সব কর্মের যথোচিত ফল প্রদান করাই ঈশ্বরের কার্য ক্ষমা করা নয়।
(সত্যার্থ প্রকাশ সপ্তম সমুল্লাস থেকে)
© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সত্যার্থ প্রকাশের আলোচনা কি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ?

একটা অভিযোগ করা হয় যে, সমালোচনা তো প্রত্যেকে করে কিন্তু মহর্ষি দয়ানন্দ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আলোচনা করেছেন। যেটা ঠিক নয়। অল্প কিছু আলোচনা ঠিক ছিলো কিন্তু এতো কটু আলোচনা করার কোনো দরকার ছিলো না। এমন লোকদের কাছে নিবেদন যে, কাপড়ে লাগা সাধারণ ময়লা তো সাবানাদি দিয়ে ছাড়ানো যেতে পারে কিন্তু যদি তার উপর বছরের পর বছরের ময়লা জমা হয় তবে তাকে আগুনের আচেও উঠাতে হয় এবং কাঁচতে বা ধোপার মোটা লাঠি দিয়ে পিটাতেও হয়, নতুবা ময়লা দূর হবে না। মেঝের উপর পড়া সামান্য আবর্জনা ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা যেতে পারে কিন্তু যদি মেঝের উপর শতাব্দীর ময়লা জমা হয়ে থাকে তাকে ঝাঁটা দিয়ে সরানো সম্ভব নয়। তাকে সরাতে গেলে খুরপা, কোদাল বা তারের বুরুশ কাজে লাগাতে হয়। এই প্রকার সংস্কৃতির উপর পড়া অনেক শতাব্দীর ময়লা দূরীভূত করার জন্য মহর্ষি দয়ানন্দকে খন্ডন রূপী তীক্ষ্ণ খড়্গ উঠাতে হলো। তাছাড়া কাজ চলতেই পারে না। হালকা ওষুধে দীর্ঘকালীন রোগ দূর হয় না।
বিজ্ঞজনেরা স্বীকার করেন যে, জাতিতে আজ যে জীবন পাওয়া গিয়াছে তা তাঁর তীক্ষ্ণ আলোচনার ফল। স্ত্রী শিক্ষা, শুদ্ধি প্রচার, অস্পৃশ্যতা নাশ, বাল্য বিবাহ, অমিল বিবাহ, জন্ম থেকে জাতি প্রথা, বিধবা বিবাহ, স্বাধীনতা প্রাপ্তি, ভোজন সম্বন্ধীয় গোলযোগ, সমুদ্র পার করাকে ভ্রষ্ট মনে করা, সবার সহিত সমভাব ইত্যাদি তাদের তীক্ষ্ণ আলোচনারই মিষ্টি ফল। তিনি যদি ঠোকর মেরে না জাগাতেন তাহলে জাতি শুয়ে থাকত এবং পরিণাম হতো তার মৃত্যু। তাঁর তীক্ষ্ণ খন্ডন জাতিকে এমন ভাবে বাঁচিয়েছে যেমন এক যুবকের তীক্ষ্ণ শব্দ পঞ্চায়েতের প্রধানকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।
দেখুন-
এক গ্রামের পঞ্চায়েতের প্রধানকে সাপে কেটেছে। প্রধান অত্যন্ত সজ্জন, ন্যায়প্রিয়, দয়ালু তথা সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ন্যায়ে দুধের দুধও জলের জল হতো। তাঁর পক্ষে ছোটো-বড়ো সব সমান ছিলো। ন্যায় তো ন্যায়ই, সে ছোটো-বড়োকে সমান নজরে দেখে। তাঁর সামনে অপরাধী কেবল অপরাধী তথা নিরপরাধ কেবল নিরপরাধী,

তাই সে যেই হোক না কেন। কয়েক বার বড়ো লোকেরা তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে যেতো, কেননা তারা যদি অপরাধ করত, তাহলে শাস্তি থেকে রেহাই পেতো না। বড়ো লোকেরা নিজেকে অন্যদের থেকে বিশিষ্ট মনে করে এবং তাদের ইচ্ছা যে, তাদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবহার করা হোক। কিন্তু পঞ্চায়েতের প্রধান শাস্ত্রে দেখেছিলেন যে, ন্যায়াসনের উপর বসে যে ন্যায় করে না, অন্যায়ের ফল তাকে পেতেই হয়। সুতরাং ন্যায়াধীশকে নিজের তথা ন্যায়ের রক্ষা করার জন্য ন্যায়ই করা উচিত, তাই কেউ খুশি হোক বা অখুশি। ন্যায়ের আসন পরমাত্মার আসন হয়ে থাকে। প্রধান শাস্ত্রের কথা মনে গেঁথে রেখেছিলেন এবং সেই মতো সর্বদা আচরণ করতেন। এইজন্য তাঁর সর্পদংশনে সবারই, বিশেষ করে দুর্বল বর্গের চিন্তা ছিল যে, যদি তিনি না থাকেন কে তাদেরকে ন্যায় দেবে? তিনি না থাকলে আমরা সবাই অনাথ হয়ে যাব।

অবিলম্বে সর্পবিষ-চিকিৎসককে ডাকানো হলো। তিনি মনোযোগপূর্বক তাঁর চিকিৎসা করলেন। কিন্তু এই বলে দিলেন যে, যদি রাতভর এনাকে ঘুমাতে না দেওয়া হয়, তবে ইনি বেঁচে যেতে পারেন। অন্যথা কী হবে, বলা যায় না। গ্রামবাসীরা নাচ-গান, ঢোল-করতাল বাজিয়ে তাঁকে জাগিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকলেন। রাত দশটা পর্যন্ত তারা তাঁকে জাগিয়ে রাখতে সফল হলেন, কিন্তু এর পর ঝিমুনি আসতে লাগল। ঘুম যখন বেশি পেতে লাগল তখন তিনি সবাইকে বললেন আমাকে আর বিরক্ত করো না। যা হবার তা হবে। এখন আমাকে আরামে ঘুমাতে দাও। ঘুমানোর কী পরিণাম কারও অজানা ছিল না পঞ্চায়েতের প্রধানের মৃত্যু। তাঁকে সদা-সর্বদার জন্য হারানো। সবাই একে অন্যের মুখ দেখতে থাকলো। কিছু ভাবপ্রবণ ব্যক্তিরা আগামী বিপদের কথা ভেবে কাঁদতে শুরু করল। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। কী করা যায়, এ কারও মাথায় আসছিল না। সবাই চিন্তিত ও হতাশ। এর মধ্যে জনৈক যুবক এগিয়ে এসে বলল- আপনারা যদি আমার অপরাধ ক্ষমা করেন তাহলে এঁকে আমি সারা রাত জাগিয়ে রাখতে পারি। লোকেরা বলল যে, আপনি এঁকে সারা রাত জাগিয়ে রাখুন, ক্ষমার দায়িত্ব আমাদের উপর থাকল। সেই যুবক প্রধানের আত্মভিমানকে জানত। বাল্যকাল থেকে সে দেখে আসছে সবাই তাঁর সামনে নত মস্তক হয়, আজ পর্যন্ত কারও এতটা সাহস হয়নি যে, তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলে। সেই যুবক ঝিমানো চোখের প্রধানকে বলল- "এ প্রধান!" প্রথমে তো যুবকটির এই ভাবে সম্বোধন করা তাঁর মনে খুব বাজল। তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে তাঁকে দেখে বললেন "শিষ্টতা বজায় রেখে কথা বল।" কেননা যে ভাবে যুবক বলেছিল, প্রধান তা শুনতে আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না। লোকেরা তাঁকে বিনম্র ভাবে সম্বোধন করত। এখানে এই যুবক গোয়ার্তুমি ঢঙে কথা বলছিলো। কিন্তু এখানেই থামেনি সে। যুবক উত্তর দিল "অনেক দিন ধরে আপনি শিষ্টতা শিখিয়েছেন। এখন আগে যাওয়ার জন্য তৈরী হন। সমস্ত জীবন লোকেরা চেপে রয়েছে এখন কেউ আর চেপে থাকবে না। আমরাও মানুষ। এখানে কারও অপেক্ষা কেউ কম নয়। আমরাও সমান পর্যায়ের। আপনার যা করার, করে নিন।" যুবক এই বলে তো চলে গেল, কিন্তু পঞ্চায়েতের প্রধানের রক্ত গরম হয়ে উঠল - "এর এতখানি সাহস হয় কী করে? ধরতো একে, হাড়গোড় ভেঙে দাও এর। ছোকরার এত ধৃষ্টতা। এখনও তো আমি বেঁচে আছি। কাল যদি এর চামড়ায় ভুসি না বানিয়েছি, তখন বুঝতে পারবে। ভেবেছে, আমি মরে গিয়েছি? সেজন্য এতো আবোল-তাবোল বকছে? আজ পর্যন্ত কত নম্র হয়ে থাকত। মনে হতো যেন নম্রতার প্রতিমূর্তি। আসল রহস্য ফাঁস হলো। এই হলো দুনিয়া। জীবিতের সম্মুখে নত হয় আর মরার সময় নিন্দা করে।

আমি এর পরিবারের এতো উপকার করেছি যে, সাত জন্ম ধরে এ শোধ করতে পারবে না। তার কথায় এতো দুঃখ হলো যে, ক্রোধবশত সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না এবং বেঁচে গেলেন।

প্রাতঃকালে যখন ডাক্তার একে দেখে প্রসন্নতা ব্যক্ত করলেন এবং গ্রামবাসীদেরকে বললেন যে, এখন আপনাদের প্রধান বিপদ মুক্ত হয়ে গিয়েছেন তখন গ্রামবাসীদের চোখে আনন্দের অশ্রু দেখা গেল। তারা ডাক্তারকে বলল যে, ইনি ঘুমাতে চাইছেন, আমরা বহু চেষ্টা করেও যখন এর ঝিমুনি রোধ করতে পারলাম না তখন একজন বুদ্ধিমান যুবক একে বাঁচানোর জন্য নির্মম শব্দ বলে দিল যার ফলে এর ক্রোধ এসে গেল এবং সমস্ত রাত ক্রোধবশত ঘুমাতে পারেননি।

ডাক্তার প্রধানকে বললেন- 'সর্পবিষের নেশায় আপনি নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। যদি আপনি ঘুমিয়ে পড়তেন, তাহলে আমরা আপনাকে বাঁচাতে পারতাম না। সেই যুবক যে আপনার সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করেছিল, সেটা সে অসভ্যতাবশত করেনি বরং আপনাকে বাঁচানোর জন্য করেছিল। আজ আপনার জীবন সেই যুবকের নির্মম ব্যবহারের পরিণাম। যদি সে নির্মম শব্দ প্রয়োগ না করতো আপনি মারা যেতেন। তার প্রতি আপনার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

প্রধান এতক্ষণে সব বুঝতে পারলেন। তিনি সেই যুবককে ডাকলেন। সে তাঁর পা ধরতে গেল, তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং পুরস্কিত করলেন।

মহর্ষি দয়ানন্দের কঠোর আলোচনায় জাতি (মানব জাতি) ঘুমাতে পারিনি এবং মরা থেকে বেঁচে গেলো। কিন্তু না জানি তাঁকে পুরস্কিত কবে করবে? সময় আসবে যখন তাকে জাগানো এবং মরা থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে হৃদয় দিয়ে অভিনন্দন করবে এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে তাঁকে পুরস্কিত করবে। কৃতঘ্নতা অবশ্যই পাপ। জাতি নিজের মাথায় এই পাপ কেন বহন করবে? সে সংসারের এই অদ্ভুত বৈপ্লবিক গ্রন্থ 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এর মহান রচয়িতা মহর্ষি দয়ানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে নিয়ে তাঁর কালজয়ী অমর কৃতি 'সত্যার্থ প্রকাশ' তথা অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করে, পাঠ করিয়ে তাঁর মধ্যে অন্তনিহিত মন্তব্যগুলি গ্রহণ করে তাঁর থেকে লাভান্বিত হবে এবং নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তার জয়ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করবে।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সত্যার্থ প্রকাশ এক দর্পণ স্বরূপ

সত্যার্থ প্রকাশ দর্পণের মতো যার যেমন মুখ তাকে সেইরকমই দেখিয়ে দেয়। কোনো বৃদ্ধ যদি তার জীর্ণ-শীর্ণ মুখ দেখে দর্পণকে দোষ দিতে শুরু করে তো এতে দর্পণের কী দোষ? এইরূপ যদি ব্যক্তি সত্যার্থ প্রকাশের আলোচনায় ক্ষুব্ধ হয় তাহলে তাকে ভেবে দেখা উচিত যে, যদি সত্যার্থ প্রকাশে সত্য ও অসত্যকে স্পষ্ট করে দেখানো হয় তা এর দোষী অসত্য, সত্যার্থ প্রকাশ বা তার মহান প্রণেতা মহর্ষি দয়ানন্দ নয়। মহর্ষি দয়ানন্দ তখন দোষী বলে সাব্যস্ত হতেন যখন তিনি সত্যকে অসত্যরূপে প্রকাশ করতেন। যদি তিনি অসত্যকে অসত্য বলে দিলেন তাহলে এটা ওনার দোষ নয়, বরং তার মহত্ত্ব বুঝতে হবে। মনে রাখবেন, সত্য কে সত্য বলা অনেক লোকের অভ্যাস থাকতে পারে কিন্তু অসত্যকে অসত্য বলার লোক খুব কমই পাওয়া যায়। অসত্যকে অসত্য যারা

বলে তাদের গালি, পাথর, বিষ ও গুলি পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত হয়। দর্পণের দোষ যারা দেখেন তারা তাদের রূপের সংস্কার করুন যাতে দর্পণে নিজের রূপ ভাল দেখা যায়। কেননা যেমন কে তেমন দেখানোই দর্পণের কাজ, এর মধ্যে তার কী দোষ?

অনেক দিন আগেকার কথা। গ্রামের এক যুবক কোনো কারণে শহরে আসে। সেই সময় গ্রামের লোকের শহরে আসা এইরকম ছিল যেমন আজকাল বিদেশ যাওয়া। মোকদ্দমায় বা বিয়ের জিনিসপত্র নিতেই লোক শহরে যেতো এবং ফিরে গিয়ে লোকদেরকে শোনা-নাশোনা অনেক গল্প বলত। মনে হতো যেনো সে চক্রব্যুহ ভেদ করে এসেছে। সেই যুবক শহরের এক দোকানে লোকদেরকে কোনো একটা জিনিস হাতে নিয়ে চুল ঠিক করতে, বা তা দেখে বিবিধ ভঙ্গিমা করতে ও কিনতে দেখল। প্রথমে তো সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। তারপর সে সাহস সঞ্চয় করে দোকানদারের কাছে জিজ্ঞাসা করে "এরা সব কী দেখছে?"

দোকানদার আয়না তার সামনে রেখে বলল যে, তুমিও দেখে নাও। সে তার মধ্যে একজন সবল- সুস্থ যুবক দেখল। সে একটু মুচকি হাসল, আয়নার মধ্যে সেও মুচকি হাসে। সে দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করে "এর মধ্যে কে আছে?" দোকানদার তাকে বলে যে, এতে নিজের মুখ দেখা যায়, এই শুনে যুবক খুব প্রসন্ন হল এবং মনে মনে ভাবল আমি এত সুন্দর দেখতে। আমার বউও আমাকে বলে যে, তুমি দেখতে খুব সুন্দর কিন্তু আমি ভাবি যে, আমাকে তেল দেবার জন্য এ সব বলছে। সে দোকানদারকে বলল- "এখন তো শহর আসলেই আপনার এখানে এসে এটা দেখবো।" দোকানদার "আপনি এটা কিনে নেন, চার পয়সাই তো এর দাম।"

যুবক ভাবল যে, ঘোড়ার গাড়িকে চার পয়সা না দিয়ে পায়ে হেঁটেই চলে যাবো। চার ক্রোশ তো সবে। সে ঐ আয়নাটা কিনে নিল। দোকানদার তাকে সতর্ক করে দিল যে, এটা খুব কোমল জিনিস, পড়ে গেলেই ভেঙে যাবে। তখন আর জোড়া লাগানো যাবে না। একে সামলে রাখবে। যুবক সেটি ঘরে নিয়ে আসে এবং ভাবে যে, যদি কাউকে বলি তাহলে সে অন্যকে বলে দেবে। তখন সবাই দেখতে চাইবে এবং যদি কারও হাত থেকে ফসকে পড়ে যায় তাহলে ভেঙে যাবে। সেটিকে সে নিজের ট্রাংকে কাপড়ের নীচে লুকিয়ে রেখে দেয়। সে সকালে ট্রাংক খোলে, সেটিতে নিজের মুখ দেখে খুশী হয়। এক দিন তার স্ত্রী দেখে ফেলে এবং জিজ্ঞাসা করে যে, কী দেখে তুমি এত খুশী হচ্ছো? যুবক ঘাবড়ে গিয়ে আয়না ট্রাংকের ভিতর রেখে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তালা বন্দ করে দেয়। তার স্ত্রীর সন্দেহ হয় যে, কিছু একটা ব্যাপার আছে নিশ্চয়ই নচেৎ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তালা কেন বন্দ করে দিল? বলে যে, ও কিছু না। যখন কিছু না তখন দেখালো না কেন? যে দিন থেকে শহর থেকে এসেছে কেমন যেন বদলে গিয়েছে সে তখন চাবি চুরি করার ফন্দি আঁটতে থাকে। একদিন সে সফল হয়। যখন তার স্বামী স্নান করতে যায় সে তখন চাবিটি চুরি করে। তার চলে যাওয়ার পর শাশুড়ি থেকে লুকিয়ে ধীরে ধীরে তালা খুলে খুঁজতে থাকে। কাপড়ের নীচে আয়নাটি পেয়ে যায়। সেটিকে দেখে তার মধ্যে নিজের রূপ দেখতে পায়, একজন সুন্দরী যুবতী। সে ভাবে একে মনে হয় শহর থেকে এনেছে। সেই জন্য চাবি কাউকে দেয় না এবং এটাকে লুকিয়ে রেখে খুশী হয়। সে কান্না শুরু করে দেয়। হায়, আমার ভাঙা কপাল। এখন ওর আমার কী প্রয়োজন? এখন তো ঘরে এই ডাইনী এসে গেছে। কেমন নির্লজ্জ। আমাকে দেখেও ভয় পাচ্ছে না, লজ্জিতও হচ্ছে না। ভয় কেন পাবে যখন ঘরের মালিকই তার হয়ে গিয়েছে? চিৎকার করে কাঁদতে থাকে হায়, আমার সব গেল, আমার ঘর শেষ হয়ে গেল।

চিৎকার শুনে শাশুড়ি দৌড়ে আসে যে, হঠাৎ বউমার কী হল? সে এসে জিজ্ঞাসা করে যে, কী হয়েছে যে, তুমি কাঁদছ আর আবোল-তাবোল বকছ? সে আয়নাটা তার সামনে রেখে দিয়ে বলে যে, দেখ, তোমার ছেলের কান্ড। শহরে গিয়েছিল এবং নিয়ে আসলো আমার বুকের উপর রাখতে পাথর, আমি যদি এতই খারাপ তবে আমায় বিয়ে করে এনেছিল কেন? নিয়ে আসতো এই শয়তানীকে।

শাশুড়ি আয়না নিয়ে দেখে। তাতে নিজের বুড়ো রূপ দেখা যায়। দেখেই বলতে থাকে কাকে ভরাডুবি করেছে? আনতে হলে কোন যুবতীকে আনতো। নিয়ে আসলো ষাট বছরের বুড়ি। না কোন কাজের, যত সব। বউমা বলে আপনি ছেলের পক্ষ নিচ্ছেন? তাকে বুড়ি বলছেন। আপনার আশকারা পেয়ে শহর থেকে নিয়ে এসেছে এবং এখন বলছেন বুড়ি, ষাট বছরের। ষাটের হোক বা কুড়ির হোক। কেমন টমাটরের মতন গাল লাল-লাল। সমস্ত চুল কালো। এ সব ষাট বছরের হয়, না কুড়ি বছরের? শাশুড়ি বলে "বৌ, আমি এই চুল রোদে সাদা করিনি। আমি কি অন্ধ যে, দেখতে পাই না। সমস্ত মাথার চুল সাদা এবং মুখে বলিরেখায় ভর্তি। এরকম কি কোন যুবতী হয়?" এখন শাশুড়ি তাকে বুড়ি বলে আর বউ তাকে বলে যুবতী। দুইজনের উঁচু কলরব শুনে বুড়ো এসে জিজ্ঞাসা করে-এই ঘরে কান্নাকাটি আর বুড়ি-যুবতীর ঝগড়া শুরু হয়েছে। কী হয়েছে? বউ জোরে জোরে কাঁদা শুরু করে আর বলে কী হয়েছে আবার, আমার কপাল ভেঙেছে। ও তোমার বুকে নয় আমার বুকের উপর এনে রেখেছে। খাওয়াও আর এক নিষ্পাপ মাকে। সারা জীবন না জানি কোথায় কেটেছে, এখন বুড়ো বয়সে এই ঘরের পাল্লা ধরেছে। বুড়ো বলে "আরে কোন কাজের কথা বলবে, না বুড়ি যুবতীর, আমি তিন বার দেখেছি।" বুড়ো- কোথায় সে? ঘরে তো দেখা যায় না। হেয়ালী শোনাতে থাকবে? বুড়ি বলে- "আর কী হবে? এক বুড়িকে নিয়ে এসেছে তোমার ছেলে?" বউ বলে- "বুড়ি নয় যুবতী, বুড়ি দর্পণ কে বুড়োর সামনে রেখে দেয়।" তার মধ্যে সে একজন বুড়ো লোককে দেখে খুব হাসতে থাকে ও বলে- "তোমাদের দু জনেরই মাথার ঠিক নেই। স্ত্রী-পুরুষ চিনতে পারে না? তোমরা এটা তো একবার দেখতে যে, মেয়েদেরও কি মোঁছ হয় নাকি। আরে এ তো মোঁছওয়ালা বুড়ো একজন।"

পাঠকগণ! এখন আপনি বলুন যে তিন ব্যক্তিরা দর্পণে নিজের নিজের রূপ দেখলো, এতে দর্পণের কী দোষ? দর্পণ তো যেমন মুখ ছিল তেমনই দেখিয়ে দিয়েছে। এই রকম সত্যার্থ প্রকাশও যথার্থতা দেখায়।

প্রো০ শরর ঠিকই লিখেছেন -

আইনা চেহরে কা হর দাগ দিখা দেতা হ্যায়, উসকী ফিতরত কা তকাজা হ্যায় তো শিকওয়া ক্যায়সা?

আপ সত্যার্থ কী তনকীদ সে নারাজ ন হো. জনাব, চেহারা ধো ডালিয়ে গুস্সা ক্যায়সা?

[আয়না মুখের প্রতিটি দাগ দেখিয়ে দেয়, এতো তার স্বভাব, তাহলে অভিযোগ কীসের? আপনি সত্যার্থের সমালোচনায় বিরক্ত হবেন না, মশাই, মুখটা ধুয়ে ফেলুন, রাগ কীসের?]

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

অগ্নিহোত্রে স্বিষ্টকৃতের মন্ত্র ও তার অর্থ কী ?

আমরা বৃহৎ বৈদিক যজ্ঞ করার সময় স্বিষ্টকৃতের আহুতি দিয়ে থাকি। সু + ইষ্ট + কৃৎ অর্থাৎ উত্তম ইচ্ছার পরিপূর্ণতার জন্য এই আহুতি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে দেওয়া হয় । এই ক্ষেত্রে আমরা যে মন্ত্রটি পড়ি তা হলো -

ওঽম্ য়দস্য কর্মণোঽত্যরীরিচং য়দ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্বিদ্যাৎ সর্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্বান্নঃ কামানৎ সমর্দ্ধয় স্বাহা।। ইদমগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে-ইদং ন মম।

[আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।১০।২২]

বৈদিক যজ্ঞ আমাদের অর্থ জেনে করা উচিত । তাই আসুন উক্ত মন্ত্রের অর্থ এবার আমরা জেনে নেই -

" যা কিছু এই যজ্ঞকর্মে আমি বিধি অপেক্ষা অধিক করেছি অথবা যা কিছু বিধি থেকে ন্যূন করেছি, শুভ ইচ্ছার পূর্ণ সম্পাদনকারী পরমাত্মদেব আমার সকল শুভ ইচ্ছাকে জানেন। তিনি আমার শুভ ইচ্ছাকে পূর্ণ করবেন। শুভ ইচ্ছার পূর্ণ সম্পাদনকারী যজ্ঞকে সফল করতে, সব প্রায়শ্চিত্তরূপ প্রদত্ত আহুতিগুলি ও কামনাগুলি পূর্ণ সম্পাদনকারী পরমেশ্বরের জন্য এই আহুতি। সেই পরমাত্মা আমাদের সব কামনাকে পূর্ণ করুন এবং শ্রদ্ধাপূর্বক আমার যজ্ঞকর্ম আপনার কৃপায় সর্বদা সফল হোক। এই আহুতি কামনা পূর্ণকারী জগদীশ্বরের জন্য সাদর সমর্পিত, এতে আমার কিছু নাই। "

এজন্য আসুন আমরা যজ্ঞ করার সময় স্বিষ্টকৃতের মন্ত্রটির সম্পর্কে জানি, সেই মন্ত্রটি নিজের জীবনে ধারণ করি।

ওঽম্ তৎ সৎ

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মহর্ষির্দয়ানন্দঃ

নিখিলনিগমবেত্তা, পাপতাপাপনেতা,
রিপুনিচয়বিজেতা, সর্বপাখণ্ডভেত্তা।
অতিমহিততপস্বী, সত্যবাদী মনস্বী,
জয়তি স সমদর্শী, বন্দনীয়ো মহর্ষিঃ॥

ভাবার্থানুবাদ: সম্পূর্ণ বেদ জ্ঞানী, পাপ-তাপ দূরকারী, রিপুবিজেতা, পাখণ্ড খণ্ডনকারী, অতি পূজনীয় তপস্বী, সত্যবাদী, মনস্বী, সমদর্শী বন্দনীয় মহর্ষি দয়ানন্দের জয় হোক।

বিমলচরিতযুক্তঃ, পাপমুক্তঃ, প্রশস্তঃ,
সকলসুকৃতকর্তা, কর্মরাশাবসক্তঃ।
দলিতজনসুধারে, সর্বদা দত্তচিত্তঃ,
জয়তি স কমনীয়ো বন্দনীয়ো মহর্ষিঃ॥

ভাবার্থানুবাদ: শুদ্ধ চরিত্রযুক্ত, নিষ্পাপ, প্রশংসনীয়, পরোপকারী, কর্মে অনাসক্ত, দলিতোদ্ধারে মগ্নচিত্ত বন্দনীয় মহর্ষি দয়ানন্দের জয় হোক।

প্রথিতধবলকীর্তিঃ, শুদ্ধধর্মস্য মূর্তিঃ,

প্রসৃতনিগমরীতিঃ, শত্রুবর্গেঽপ্যভীতিঃ।

অনুসৃতশুভনীতিঃ, বেদশাস্ত্রেষ্বধীতী,

বিবুধগণবরেণ্যো বন্দনীয়ো মহর্ষিঃ॥

ভাবার্থানুবাদ: সর্বত্র প্রসিদ্ধ, কীর্তিমান, শুদ্ধ ধর্ম মূর্তি, বেদ-মর্যাদা-প্রসারক, শত্রুদের প্রতি নির্ভীক, শুভ নীতি পথচারী, বেদশাস্ত্র প্রকাণ্ড পণ্ডিত, বিদ্বানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহর্ষি দয়ানন্দ বন্দনীয় আমাদের বন্দনীয়।

অধিকতম উদারো ধর্মসম্বোধকেষু,

শ্রুতিবিহিতবিচারো লোকসরক্ষকেষু।

বিদিতনিগমসারো ব্রহ্মচর্যাগ্রগণ্যো,

জয়তি স কমনীয়ো বন্দনীয়ো মহর্ষিঃ॥

ভাবার্থানুবাদ: ধর্মের উপদেষ্টাদের মধ্যে সর্ব উদার, মানব রক্ষায় বৈদিক সিদ্ধান্তের প্রচারক, ব্রহ্মচারীদের মধ্যে অগ্রণী, বেদের সার তত্ত্ব যিনি জানেন সেই বন্দনীয় মহর্ষি দয়ানন্দের জয় হোক।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ওঙ্কারের পতাকার সম্মান রক্ষায় প্রাণ দিয়েছিলো যে দম্পতি...

যায় যদি যাক প্রাণ

ওঙ্কারের পতাকা হবে না ম্লান

হায়দ্রাবাদের উসামাবাদ, বর্তমান ধারাশিবে যখন রাজাকারদের তৎপরতা চরম পর্যায়ে ছিলো তখন রাজাকারদের কালেক্টর হায়দারী ২জন পাঠান ও ১জন মুসলমান কন্সটেবল নিয়ে ৬ই মে, ১৯৪৮ সালে শ্রী কিশনরাও টেকের ইটের বাড়িতে এসে বললো, 'তোমার বাড়িতে 'ওঙ্কার' পতাকা উড়ছে, এখনই এটা নামাও, নাহলে গুলি করে উড়িয়ে দেবো '।

শ্রী কিশনরাও এগিয়ে এসে বুক চিতিয়ে বললেন, 'দরকারে আমি মরে যাবো তবুও এই পতাকা নামাবো না '। মুখ থেকে শব্দ বের হতে না হতেই হায়দারী পকেট থেকে পিস্তল বের করে কিশনরাওয়ের বুকে গুলি করলো। কিশনরাও ঢলে পড়লেন মাটিতে।রক্তে ভেসে যেতে লাগলো তার বাড়ির উঠোন। হায়দারী পাশের ঘরে ঢুকলো আর কে আছে দেখতে। এদিকে গুলির শব্দ শোনামাত্র তার পত্নী গোদাবরী দেবী ঘরের দেয়ালে ঝুলন্ত বন্দুক হাতে নিয়ে বের হয়ে এলেন। মাটিতে নিজের স্বামীকে রক্তরঞ্জিত দেহে পড়ে থাকতে দেখে একাই ৩ কন্সটেবলকে

গুলি করে উড়িয়ে দিলেন। পাশের ঘরে ছিলো হায়দারী। সে ৩জন কনস্টেবলকে মারা যেতে দেখে গোদাবরী দেবীকে পেছন থেকে গুলি চালিয়ে হত্যা করে। এরপর সম্পূর্ণ বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেয়।
শ্রী কিশনরাও টেকে ও তার ধর্মপত্নী শ্রীমতি গোদাবরী বাঈ এভাবেই নিজের জীবন দিয়েও 'ওঙ্কার'-এর পতাকার অপমান হতে দেননি ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মুক্তিযুদ্ধে জগন্নাথ হলের উপর হামলা

হানাদারদের কবলে জগন্নাথ হল-১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ হল সার্ভেন্টস কোয়ার্টারপাশেই গোয়াল এর নিকটের ম্যানহোলে একটানা ১৯ ঘণ্টা আত্মগোপন করে থেকে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। নিজেকে রক্ষা করেছেন হানাদার বাহিনীর অতর্কিত হামলা থেকে। ম্যানহোল পুতিগন্ধময়। মাঝে মাঝে তার দম বন্ধ হয়ে যেত। মাথা ঝিম্ ঝিম্, পা রি রি করত। উপায় নেই বেরোবার। অবিরাম গোলাগুলির শব্দ। মানুষের আর্তনাদ, কান্নার শব্দ, সবই তার কানে ভেসে আসছিল।

একটু পর পর কিছু সময় অন্তর অন্তর ম্যানহোল থেকে কোনোরকমে গলাটুকু পর্যন্ত বের করে তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছেন। এক পলক দেখে নিতে চেষ্টা করেছেন ম্যানহোলের বাহিরের দুনিয়াটাকে, যখন তখন বীভৎস হত্যালীলা চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীপরিমল গুহ আমার কাছে ২৫ মার্চের ভয়াল ভয়ংকর রাত্রের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিলেন।

তিনি এই দুঃস্বপ্নের রাতের একজন সাক্ষী হয়েছিলেন। ম্যানহোলে কোনোরকমে ঢুকে পড়ে মৃত্যুপুরীর নিশ্চিত পরিণাম থেকে নিজেকে অনেকটা আলৌকিকভাবে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন- ২৫ মার্চ রাতে প্রায় ১১টার দিকে আমি প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী রথীন রায়ের লক্ষ্মীবাজারস্থ বাসা থেকে হলে ফিরি। তখনও হানাদার সামরিক বাহিনীর লোকেরা হামলা শুরু করেনি। রাস্তায় রাস্তায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যারিকেড তৈরি করছেন। গাড়িগুলো ক্ষিপ্র গতিতে চলাচল করছে। রথীনদার বাসা থেকে রাস্তায় পা বাড়াতেই লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনি কোথায় যাবেন? আমি জগন্নাথ হলে যাব শুনে সবাই আমাকে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, শহরের অবস্থা খুব উত্তপ্ত, যে- কোনো সময় সামরিক বাহিনী নামতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাই হবে এদের প্রধান লক্ষ্যস্থল।

আপনি যাবেন না। শ্রীপরিমল গুহ বলেছেন, লোকজনের কথা শুনে আমি বেশ ভয় পেয়ে যাই; ভাবলাম রাত্রে হলে ফিরব না, হলে তখন অনেক ছাত্র। হলে অবস্থানরত ৬০/৭০ জন ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তাদের কথা ভেবে আমি হলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মরলে সবাই একসঙ্গে মরব আর বাঁচলে সবাই একসঙ্গে বাঁচব। ওদেরকে ওভাবে ফেলে আমি নিজের প্রাণরক্ষার বিরোধী ভেবে হলে ফিরি।

রাত্রি তখন পুরো ১১টা। চারিদিকে থমথমে ভাব। গাড়ি-ঘোড়া চলাচল বন্ধ। নীরব নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসছে দূর থেকে গগনবিদারী স্লোগান "জয় বাংলা,বাঙালি জেগেছে— বাঙালি জেগেছে।" হলের ছাত্ররা হলের গেটে দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই ভীতসন্ত্রস্ত। কারও মুখে কোনো কথা নেই। সবাই অজানা আশঙ্কায় শঙ্কাগ্রস্ত। আমি তাদেরকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললাম। আমার কথায় কেউ বিশ্বাস করল না। কেউ বললেন আমাদের উপর হামলা করার কোনো কারণ নেই। এরপর প্রায় ২৫ জন ছাত্র হলের বাইরে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবার জন্য তৎক্ষণাৎ হল ত্যাগ করলেন। জানি না তারা এখন কোথায়? সত্যিই কি নিরাপদ হতে পেরেছিলো, না হানাদারদের লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলো। আমাদের হলে পাকবাহিনী আক্রমণ করে রাত সাড়ে বারোটায়। এর আগেই আমরা চারিদিকে গোলাগুলির আওয়াজ পাচ্ছিলাম। সেদিন আমরা রাইফেলের গুলির শব্দ শুনিনি। শুনেছিলাম মেশিনগান, মর্টার শেলিং ও মাঝে মধ্যে ট্যাংকের প্রচণ্ড শব্দ। আমাদের হলে সৈন্য প্রবেশের আগে আমরা যারা হলে ছিলাম তাদের মধ্যে কেউ কেউ হলের ছাদে উঠল, কেউ কেউ সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে, আবার কেউ কেউ নিজেদের রুমেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করল। আমি পিছনের দিকের ড্রেনের মধ্য দিয়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলাম।

হানাদার সৈন্যরা তখন হলে ঢুকে পড়েছে। আমি দেখলাম তারা প্রতিটি রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। আমার কানে গুলির শব্দ পৌঁছাচ্ছিল। আমি পিছনের দিক দিয়ে বেরোলাম। ধীরে ধীরে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের ড্রেনের দিকে এগিয়ে গেলাম। হানাদার সৈন্যরা হলে ঢুকে পড়েছে। আমি তখনও ম্যানহোলে ঢুকে পড়িনি। দেখলাম সৈন্যরা তন্ন তন্ন প্রতিটি রুম খুঁজছে।

হলে বাতি নেই। হল আক্রমণের আগেই বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল ওরা। তবুও দেখছিলাম ছাত্রদের ধরে ওরা বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ত, কখনও বেদম প্রহার করত, আবার কখনও ধরে নিয়ে আসত। এর মাঝেই কাছ থেকে গুলির শব্দ কানে আসল। গুলির শব্দে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। এরপরে আমি ম্যানহোলে ঢুকি। তখন রাত প্রায় ১টা।

২৬ মার্চ। সকালে ভোরের সূর্য উঠল। আমি ম্যানহোলে। সারাদিন ম্যানহোলে থাকলাম। সারাদিন আমার কানে শুধু গোলাগুলি আর মানুষের আর্তকান্না ভেসে আসছে বা এসেছে।
দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। আর পারা যায় না। ১৯ ঘণ্টা পর আমি প্রাণ হাতে নিয়ে রাস্তায় গুনে গুনে পা বাড়াই। দেওয়াল টপকিয়ে নিকটবর্তী স্টাফ কোয়ার্টারে যাই। প্রফেসর সন্তোষ ভট্টাচার্যের বাসায় আশ্রয় নেই।

- দৈনিক পূর্বদেশ, ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

জগন্নাথ হলে পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের অতর্কিত আক্রমণ শুরু হয় ২৫ মার্চ রাত্রি সাড়ে বারোটায়। ছাত্ররা দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারলেন আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করলেন। ক'জন দল বেঁধে ছাদে উঠলেন, কেউ কেউ নিজের কক্ষেই আত্মগোপন করার চেষ্টা করলেন, দু'একজন সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের দিকে গেলেন। জগন্নাথ হল, নর্থ হাউজ, ২৯ নং কক্ষ। কক্ষে দুজন ছাত্র থাকতেন। হরিধর ও সুনীল দাস। ২৫ মার্চ সুনীলের একজন অতিথি এসেছিলেন। পরিমল বলল পাকিস্তানী হিংস্র হানাদারেরা নর্থ হাউজে আক্রমণ চালিয়ে প্রথমে ঢুকল ২৯নং কক্ষে।

তিনজনই তখন রুমে উপস্থিত। পাকিস্তানী সৈন্যরা এত হিংস্র হতে পারে তারা তা ধারণা করেননি। তাই সরল বিশ্বাসে তারা নিজেদের রুমটাকেই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় ভেবেছিলেন। সৈন্যরা তিনজনকে পেয়ে গেল। শিকার ধরতে পেরে এই পশু সৈন্যদের সে কী উল্লাস, সে কী আনন্দ! পরিমল গুহ বললেন, " হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ। সৈন্যরা সার্চ লাইট সঙ্গে এনেছিল। তিনজনকে একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করল তারা। একত্রে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এরপর সৈন্যরা রুমে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল। পাছে যদি কেউ বেঁচে যায়। ব্রাশে সুনীল ও তার অতিথি মারা গেলেন। সুনীলের খবর নিতে এসে তিনি নিজেই নরপশুদের থাবায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন। হরিধরের গায়ে গুলি লাগেনি। মেশিনগানের গুলির শব্দে তিনিও অপর দুজনের সঙ্গে পড়ে গিয়েছিলেন মেঝেতে, কিন্তু গ্রেনেড লাগল তার পায়ে। তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন।"

পরিমল গুহ বললেন, গ্রেনেড ছুঁড়েই হানাদার সৈন্যরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, তারা ভেবেছিল সবাই শেষ। কেউ মেশিনগানের গুলি এবং এরপরই গ্রেনেড চার্জে বাঁচতে পারে না। কিন্তু অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন হরিধর। তার পা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছিল। নিজের তাজা টকটকে লাল রক্তের ধারা নিজেই চেপে ধরে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তুতিনি রক্ত বন্ধ করতে পারেননি।

হরিধর কক্ষে বসে পাহারা দিচ্ছিলেন তার বন্ধু সুনীল আর তার অতিথির মৃতদেহ। কক্ষে রক্তের স্রোত। বেরোবার উপায় নাই। হিংস্র হায়েনার দল তখন এ কক্ষে সে কক্ষে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাদেরকে পেয়েছে তাদেরকেই হত্যা করেছে। হরিধর বিস্ময়ে বিমূঢ়। তার চেতনা শক্তি লোপ পাবার উপক্রম। হতবাক হয়ে বসে রয়েছেন। চিন্তা করছেন হরিধর, সুনীল ও তার অতিথি এবং অপরাপর ছাত্রদের শোচনীয় পরিণতির কথা। তিনি চিন্তা করছেন। খেই হারিয়ে যাচ্ছেন তবুও চিন্তা করছেন। হঠাৎ মনে পড়ল তার কক্ষের কয়েকটি শিক ভাঙা। চেষ্টা করলে হয়তো বেরোনো যাবে মৃত্যুপুরী থেকে এ পথে।

তখন শেষ রাত। হলের ভিতরে গোলাগুলির আওয়াজ কমে গেছে। হরিধর চেষ্টা করলেন। পাইপ বেয়ে নীচে নামলেন। কিন্তু নিরাপদ স্থান কোথায়! ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগুলেন তিনি পুকুরে দিকে। তখনও তার পা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তবে রক্তের বেগ কমে গেছে। প্রায় জলের সাথে মিশে তিনি পুকুরের পারে ঘাসের মধ্যে আশ্রয় নিলেন। এরপর এখান থেকে তিনি আর সরেননি। ২৭ মার্চ সকাল পর্যন্ত হরিধর এ অবস্থাই কাটিয়েছিলেন।

সকালে কারফিউ তুলে নেওয়া হল। জনৈক দোকানি এ পথে যাবার সময় অর্ধমৃত হরিধরকে দেখতে পায়। তিনি হরিধরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। বেশ কয়েকদিনের চিকিৎসার পর হরিধর সুস্থ হয়ে ওঠেন।

- দৈনিক পূর্বদেশ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

তাদের বুকের সাইজ মিলিয়ে দাঁড় করানো হল। কয়েকটা লাইন। প্রতি লাইনে তিনজন। তারপর "দ্রিম দ্রিম" শব্দ। মেশিনগানের গুলি। সবাই একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তারপর একটু নড়াচড়া করে মহান মৃত্যুর হিম শীতল স্পর্শে নীরব হয়ে গেলেন। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ছাদের কথা বলছি। হানাদার পাকিস্তানী হায়েনার দল ২৫ মার্চে শেষ রাতে হলের ছাদে আশ্রয়গ্রহণকারী বেশ কয়জন ছাত্রকে এমনিভাবে গুলি করে হত্যা করে।

শ্রীপরিমল গুহ বলেন, " পাকিস্তানী নরপশুদের তাণ্ডবনৃত্য দেখে সত্য দাস, রবীন ও সুরেশ দাস সহ প্রায় জন পঁচিশেক ছাত্র হলের ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন আত্মরক্ষার জন্য। একমাত্র সুরেশ ছাড়া আর কেউ ওদের ক্রুদ্ধ ছোবল থেকে রক্ষা পাননি। তিনি বলেছেন সুরেশ একটু বেঁটে-খাঁটো। বুকের সাইজ অন্যান্যদের সঙ্গে তার মিলছিল না। তাঁকে সবার পিছনে দাঁড় করানো হল। তারপর গর্জে উঠল মেশিনগান। সকলের বুক হানাদারদের মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেল। হলের ছাদে লাল টুকটুকে রক্তের স্রোত বইল। সুরেশ বেঁটে-খাঁটো, তার বুকে গুলি লাগেনি। লেগেছিল তার ডান কাঁধে। তিনিও সকলের সাথে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ঠিক মৃতের মতো।

মৃতের মিছিলে জীবন্ত সুরেশ আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিতে গিয়েও সবাই মৃত্যুর কোলে আত্মসমর্পণ করলেন; মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারলেন না। কিন্তু শুধুমাত্র বেঁচে রয়েছেন তিনি। বেঁচে রয়েছেন তিনি এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের জীবন্ত সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে। পরিমল বললেন, সুরেশের কাঁধের মাংস উড়ে গেছে মেশিনগানের শক্তিশালী গুলিতে। অবিরাম ধারায় রক্ত ঝরছিল ক্ষতস্থান থেকে। ক্ষতস্থান গায়ের জোরে চেপে ধরেও তিনি রক্ত বন্ধ করতে পারছিলেন না। নিজের শরীরের উষ্ণ রক্তে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন।

নিজের গায়ের টকটকে তাজা রক্ত অবিরাম ধারায় ঝরছে তো ঝরছেই। কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না তাঁর রক্তপাত, রক্তের বেগ কমছে না। ব্যান্ডেজ করা দরকার, কিন্তু ব্যান্ডেজ করবেন কী দিয়ে। পরনের লুঙ্গি আর গায়ের গেঞ্জি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। লুঙ্গি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে লুঙ্গির ছেঁড়া টুকরো দিয়েই তিনি তৈরি করলেন ব্যান্ডেজ। ছাদের উপর সারিবদ্ধ তরুণদের মৃতদেহ। প্রহরীর মতো তিনি জেগে আছেন একা। রক্তের স্রোত। হলের ছাদ লাল রক্তে ভেসে গেছে। চারিদিক নীরব নিঝুম। শুধু গোলাগুলির শব্দ ও মানুষের আর্তকান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। পরিমল বলেই চলেছেন- মৃত্যুর পাশে বসে রয়েছেন সুরেশ। বসে রয়েছেন সুরেশ হতবাক হয়ে। মাঝে মাঝে তিনি চেতনা হারাচ্ছিলেন। নিজের বেঁচে থাকার উপর তাঁর ধিক্কার আসছিল, আবার কখনও তার চোখের সামনে ভেসে উঠত ভিড় জমানো ফেলে আসা স্বপ্নরঙিন মধুময় হাজারো দিনের স্মৃতি।

আছড়ে আছড়ে কেঁদে কেঁদে সেসব স্মৃতি ফরিয়াদ জানাত। স্মৃতির মিছিলে সুরেশ নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। হলের ছাদের উপর পানির ট্যাংক। হঠাৎ তার চেতনার উদয় হল। সুরেশ আর দেরি না করে পানির ট্যাংকে ঢুকলেন। ২৬ মার্চ পুরোদিন ও সারারাত তিনি পানির ট্যাংকেই কাটালেন আত্মগোপন করে। ২৭ তারিখে পানির ট্যাংকে আর থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। ২৭ তারিখে ডোরের দিকে হাতে প্রাণ নিয়ে তিনি ভয়ে ভয়ে নামলেন ছাদ থেকে।

এগিয়ে গেলেন জগন্নাথ হলের উত্তর পার্শ্বের রাস্তার দিকে। সুরেশ ভয়ে সোজা হননি। হামাগুড়ি গিয়ে এগুচ্ছিলেন। পরিমল গুহ তখন কারফিউ তুলে নেবার পর স্টাফ কোয়ার্টার থেকে এদিকের রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। সুরেশের সঙ্গে পরিমলের দেখা হওয়ায় সুরেশ প্রাণ ফিরে পেলেন। পরিমল গুহ পরে সুরেশকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দিয়ে আসেন। পরিমল ছাদের নারকীয় হত্যালীলার কাহিনী সুরেশের কাছ থেকে শুনেছেন।

— দৈনিক পূর্বদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

২৬ মার্চ সকাল ১১টা। হানাদার সৈন্যরা ৫ জনকে ধরে নিয়ে এলো হলের ভিতরে। তাদের দিয়ে বিভিন্ন কক্ষ, হলের ছাদ, বারান্দা থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাশগুলো নিয়ে ট্রাকে তুললো। হলের মাঠের মাঝখানে আগে থেকেই একটি বিরাট গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। লাশগুলো সেখানে নিয়ে এলো মাটিচাপা দেওয়ার জন্য। এই ৫ জনকেও সেখানে নিয়ে গেল। তারপর ঠিক গর্তের পারে তাদেরকে দাঁড় করিয়ে গুলি করলো। সবাই সঙ্গে সঙ্গেই লুটিয়ে পড়ল।

শ্রীপরিমল গুহ বললেন ২৬ মার্চ সকালের কথা। তিনি তখনও ম্যানহোলে। স্বচক্ষে দেখেছেন এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, বীভৎস দৃশ্য। তিনি বলেছেন, এই ৫ জনের মধ্যে তিনি স্পষ্টভাবে কালীরঞ্জন শীলকে চিনতে পেরেছেন।

আর কাউকে চেনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাদের একত্রে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ করার পর হানাদার খুনিরা সবাই চলে গেল গাড়ি হাঁকিয়ে।

হয়তো তারা আরও শিকার ধরার জন্যেই গেল। মাঠের গর্তে আর গর্তের পারে পড়ে রইল অগণিত প্রাণের নিষ্প্রাণ দেহ। হঠাৎ এই মৃতের স্তূপ থেকে একজন লোক ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালাল। পরিমল গুহ বললেন, আমি স্পষ্ট দেখলাম এই ভাগ্যবান ব্যক্তি কালীরঞ্জন শীল।

জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের স্যালুলয়েড ক্যামেরায় যার ছবি ধরা পড়েছে তিনি কালীরঞ্জন শীল। তিনি আবার ২৬ মার্চ ভোরের কথা বললেন। খুব ভোরে হানাদার সৈন্যরা অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে ধরে নিয়ে আসে মাঠে। শ্রীভট্টাচার্য হলেন একজন হাউজ টিউটর। এসেম্বলি বিল্ডিংয়ের একটি কক্ষে থাকতেন। পরিমল গুহ দেখেছেন হলের ছাত্র বিধান রায় এবং অপর একজন লোককে তারা ধরে নিয়ে আসল। শেষোক্ত ব্যক্তির বেশভূষায় তাকে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলে মনে হল।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের পরনে ধুতি। তিনজনকে একত্র করা হল। প্রহারের পালা। তারা তাদেরকে বুট দিয়ে লাথি দিচ্ছিল, রাইফেলের বাঁট দিয়ে মারছিল। বেদম প্রহার। তারা চিৎকার করছিল, বিধান প্রহারের তীব্রতার সহ্য করতে না পেরে ছেড়ে দেবার জন্য কাকুতি মিনতি করছিলেন। বার বার প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। বিধানের কথাতে তারা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। নরপশু সৈন্যরা প্রহারের তীব্রতা আরও বাড়িয়ে দিল।

অমানুষিক প্রহারের ফলে তারা যখন তিনজন প্রায় আধমরা হয়ে গিয়েছিলেন তখন তাদেরকে লাইন করে দাঁড় করানো হল। তারপর সেই পরিচিত মেশিনগানের শব্দ। তারা তিনজন এলিয়ে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। পরিমল গুহ বললেন, তিনি ২৬ মার্চ মাঠে মানবতার পুজারী প্রখ্যাত দার্শনিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেবের মৃতদেহ দেখেছেন। তাঁর গা খালি ছিল। সৈন্যরা তাঁকে উপুড় করে শুইয়ে রেখেছিল মাটি চাপা দেবার জন্য।

- দৈনিক পূর্বদেশ ২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

- **যিনি টেলিভিশন ক্যামেরায় ধরে রেখেছেন ২৫শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের হৃদয়বিদারক দৃশ্য সেই বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎকৌশলের অধ্যাপক ড. নুরুলউল্লার সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকার**

প্রশ্নঃ আপনি কি ২৫ মার্চের হত্যাকাণ্ডের ছবি নিজ হাতে তুলেছেন?

উত্তরঃ হ্যাঁ, আমি জগন্নাথ হলের মাঠে ২৬ মার্চের সকালবেলা যে মর্মস্পর্শী দৃশ্য ঘটেছিল তার ছবি আমার বাসার জানালা থেকে টেলিস্কোপ লাগিয়ে মুভি ক্যামেরায় তুলেছিলাম।

প্রশ্নঃ এ ছবি তোলার জন্য কি আপনার কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল, না এমনি হঠাৎ করে মনে হওয়াতে তুলে নিয়েছেন?

উত্তর: ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের ভাষণের পর থেকেই আমার একটা ধারণা হয়েছিল, যে এবার একটা বিরাট কিছু পরিবর্তন আসতে যাচ্ছে। তাই তখন থেকেই বিভিন্ন সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, মশাল মিছিল, ব্যারিকেড ইত্যাদির ছবি আমি তুলতে আরম্ভ করি।

প্রশ্নঃ ক্যামেরাটি কি আপনার নিজস্ব?

উত্তরঃ না, ওটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের টেলিভিশন ভিডিয়ো টেপ ক্যামেরা।

ছাত্রদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনি ধরনের আরও বহু ক্যামেরা ও জটিল যন্ত্রপাতি রয়েছে।

প্রশ্নঃ- ক্যামেরাটি আপনার কাছে রেখেছিলেন কেন?

উত্তরঃ- এর জবাব দিতে গেলে আমাকে আরও একটু পেছনের ইতিহাস বলতে হয়। ইতিহাস কথাটা বলছি এ জন্য, যে এগুলো ইতিহাসের পাতায় লিখে রাখা উচিত। ৭ মার্চের পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কিছু ছেলে এসে আমাকে ধরল, “ স্যার আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের যন্ত্রপাতি দিয়ে একটি অয়্যারলেস স্টেশন তৈরি করতে হবে। ” আমি ওদের কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না। এরপরে ওরা একদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা ঠিক করে আমাকে তাঁর ধানমণ্ডির বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমাকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির একেবারে ভিতরের এক প্রকোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া হল। আমি প্রথমে ব্যাপারটার গুরুত্ব অতটা উপলব্ধি করতে পারিনি। অনেক ভিতরের একটা কক্ষে নিয়ে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম সেখানে সোফার উপরে তিনজন বসে রয়েছেন। মাঝখানে বঙ্গবন্ধু। তার ডানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব ও বাঁ পাশে তাজউদ্দিন সাহেব।

আমি ঢুকে বঙ্গবন্ধুকে সালাম করলাম। ছাত্ররা আমাকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। যদিও আগেও অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি সোফা থেকে উঠে এসে আমাকে ঘরের এককোণে নিয়ে গেলেন। আমার কাঁধে হাত রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে বললেন, “নুরুলউল্লা, আমাকে ট্রান্সমিটার তৈরি করে দিতে

হবে। আমি যাবার বেলায় শুধু একবার আমার দেশবাসীর কাছে কিছু বলে যেতে চাই। তুমি আমায় কথা দাও, যেভাবেই হোক একটা ট্রান্সমিটার আমার জন্য তৈরি রাখবে। আমি শেষবারের ভাষণ দিয়ে যাব। ” বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ তখন আমার কাছে বাচ্চা শিশুর আবদারের আবেগময় কণ্ঠের মতো মনে হচ্ছিল। এরপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আমাদের তড়িৎকৌশল বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকদের কাছে সব কথা খুলে বললাম। শুরু হল আমাদের কাজ। বিভাগীয় প্রধান ড. জহুরুল হক সহ প্রায় সকল শিক্ষকই আমাকে সহযোগিতা করতে লাগলেন। ৯ দিন কাজ করার পর শেষ হল আমাদের ট্রান্সমিটার। এর ক্ষমতা বা শক্তি ছিল প্রায় সারা বাংলাদেশব্যাপী। শর্ট ওয়েভে এর শব্দ ধরা যেত। যাইহোক পরবর্তী সময়ে এর ব্যবহার আসেনি। এই সঙ্গেই আমার মাথায় ধারণা এলো, যদি কোনো হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ বা গোলাগুলি হয় তা হলে তা আমি ক্যামেরায় তুলে ফেলব এবং সে থেকেই ক্যামেরাটি আমার সঙ্গে রাখতাম।

প্রশ্নঃ- আপনি কখন ছবি তোলা শুরু করেন?

উত্তরঃ- রাত্রে ঘুমের মাঝে হঠাৎ বিকট শব্দ শুনে আমাদের সকলের ঘুম ভেঙে যায়। অবশ্য আমরা তখন অতটা গুরুত্ব দিইনি। আমি ভেবেছিলাম যে আগের মতোই হয়তো ছাত্রদেরকে ভয় দেখাবার জন্যে ফাঁকা গুলি করা হচ্ছে অথবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা আমাদের নির্দেশ ও সহযোগিতায় যে সমস্ত হাত বোমা তৈরি করছিল তারই দু'একটা হয়তো বিস্ফোরিত হয়েছে। সারা রাতটা একটা আতঙ্কের মধ্যে কাটালাম। জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে জগন্নাথ হলের দিকে তাকালাম। কিন্তু সমগ্র এলাকাটা আগে থেকেই বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেওয়াতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। রাতে জগন্নাথ হলের এলাকায় কী হচ্ছিল কিছুই দেখতে পারলাম না। শুধু গোলাগুলির শব্দ শুনছিলাম। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে ওখানে দুপক্ষেই একটা ছোটোখাটো লড়াই হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্যামেরাটার কথা মনে পড়ে গেল। অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন সকাল হবে আর দিবালোকে আমি ছবি তুলতে পারব।

প্রশ্নঃ- আপনি যে ক্যামেরা বসিয়েছিলেন তা কি বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল না?

উত্তরঃ- এমনভাবে ক্যামেরা বসানো হয়েছিল যে বাইরে থেকে বোঝার কোনো উপায় নেই। কারণ পর্দার আড়ালে এমনভাবে বসানো হয়েছিল যে শুধু ক্যামেরার মুখ বের করা ছিল। পুরো ক্যামেরাটা কালো কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল। আমাদের জানালাগুলো এমনভাবে তৈরি যে বন্ধ করার পরেও ধাক্কা দিলে কিছুটা ছোটো ফাঁক থেকে যায়। ওই ফাঁক দিয়ে ক্যামেরার মুখটা বাইরে বের করে রাখলাম।

প্রশ্নঃ- ক্যামেরা চালু করেন কখন?

উত্তরঃ- সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যবর্তী সময়ে। জানালা দিয়ে লক্ষ্য করলাম যে জগন্নাথ হলের সামনের মাঠে কিছু ছেলেকে ধরে বাইরে আনা হচ্ছে এবং তাদেরকে লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে, তখনই আমার সন্দেহ জেগে যায় এবং আমি ক্যামেরা অন করি। আমাদের ক্যামেরাটির একটা বিশেষ গুণ এই যে, এতে মাইক্রোফোন দিয়ে একই সঙ্গে শব্দ তুলে রাখা যায়। তাই আমি টেপের সঙ্গে মাইক্রোফোন যোগ করিয়ে ক্যামেরা চালু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম যে ছেলেগুলোকে এক ধারসে গুলি করা হচ্ছে ও একজন করে পড়ে যাচ্ছে। পাক সেনারা আবার হলের ভিতরে চলে গেল। আমি ভাবলাম আবার বেরিয়ে আসতে হয়তো কিছু সময় লাগবে। তাই এই ফাঁকে আমি টেপটা ঘুরিয়ে আমার টেলিভিশন সেটের সঙ্গে লাগিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম যে, ঠিকভাবে উঠেছে কি না। এটা শেষ করতেই আবার জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম যে, আবার কিছুসংখ্যক লোককে ধরে নিয়ে এসেছে। আবার লাইন করে দাঁড় করানো হয়েছে। আমি তখন পূর্বের তোলা টেপটা মুছে ফোলে তার উপর আবার ছবি তোলা শুরু করলাম।

প্রশ্নঃ- আপনি পূর্বের তোলা ছবিটার টেপ কেন মুছে ফেললেন?

উত্তরঃ- আমার মনে হচ্ছিল আমার আগের ছবিতে সবকিছু ভালোভাবে আসেনি। আর নতুন ছবি তুলতে গিয়ে আমি হয়তো আরও হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য ধরে রাখতে পারব।
আর হাতের কাছে আমার টেপ ছিল না। মোট কথা আমি ওই সমস্ত দৃশ্য দেখে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে পাগলের মতো হয়ে গেলাম। আজও আমি দুঃখ করি যদি, আমি নতুন টেপে ছবি তুলতে পারতাম তাহলে কত ভালো হত। দুটো দৃশ্য মিলে আমার টেপের দৈর্ঘ্য বেড়ে যেত। কিন্তু তখন এত কিছু চিন্তা করার সময় ছিল না। যাইহোক, দ্বিতীয়বারের লাইনে দেখলাম একজন বুড়ো দাড়িওয়ালা লোক রয়েছে। সে বসে পড়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে। আমার মনে হচ্ছিল সে তার দাড়ি দেখিয়ে বোঝাতে চেয়েছিল যে সে মুসলমান। কিন্তু বর্বর পাকবাহিনী তার কোনো কথাই শুনতে চায়নি। তাকে গুলি করে মারা হলো। মাঠের অপর অর্থাৎ পূর্বপার্শ্বে পাকবাহিনী একটা তাঁবু বানিয়ে ছাউনি করেছিল। সেখানে দেখছিলাম, ওরা চেয়ারে বসে বেশ কয়েকজন চা খাচ্ছে আর হাসি-তামাশা ও আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ছে।

প্রশ্নঃ- লোকগুলোকে হলের ভিতর থেকে কীভাবে আনা হচ্ছিল?

উত্তরঃ- যাদেরকে আমার চোখের সামনে মারা হয়েছে ও যাদের মারার ছবি আমার ক্যামেরায় রয়েছে তাদের দিয়ে প্রথমে হলের ভিতর থেকে মৃতদেহ বের করে আনা হচ্ছিল। মৃতদেহগুলি এনে সব এক জায়গায় জমা করা হচ্ছিল এবং ওদেরকে দিয়ে লেবারের কাজ করাবার পরে আবার ওদেরকেই লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সারিতে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মনে হচ্ছিল একটা করে পড়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নঃ- জমা করা মৃতদেহের সংখ্যা দেখে আপনার ধারণায় কতগুলো হবে বলে মনে হয়েছিল?

উত্তরঃ- আমার মনে হয় প্রায় ৭০/৮০ জনের মৃতদেহ এক জায়গায় জমা করা হয়েছিল।

প্রশ্নঃ- আপনার কি মনে হয় যে ওগুলো সবই ছাত্রদের মৃতদেহ?

উত্তরঃ- আমার মনে হয় ছাত্র ছাড়াও হলের মালি, দারোয়ান, বাবুর্চি এদেরকেও একই সঙ্গে গুলি করা হয়েছে। তবে অনেক ভালো কাপড়চোপড় পরা অল্পবয়সী দেখে আমার মনে হয়, তারা ছাত্রদের গেস্ট হিসাবে হলে থাকছিল।

প্রশ্নঃ- আপনি কি দেখেছেন যে কাউকে গুলি না করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?

উত্তরঃ- না, তবে লাইনে দাঁড় করাবার পরে যে খান সেনাটিকে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল সে যখন পিছনে তার অফিসারের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়েছিল এই ফাঁকে দু'জন লোক সামনে স্তূপ করা মৃতদেহগুলির মধ্যে শুয়ে পড়ল। আর বাকিগুলোকে গুলি করে মারা হল। গুলি করে যখন খানসেনারা সবাই কয়েক ঘণ্টার জন্য এই এলাকা ছেড়ে চলে গেল সেই ফাঁকে ওই দু'জন উঠে প্রাণ ভয়ে পালাতে লাগল। পরবর্তীকালে তাদের একজন আমার বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। সে একজন ছাত্রের অতিথি হিসাবে হলে থাকছিল। ঢাকায় এসেছিল চাকরির ইন্টারভিউ দিতে।

প্রশ্নঃ- আপনি কি আপনার ইচ্ছামতো সব ছবি তুলতে পেরেছিলেন ?

উত্তরঃ- না, আমি আগেই বলেছি যে আমি থেমে থেমে তুলছিলাম, পাছে টেপ ফুরিয়ে যায়। তাই আমি সব ছবি তুলতে পারিনি বলে আমারও ভীষণ দুঃখ হচ্ছে। কারণ পরে যখন বুলডোজার দিয়ে সব লাশগুলোকে ঠেলে গর্তে ফেলা হচ্ছিল সে ছবি আমি তুলতে পারিনি। কারণ ওরা কিছুক্ষণের জন্যে চলে যাবার পরপরই আমার পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমাকে বাসা ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

প্রশ্নঃ- আপনি কি টেপ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন?

উত্তরঃ- না, আমি সঙ্গে নেওয়াটা আরও বিপদের ঝুঁকি বলে মনে করে বাসায়ই যত্ন সহকারে রেখে যাই। আর এ ঘটনা আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানত না। বাইরে নিয়ে গেলে হয়তো অনেকেই জেনে ফেলত এবং আজকে এই মূল্যবান দলিল আমি দেশবাসীর সামনে পেশ করতে পারতাম না।

প্রশ্নঃ- আপনি কখন এই টেপ সবার সামনে প্রকাশ করলেন?

উত্তরঃ- যুদ্ধচলাকালীন নয় মাস প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত আমার আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে। কখন কে জেনে ফেলে। কখন আমি ধরা পড়ে যাই বা কখন এটা এসে নিয়ে যায়। এমনি মানসিক যন্ত্রণায় আমি ভুগছিলাম। যাইহোক, দেশ স্বাধীন হবার পরে ১৭ ডিসেম্বর-এর দিকে আমি আস্তে আস্তে প্রকাশ করলাম আমার এই গোপন দলিলের কথা এবং ২/৩ দিন পরেই এটা আমি সবাইকে জানালাম ও কয়েকদিন পরে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্যদের এটা দেখালাম। এ খবর শুনে অনেক বিদেশি সাংবাদিক আমার কাছে বহু টাকার বিনিময়ে এই দলিলের অরিজিনাল কপি অর্থাৎ আসল টেপ কিনতে চাইলেন।

প্রশ্নঃ- আপনি কি রাজি হলেন?

উত্তরঃ- আমার রাজি হবার প্রশ্নই ওঠে না। অরিজিনাল কপি আমি হারালে সেটা আমার দেশের জন্য বিরাট ক্ষতি হবে।

নালন্দা কে ধ্বংস করেছিলো ?

আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাস চর্চার প্রায় পুরোটাই শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনে। প্রাচীন পুরাণগুলিতে ইতিহাসের উপাদানের উপস্থিতির সম্ভাবনা সেই সময়ে বাতিল হয়ে যায়। নালন্দা মধ্যযুগের ইতিহাসের মধ্যে পড়ে। এর সমৃদ্ধি গুপ্ত ও পালযুগে হয়েছিল। তুর্কি আক্রমণে এর সমাপ্তি হয়, এমনটাই ইতিহাসে বলা হয়েছে। নালন্দায় আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার যে ফলক রয়েছে সেখানে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ারকে নালন্দার ধ্বংসের জন্য দায়ী করা হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা তাঁদের লেখাতেও তেমনটাই জানিয়েছেন। যেমন সতীশ চন্দ্র লিখেছেন ২০০৭ সালে,

'A Khalji officer, Bakhtiyar Khalji, whose uncle had fought the battle of Tarain, had been appointed in charge of some area beyond Benaras. He had taken advantage of this to make frequent raids into Bihar, which was at that time in the nature of no-man's land. During these raids, he had attacked and destroyed some of the famous Buddhist monasteries of Bihar, Nalanda and Vikramshila, which had no protector left'

History of Medieval India, S. Chandra, 2007

২০০৬ সালের ইতিহাস কংগ্রেস-এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডি এন ঝা 'Society and Culture in northern India in the twelfth Century' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে তিনি বখতিয়ার খলজি দ্বারা নালন্দা ধ্বংস হয় নি বলে মন্তব্য করেন। এরপরে কিছু ইতিহাসবিদদের মধ্যে এই বিষয়ে

আলোচনা চলছিল। অরুণ শৌরী ২০১৪ সালে একটি প্রবন্ধ লিখলেন 'How History was made up at Nalanda' নামে, যেখানে মুসলমান আক্রমণকে অস্বীকার করে নালন্দার ইতিহাস নতুন করে লেখার এক ষড়যন্ত্রের কথা বললেন। ডি এন ঝা এই প্রবন্ধের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে আবার লিখলেন কিছু কথা। এই নিয়ে ইতিহাস মহলে নতুন এক বিতর্কের জন্ম হল।

দুপক্ষের বক্তব্যের সারবত্ত্বা নিয়ে কথা বলার আগে একটি কথা জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। যে তুর্কি/আফগানি ব্যক্তি নালন্দা সহ নওদীয়া (লক্ষ্মণসেনের দুর্গ) আক্রমণের সাথে জড়িত, তাঁর প্রকৃত নাম 'বখতিয়ার' নয়। তাঁর নাম ইখতিয়ার। বখতিয়ার হল তাঁর পিতার নাম। 'বিন বখতিয়ার' হল 'son of Bakhtiyar'। তাঁর পুরো নাম হল 'Ikhtiyar Uddin Muhammad Bin (s/o) Bakhtiyar'। মেজর এইচ জি রেভার্টি ১৮৭৩ সালের অনুবাদে 'বিন' অংশটি উল্লেখ না করায় (পৃঃ ৫৪৯) বখতিয়ার নামেই তিনি পরিচিত হয়ে যান। এই অংশের শিরোনামে বখতিয়ারের পুত্র মোহম্মদ বলে অভিহিত করলেও আলোচনায় কয়েকবার 'মোহম্মদ-ই-বখতিয়ার' বলেছিলেন রেভার্টি।

ইখতিয়ার উদ্দীন বিন বখতিয়ারের মগধ ও গৌড় (লক্ষ্মণাবতী) আক্রমনের বর্ণনা পাওয়া যায় মিনহাজ-ই-সিরাজ রচিত 'তবকাত-ই- নাসিরী' নামক গ্রন্থ থেকে। মিনহাজ ১১৯৩ সালে জন্মেছিলেন। ৩৪ বছর বয়সে ভারতে আসেন। দিল্লির সুলতান ইলতুতমিসের শাসনকালে দিল্লি আসেন এবং কাজী ও সদর-ই-জাহান হয়েছিলেন। নাসিরুদ্দীন মাহমুদের আমলে গ্রন্থটি লিখেছিলেন। মিনহাজ স্বয়ং বাংলায় এসেছিলেন এবং দুই বছর এখানে থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।

মিনহাজের লিখিত বই, যেটি তিনি সুলতান নাসিরের নামে উৎসর্গ করেছিলেন, অনুবাদ করেন মেজর রেভার্টি ১৮৭৩ সালে। যেহেতু ইনি 'বখতিয়ার' নামেই বিখ্যাত হয়ে রয়েছেন তাই আলোচনার সুবিধার্থে সেই নামেই চিহ্নিত করা হল তাঁকে।

বখতিয়ার খলজির সৈন্যদলে ফরগনার দুই ভাই ছিলেন। একজনের নাম নিজাম উদ্দীন এবং অপরজন সমসাম উদ্দীন। এই সমসাম উদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল মিনহাজের, বখতিয়ারের মগধ আক্রমণের ৪০ বছর বাদে ৬৪১ হিজরীতে। তার মুখ থেকেই কাহিনি শুনেছিলেন মিনহাজ।

রেভার্টির অনুবাদটি প্রকাশিত হল ১৮৭৩ সালে। তিনি লিখলেন,

'... that he advanced to the gateway of the fortress of Bihar with hundred horsemen in defensive armour, and suddenly attacked the place.... they captured the fortress and acquired great booty. The greater number of the inhabitants of that place were Brahmans, and the whole of those Brahmans had their heads shaven; and they were slain. There were a great number of books there; and when all those book came under

the observation of the musalmans, they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the import of those books; but the whole of the Hindus had been killed. On becoming acquired it was found that the whole of that fortress and city was a college and in the Hindui tongue, they call a college Bihar'.

- 'The Tabaqat I Nasiri' of Minhaj I Siraj; Major H. G. Raverty

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক হলেন আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া। তিনি ইংরেজি থেকে নয়, বরং ফারসি থেকেই অনুবাদ করেছেন 'তবকাত-ই-নাসিরী' ১৯৮৩ সালে। তিনি লিখেছেন,

"দুইশত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ তিনি (বখতিয়ার) বিহার দুর্গাভিমুখে যাত্রা করেন ও অতর্কিতে আক্রমণ করেন।... দুর্গদ্বারে উপস্থিত হবার পর প্রবল আক্রমণ শুরু হল। স্বীয় শক্তি ও সাহসের বলে এই দুর্গদ্বার ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে তার সৈন্যদল দুর্গ অধিকার করে ও অনেক দ্রব্য লুণ্ঠন করে হস্তগত করে। এ স্থানের অধিকাংশ অধিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল। তাঁদের সকলকেই হত্যা করা হয়েছিল"।

মিনহাজের এই বর্ণনাটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আরো পরিষ্কারভাবে বললে বখতিয়ার 'বিহার' দুর্গ বলে কোনটি দখল করে সকলকে হত্যা করেছিলেন, সেটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক একে নালন্দা বলে চিহ্নিত করলেও ডি এন ঝা একে 'ওদন্তপুরী' বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ওদন্তপুরী হল বর্তমানের বিহার শরীফ। ঝা-এর সমর্থকেরা বলতে চেয়েছেন যে বখতিয়ার ওদন্তপুরী এবং বিক্রমশীল নষ্ট করলেও নালন্দার ক্ষতি করেন নি।

যুক্তি হিসেবে তাঁরা ধর্মস্বামিন বা ধর্মস্বামী কথিত 'নাম থর'-এর কথা বলেন। তিব্বতীয় শ্রমণ ছোইজে পাল (Chos-rje-dpal)-এর নাম হল ধর্মস্বামিন (১১৯৭-১২৬৪) যিনি নালন্দায় এসেছিলেন ১২৩৫ সালের এপ্রিলে। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন শিষ্য ছোই পাল দারপ্যাং-কে। শিষ্য লেখেন 'নাম থর (rnam-thar)', যার অর্থ জীবনকথা। রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বত ভ্রমণকালে ১৯৩৬ সালে দারপ্যাং-এর পাণ্ডুলিপিটি পেয়েছিলেন। গ্রন্থটির পুরো নাম হল, 'চাগ বংশীয় অনুবাদক গুরু ধর্মস্বামীর জীবনী'।

ধর্মস্বামী ১২৩৪ সালের এপ্রিলে মিথিলা থেকে গঙ্গা পার হয়ে মগধে পৌঁছান। বোধগয়াতে জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত থাকেন। ১২৩৫ সালের জানুয়ারীতে রাজগৃহে আসেন। এপ্রিলে যান নালন্দায়। মে বা জুন মাসে ফেরেন মিথিলায়। এই সময়ে মিথিলা বা তিরহুতের রাজা ছিলেন কর্ণাট বংশীয় রামসিংহ (১২২৭-৮৫) এবং মগধের রাজা বুদ্ধসেন। ... তবে এই রাজাদের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। আফগানেরা যথেচ্ছ লুঠতরাজ চালাত সেখানে।

ধর্মস্বামী জানিয়েছেন যে সেই সময়ে নালন্দার অধ্যক্ষ রাহুলশ্রীভদ্রের সাথে কিছুকাল তিনি অতিবাহিত করেছিলেন। খসর্পণ লোকেশ্বর, মঞ্জুশ্রী, জ্ঞাননাথ ও তারা, এই চারটি দেবতার পূজা সেই সময়ে নালন্দায় হত। যেহেতু বখতিয়ার খলজি তিব্বত আক্রমণ করে ফেরার পরেই মারা যান ১২০৬ সালে এবং তার প্রায় ৩০ বছর বাদে

ধর্মস্বামী নালন্দায় বাস করেছিলেন, তাই বখতিয়ারের দ্বারা নালন্দা ধ্বংস হতে পারে না, এটি যুক্তি স্বরূপ প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় প্রমাণস্বরূপ বলা হয় যে তারানাথের বর্ণনায় রাহুলশ্রীর পরে নালন্দায় আচার্য হয়েছিলেন ভূমিশ্রীভদ্র এবং তারপরে উপায়শ্রীভদ্র। আবার তারানাথ (অধ্যায় ৩৭) জানিয়েছেন, ভাঙ্গল (বঙ্গাল?) অঞ্চলের রাজা চঙ্গলরাজ/চিঙ্গলরাজ শক্তিশালী হন। হিন্দুদের একত্রিত করেন। প্রথম জীবনে হিন্দু হলেও রানির প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে আস্থা আসে। তুরুস্কদের হাতে নষ্ট হওয়া নয়তলা 'গণ্ডোলা'-র চারতলা তিনি নির্মাণ করে দেন। তিনি নালন্দার মন্দিরে অনেক দান করেছিলেন, যদিও নতুন কিছু স্থাপন করেন নি।

মঙ্গোলিয় সুমপা খনপো ইয়েশো পালজোর ১৭৪৮ সালে লেখেন 'পাগ সাম জোন জাং'। এতে বলা হয়েছে যে কাশ্মীরের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শাক্যশ্রীভদ্র (১১২৭-১২২৫) মগধে এসে ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখে বরেন্দ্র অঞ্চলের জগদ্দলে চলে যান। সেখানে শুভকরগুপ্তের কাছে তিনবছর শিক্ষাগ্রহণ করেন।

'পাগ সাম...'-এর অপর একটি তথ্যের উপরে জোর দেওয়া হয়। সেখানে বলা হয়েছে নালন্দার গ্রন্থাগার এলাকাটির নাম ছিল ধর্মগঞ্জ। তাতে তিনটি বহুতল ছিল। রত্নসাগর, রত্নোদধি ও রত্নরঞ্জক। তুরুস্কদের আক্রমণে নালন্দার চৈত্য ও বিহারগুলির যে ক্ষতি হয়েছিল, তা মুদিতভদ্র নামক ভিক্ষু মেরামত করে নেন। এর কিছুদিন বাদে মগধের রাজার মন্ত্রী কুকুটসিদ্ধ নালন্দায় মন্দির নির্মাণ করান। ঐ মন্দিরের উদঘাটন চলার সময়ে দুজন তীর্থিকের (হিন্দু সাধু বলে অনুবাদ করলেও তা এপেন্ডিক্স অনুযায়ী ভুল , কেননা তীর্থক বা তীর্থংকর মূলত জৈনদের সাধুদের বলে, হিন্দুদের না । মূল ও এপেন্ডিক্সের এই বিরোধ খেয়াল না করে ডিএন ঝা ও তার অনুগামী অধুনা অমর্ত্যসেন পর্যন্ত এই ভুলই কপিপেস্ট করে গিয়েছেন) গায়ে নোংরা নর্দমার জলছিটিয়ে দেয় কয়েকজন অল্পবয়স্ক বৌদ্ধ ভিক্ষু। এতে রুষ্ট হয়ে একজন ১২ বছর সূর্যদেবের তপস্যা করে একটি যজ্ঞের আয়োজন করে সমিধ ও ভস্ম ছিটিয়ে দিলে বিহারে আগুন লেগে যায়। ধর্মগঞ্জের তিনটি ভবনে আগুন লাগে। অলৌকিক জলধারা পুঁথিগুলিকে রক্ষা করে। রাজার ভয়ে পালাতে গিয়ে দুই তীর্থিক আগুনে পুড়ে মারা যায়।

এই ঘটনাটি উল্লেখ করে নালন্দায় আগুন লাগানোর দায় ব্রাহ্মণ সাধুর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

আমাদের বক্তব্য

আমাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার আগে আমরা কয়েকটি তথ্য দেখে নেবোঃ

১। পাগ সাম জোন জাং -এ পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে নালন্দার গ্রন্থাগারের পুঁথিগুলি রক্ষা পেয়েছিল। তীর্থিকেরা আগুন ছুঁড়েছিল বটে, তবে অলৌকিকভাবে গ্রন্থগুলি রক্ষা পায়। অলৌকিক জলের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা পুঁথিগুলির রক্ষা পাওয়ার উপরে জোর দিতে চাই। যে দুই তীর্থিক আগুন লাগিয়েছিল তারা সেই আগুনেই মারা যান। দুজন সাধুর পক্ষে নালন্দা ধ্বংস করা যে সম্ভব নয়, সেটি একজন শিশুও বুঝতে পারবে,

যদি সে নালন্দার খনন করা ধ্বংসাবশেষ দেখে থাকে। উপরন্তু কয়েকটি পুঁথিতে কেবল আগুন লাগাতে সক্ষম হয়েছিল তাঁরা। নালন্দার বিহারগুলি আক্রান্ত হয় নি।

২। পাগ সাম...-এ প্রথমেই তুরুস্কদের দ্বারা নালন্দা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে মুদিতভদ্র নামক একজন শ্রমণ তা মেরামত করেছিলেন। নালন্দার বিরাট বিরাট চৈত্য ও বিহারগুলি মেরামত করা কি একজন ভিক্ষুর পক্ষে করা সত্যিই সম্ভব? তুরুস্করা যে নালন্দা আক্রমণ করেছিল সে কথা তারানাথের লেখাতেও বলা হয়েছে।

৩। তৃতীয় বিষয়টি হল ধর্মস্বামীর 'নাম-থের'-এর বর্ণনা। সেখানে বলা হয়েছিল যে মগধের রাজা সেই সময়ে বুদ্ধসেন হলেও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ তাঁর তেমন ছিল না। আফগান সেনারা লুঠতরাজ চালাত। এছাড়াও ধর্মস্বামী নালন্দায় আসার পরে কি হয়েছিল তার বিস্তারিত বর্ণনাও রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

নালন্দার ৭টি চৈত্য এবং ১৪টি বিহারের অধিকাংশই তখন ব্যবহারযোগ্য ছিল না। (আমরা মনে রাখব যে এই ৭ ১৪ = ২১টি স্থাপত্যের মধ্যে ১৪টি আবিস্কৃত হয়েছে প্রত্নবিভাগের দ্বারা। অর্থাৎ বাকি ৭টি একেবারে ধূলায় মিশে গিয়েছে)। কয়েকটি আফগান সেনাদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত। (এই পয়েন্টটি আমরা বিবেচনায় রাখব। বখতিয়ার ছিলেন আফগানিস্তানের গরমশির অঞ্চলের মানুষ। তাঁর বাহিনীকে তুর্কি এবং/বা আফগান, উভয়ভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে)। কেবল ২টি ছিল ব্যবহারযোগ্য (অর্থাৎ ২১টি স্থাপত্য বা ১৪টি বিহারের মধ্যে মাত্র দুটি ছিল ব্যবহারযোগ্য। অর্থাৎ ১২ টি বিহার নষ্ট করা হয়েছিল) ছিল ধর্মস্বামীর সময়ে (১২৩৫ সালে)। আচার্য রাহুলশ্রীভদ্রের কাছে ৭০ জন ভিক্ষু শিক্ষালাভ করতেন (যে নালন্দায় একসময় কয়েক হাজার ছাত্র ছিল, সেখানে ধর্মস্বামীর সময়ে ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৭০ জন)। মগধের রাজা বুদ্ধসেন গুরু রাহুলশ্রীভদ্রকে মশারি সমেত রত্নখোচিত বিছানা, হাতপাখা ও মশা তাড়ানোর ধুপদানী দান করেছিলেন। ভিক্ষুদের খরচ চালাতেন ওদন্তপুরীর জয়দেব। ধর্মস্বামী থাকাকালীন জয়দেব ও তাঁর আত্মীয়কে আফগানরা বন্দি করেছিল ওদন্তপুরীতে। জয়দেব দূত পাঠিয়ে রাহুলশ্রীভদ্রকে নালন্দা আক্রমণের বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। এই সংবাদ পেয়ে ভিক্ষুরা ভয়ে পালিয়ে যান। রাহুলশ্রীভদ্রের বয়স সেই সময়ে ৯০ বছর। তিনি অন্যত্র যেতে রাজি হন নি। ধর্মস্বামী তখন গুরু রাহুলশ্রীকে নিয়ে জ্ঞাননাথ মন্দিরে লুকিয়ে ছিলেন। আফগান সেনারা নালন্দায় এসে লুঠ করার মতো কিছু না পেয়ে ফিরে যায়।

অর্থাৎ ১২৩৫ সাল পর্যন্ত মাঝেমধ্যেই যে আফগান সেনাদের (তাদের ঘাঁটি ছিল ওদন্তপুরী বা বিহার শরীফ) আক্রমণ চলত নালন্দায়। আগেই ১২ টি বিহার নষ্ট হয়েছিল। ধর্মস্বামীর সময়ে নালন্দায় লুঠ করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। রাজা বুদ্ধসেন এতো বড় রাজা ছিলেন না যে নালন্দার পুনর্নির্মাণ করাবেন। সামান্য মশারি, বিছানা, হাতপাখা ইত্যাদি দান করতেন। তাঁর সেনাবাহিনীও এমন ছিল না যে আফগানদের প্রতিহত করবেন। চিঙ্গলরাজার আমলেও নানা দান করা হলেও কোনো বিহার নির্মাণ করা হয় নি। লাগাতার আক্রমণ চলছিল, এদিকে নতুন করে কিছু নির্মাণ করা হচ্ছিল না। ফলে অচিরেই নালন্দা পরিত্যক্ত হয়েছিল।

৪। একথা সত্য যে নালন্দায় আক্রমণ তুর্কি বা আফগানরা শুরু করে নি। এর আগেও পূর্ণবর্মন একবার পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাট মহীপালও কিছু পুনর্নির্মাণ করান। বিরোধী শক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্যান্য রাজারা নালন্দায় পুনর্নির্মাণ করে দিতেন। কিন্তু তুর্কিদের আক্রমণের পরে নির্মাণের কাজ আর হয় নি।

৫। কাশ্মীরের বৌদ্ধ শ্রমণ শাক্যশ্রীভদ্রের কথা বলা হয়েছে। তিনি মগধে এসে ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলকে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেখে বরেন্দ্রীতে জগদ্দল বিহারে চলে যান শিক্ষাগ্রহণ করতে। এই তথ্য দিয়ে বলা হয় যে নালন্দা ধ্বংসের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে নালন্দার মতন এমন জগতবিখ্যাত স্থান থাকতে তিনি জগদ্দলে কেন যাবেন? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে জগদ্দল নালন্দার থেকে অনেক কম মর্যাদার। আমরা ধরে নিতে পারি যে যেভাবে ওদন্তপুরী আফগানদের ঘাটি হয়েছিল বা বিক্রমশীল ধুলোয় মিশে গিয়েছিল, শাক্যশ্রীর সময়ে ততটা খারাপ অবস্থা নালন্দার হয় নি। কিন্তু নালন্দায় বসবাস করে শিক্ষালাভের নিশ্চয়তা (মাঝেমধ্যেই আক্রমণ) ছিল না বলেই শাক্যশ্রী বরেন্দ্রীতে (সেখানে তখনও সেন রাজাদের শাসন) চলে গিয়েছিলেন।

মিনহাজ বর্ণিত 'বিহার' কি নালন্দা?

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার 'The Glorious Magadha'-এ বলেছিলেন ১১৯৯ সালেই নালন্দা ধ্বংস হয়েছিল। ধীরজলাল সাঙ্কালিয়া (The University of Nalanda) মিনহাজের বর্ণনাতে নালন্দার কথা নেই বললেও শেষ পর্যন্ত পরোক্ষ প্রমাণ দিয়ে সেটিকে নালন্দাই বলেছিলেন। আধুনিক কিছু ঐতিহাসিক বখতিয়ার আক্রান্ত বিহারটিকে নালন্দা নয় বলতে চেয়েছেন। তাঁদের মতে সেটি ওদন্তপুরী। যেহেতু তারানাথ ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীল ধ্বংসের কথা বলেছেন তাই সেটি নালন্দা নয় বলে মনে করা হয়েছে।

মিনহাজের বর্ণনার কয়েকটি বিষয় নিয়ে যে ব্যাখ্যা করা হয় তা নিয়ে আমাদের মনে প্রশ্ন রয়েছে,

১। বখতিয়ার যে আক্রমণ করে বিহারটিকে ধ্বংস করেছিলেন, এমন কথা একেবারেই বলা হয় নি। বলা হয়েছে 'দুর্গ' ভেদ করে তাঁর সৈন্য প্রবেশ করেন, অবাধে লুণ্ঠন করেন এবং ভেতরের সকল মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণদের হত্যা করেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নালন্দাও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নি সেই সময়ে (১১৯৯-১২০৬)।

২। বখতিয়ার ওদন্তপুরী দখল করে সেখানেই ঘাঁটি করেছিলেন। তুর্কি-আফগানদের ঘাঁটি সেখানেই ছিল তাঁর মৃত্যুর পরেও। কিন্তু মিনহাজ যে দুর্গটির (বিহার) কথা বলেছেন, সেখানে দখল করে আফগানদের ঘাঁটি হওয়ার কথা বলা হয় নি।

৩। মিনহাজ বলেছিলেন সেই দুর্গে (বিহার) অনেক গ্রন্থ ছিল। সেসব গ্রন্থের অর্থ বলার জন্য হিন্দুদের ডাকা হয়। কিন্তু সকল হিন্দুদের (ব্রাহ্মণ) হত্যা করা হয়েছিল বলে অর্থ উদ্ধের জন্য কেউ ছিল না। যদিও ওদন্তপুরী বিহারে পড়াশোনা করা হত, তবু অজস্র গ্রন্থের সম্ভার নালন্দাতেই ছিল। নালন্দার গ্রন্থাগারের খ্যাতি ছিল বিশ্ববিখ্যাত। প্রচুর গ্রন্থের কথা বলায় বখতিয়ারের আক্রান্ত বিহারটি নালন্দা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

৪। বলা হয়েছে বখতিয়ার নাকি বিহারটিকে দুর্গ ভেবেছিলেন, এর প্রাচীর, দুর্গদ্বার ও সুরক্ষার মাত্রা দেখে। সেই সময়ে নালন্দা ছিল বিশাল এলাকা নিয়ে প্রাচীর ঘেরা এক অঞ্চল। বাইরে থেকে তাকে দুর্গ বলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

৫। শ্রমণদের 'ব্রাহ্মণ' বলে বর্ণনা। বলা হয়ে থাকে যে বখতিয়ার যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দুর্গ ভেবেছিলেন ভুল করে, মিনহাজও তেমনি বৌদ্ধ শ্রমণদের ভুল করে 'ব্রাহ্মণ' বলেছিলেন। দুটি বিষয়েই আমাদের বক্তব্য রয়েছে। বখতিয়ার কিছুমাত্র ভুল করেন নি। এমন একেবারেই নয় যে তিনি আচমকাই মগধ আক্রমণ করেছিলেন। মিনহাজের লেখাতেই আছে যে তিনি মানের (পাটনার কাছে) অঞ্চলে দুই বছর ধরে ছিলেন এবং বিহার অঞ্চলে দু'বছর ধরে লুঠতরাজ চালাচ্ছিলেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের খোঁজখবর নিয়েই দু'বছর বাদে বিহার/দুর্গটিকে আক্রমণ করেছিলেন। দু'বছর ধরে বিহার বা মগধে লুঠপাট চালানো বখতিয়ার যে নালন্দাকে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নন (কারণ নালন্দার নানা ঐশ্বর্য্যের যেমন, সোনা, রত্নখচিত মূর্তি ইত্যাদির খ্যাতি ছিল), সেকথা বলাই বাহুল্য।

মিনহাজ ১২২৭ সালে ভারতে এসেছিলেন এবং 'তবকাত ই নাসিরী' রচনা করেন ১২৬০ সালে, অর্থাৎ ৩৩ বছর বাদে। ৩৩ বছর ভারতে বাস করে এবং দুই বছর বাংলায় থেকে মিনহাজ বৌদ্ধ শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণের পার্থক্য জানতেন না, এমন হতেই পারে না। আসলে তিনি ভুলবশত নয়, জেনেশুনেই 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে নালন্দায় কেবলমাত্র বৌদ্ধরাই শিক্ষাগ্রহণে আসতেন না। সবধর্মের মানুষই আসতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণেরাও আসতেন। হিন্দুরাও শিক্ষাগ্রহণকালে মুণ্ডিতমস্তক হতেন কয়েকশো বছর আগেও। মাথার পিছনে থাকত শিখা। অর্থাৎ বৌদ্ধশ্রমণ এবং হিন্দু-ব্রাহ্মণ ছাত্র, সকলেই ছিলেন মুণ্ডিত মস্তক নালন্দায় বখতিয়ারের আক্রমণের কালে।

বিক্রমশীল এবং ওদন্তপুরী (এই দুটিই পালসম্রাটদের আমলে স্থাপিত) ছিল বৌদ্ধ বজ্রযান চর্চার কেন্দ্র। ফলে এই দুই কেন্দ্রে মূলত বৌদ্ধরাই শিক্ষা নিতে আসত। অপরদিকে নালন্দা যে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, সেই বিষয়ে অনেকেই জানিয়েছেন। হিউয়েন সাঙ যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে সেখানে বেদ পড়ানো হত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রও পড়ানো হত।

এমন একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় যে মিনহাজ যার থেকে বিহার আক্রমণের কথা শুনেছিলেন (সমসাম উদ্দীন) বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণের পার্থক্য জানত না আক্রমণের সময়ে। হয়তো সে কিছুদিন আগে ভারতে এসেছিল। ভারতের মানুষদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল ছিল না। মিনহাজ তাঁর বর্ণনায় জানিয়েছিলেন যে বিহারটি যে দুর্গ নয়, তা পরে বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু ৪০ বছর বাদে যখন সমসাম উদ্দীন মিনহাজকে বর্ণনা করছেন, তখনও সে বৌদ্ধ আর ব্রাহ্মণে তফাৎ বোঝে না, একথা বিশ্বেয়াসযোগ্য নয়।

অর্থাৎ সমসাম উদ্দীন জেনেশুনেই 'ব্রাহ্মণ' বলেছিলেন এবং মিনহাজ জেনেশুনেই সেকথা লিখেছিলেন। সংখ্যাধিক্য ব্রাহ্মণদের উপস্থিতি কেবলমাত্র নালন্দাতেই হওয়া সম্ভব ছিল সেই সময়ে মগধে। এক্ষেত্রে আক্রমণ যে নালন্দাতেই হয়েছিল সে বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত হওয়া যায়।

তুর্কি/আফগান না হলে নালন্দা ধ্বংস করল কারা?

কুকুটসিদ্ধের মন্দির উদঘাটনের সময়ে দুই তীর্থিককে অপমান করার ফলে তারা যে যজ্ঞের আগুন লাগিয়েছিল নালন্দার গ্রন্থাগারে, সেটি যে নালন্দা ধ্বংসের কারণ নয়, সেটি আমরা জেনেছি। যে বিহারে কয়েক হাজার মানুষ (ছাত্র, শিক্ষক মিলিয়ে) থাকত সেখানে দুজন নিরস্ত্র হিন্দু সাধু ধ্বংসলীলা চালালো, এমনটা হতে পারে না। পুষ্যমিত্র বা মিহিরকুলের মতন বৌদ্ধবিদ্বেষী রাজাবা ছিলেন বটে, তবে তারা বখতিয়ারের আগমনের অনেক আগেকার রাজা। বখতিয়ারের আমলে যে নালন্দা চালু ছিল সে বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত। মগধ অঞ্চল মুসলিম অধিকারে আসার পরে তেমন কোনো শক্তিশালী হিন্দু রাজার নাম পাওয়া যায় নি, যারা আক্রমণ করেছিলেন। ফলত হিন্দু রাজাদের হাতে নালন্দা ধ্বংসের সম্ভাবনা সেই সময়ে নেই। হিন্দু রাজাদের আক্রমণের যা কিছু ইতিহাস সবই মুসলিম অধিকারের আগের যুগের।

যে সকল ঐতিহাসিকেরা বখতিয়ারের হাতে নালন্দার বিনষ্ট হওয়ার কথা বাতিল করেন, তাঁদের একথা বলার আবশ্যকতা রয়েছে, বিকল্প কার বা কাদের হাতে নালন্দা নষ্ট হয়েছিল। তুরস্কদের বারংবার নালন্দা আক্রমণের কথা বরং পাওয়া যাচ্ছে। ধর্মস্বামীর সময়ে (বখতিয়ারের ৩০-৩৫ বছর বাদে) নালন্দার অধিকাংশ অংশই নষ্ট অবস্থায় ছিল। বাকি দুটি বিহার পরবর্তী আক্রমণে (জয়দেব যেমন একটি আক্রমণের কথা রাহুলশ্রীভদ্রকে জানিয়েছিলেন) বাকিগুলিও নষ্ট হয়ে যায়।

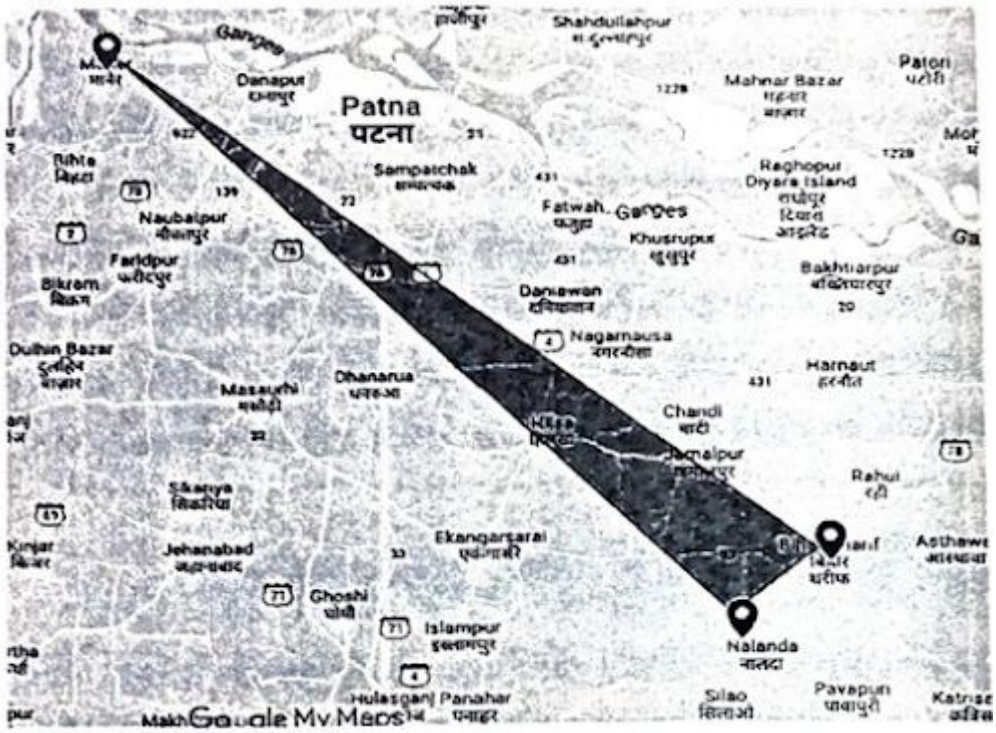

মানের থেকে বিহার শরীফের দূরত্ব = ৯৫ কি.মি.

মানের থেকে নালন্দার দূরত্ব = ১০৬ কি.মি.

নালন্দা থেকে বিহার শরীফের দূরত্ব = ১২ কি.মি.

"তিনি (বখতিয়ার) মানের ও বিহার অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা করেন এবং অনেক লুণ্ঠিত দ্রব্য তিনি হস্তগত করেন এবং তাতে অশ্ব, যুদ্ধাস্ত্র ও সৈন্যসহ সম্পূর্ণ উপকরণ তাঁর অধিকারে আসে। তাঁর বীরত্ব এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।... তাঁর সংবাদ সুলতান কুতব-উদ-দীনের দরবারে পৌঁছলে তিনি তাঁকে একটি সম্মালূচক পরিচ্ছদ প্রেরণ ও প্রচুর সম্মান প্রদান করেন। এই সম্মান ও সমর্থন লাভ করে তিনি বিহার অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং সে রাজ্য লুণ্ঠন করেন। দুই এক বৎসর তিনি ঐ অঞ্চল ও রাজ্যের মধ্যে আক্রমণ চালালেন ও বিহার অবরোধের প্রস্তুতি চালালেন'।

- বকাত-ই-নাসিরী, অনুবাদক যাকারিয়া

মানের অঞ্চলে ঘাঁটি করে বখতিয়ার প্রায় দুই বছর ছিলেন এবং আশেপাশের সমগ্র অঞ্চলে লুঠপাঠ চালিয়েছিলেন। মানের থেকে ওদন্তপুরী (বিহার শরীফ) যতদূর, নালন্দাও প্রায় তাই। উপরন্তু নালন্দা ও ওদন্তপুরী নিকটবর্তী অঞ্চল। বখতিয়ার মানের থেকে ওদন্তপুরী এলেন (৯৫ কিমি), অথচ খুব কাছেই নালন্দায় এলেন না, এমন হতে পারে না। প্রায় ২/৩ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে নালন্দা বখতিয়ারের নজর এড়িয়ে যেতে পারেই না। নালন্দায় প্রায় ১৬০০ বছর ধরে নানা দেশের ও রাজ্যের রাজা, ধনী ব্যক্তিদের মূল্যবান দানের সামগ্রী জমায়েত হয়েছিল। আজকের ভারতের তিরুপতি জাতীয় মন্দিরের সম্পদের পরিমাণ আমরা অনুমান করি। ধর্মস্থানে সাধারণ মানুষেরাও দান করে সাধারণত। দুই বছর ধরে নানান খোঁজখবর নিয়েই বখতিয়ার এই অঞ্চলে লুঠপাট করেছিলেন। বিহার অবরোধের যে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন বখতিয়ার তা মিনহাজই জানিয়েছেন। হিউয়েন সাঙ এবং ইৎ সিঙ, দুজনের বর্ণনাতেই পাওয়া যায় যে নালন্দা প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। বিশাল নালন্দার এলাকা একটি শহরের মতই বিস্তৃত ছিল। ফলে নালন্দাকে দুর্গ বলে ভুল করার যথেষ্ট সম্ভাবনাও ছিল। ফলত নালন্দা যে বখতিয়ারের আক্রমণের শিকার হয়েছিল সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। পরবর্তী ধারাবাহিক আক্রমণ এবং রাজন্যবর্গের অনুকূলতা না পাওয়া নালন্দাকে একসময়ে নিশ্চিন্ন করে দেয়। মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে ধর্মস্বামীর আমলে ১২ টি বিহারের ১০ টি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা আমরা জেনেছি। টিমটিম করে টিকে থাকা বাকি অংশও ক্রমে হারিয়ে যায়।

মিনহাজ বর্ণিত 'বিহার' যে নালন্দা সেই বিষয়ে আমাদের যুক্তি হল নিম্নরূপ-

১। বখতিয়ার নালন্দাকে দুর্গ মনে করেছিলেন। হিউয়েন সাঙ ও ইৎ সিঙের লেখাতে নালন্দার বিহার যে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল, তা জানা যায়।

২। বখতিয়ার অজস্র বই বা গ্রন্থ দেখেছিলেন বিহারে। নালন্দার বিখ্যাত গ্রন্থাগারের কথা অনেকেই বলেছেন।

৩। 'পাগ সাম...' এবং তারানাথ, উভয় বর্ণনাতেই তুরুস্কদের আক্রমণে নালন্দা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা রয়েছে।

৪। ধর্মস্বামীর আমলেও বিহার শরীফ বা ওদন্তপুরী থেকে আক্রমণ হত। তার আগেই নালন্দায় ১২টি বিহার অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

মূল স্রোতঃ শ্রী রজত পাল

মহর্ষি দয়ানন্দের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ব্যবহার ও কর্তব্য

বিবাহের পর স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্য শুধুমাত্র ধর্মীয় সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, এটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান, সহানুভূতি এবং সহযোগিতা একে অপরকে সুখী ও সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এখানে কিছু মৌলিক কর্তব্য তুলে ধরা হলো:

- **স্বামীর কর্তব্য:**

1. পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সম্মান: স্বামী স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং তার অনুভূতিকে গুরুত্ব দেবেন। সম্পর্কের ভিতরে শক্তিশালী ও সমান স্তরে শ্রদ্ধার ভিত্তি তৈরি করতে হবে।
2. আর্থিক সহায়তা ও গৃহস্থালি দায়িত্ব: পরিবারের খরচ, রোজগার এবং অন্যান্য আর্থিক চাহিদা মেটানোর জন্য দায়িত্ব পালন করা। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। পাশাপাশি গৃহস্থালি কর্মে যথাসম্ভব সহায়তা করা।

3. সময়সূচি ও মনোযোগ: স্ত্রীর প্রতি সময় দেওয়া এবং সম্পর্কের জন্য মনোযোগী থাকা। এটা তার মানসিক শান্তি ও সম্পর্কের সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। স্ত্রীকে তার জীবনের লক্ষ্য ও সদুদ্দেশ্য লাভে প্রোৎসাহিত করা।
4. সমস্যার সমাধান: স্বামী হিসেবে স্ত্রীর সমস্যা সমাধানে সহায়তা করা এবং তার জীবনে বোঝা না বাড়িয়ে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসা।

- **স্ত্রীর কর্তব্য:**

1. সহানুভূতি ও সমর্থন: স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীকে মানসিক সমর্থন দেওয়া। তার জীবনের কঠিন সময়গুলোতে পাশে থাকা এবং একে অপরকে শক্তি দেওয়া।
2. আর্থিক সহায়তা ও গৃহস্থালি দায়িত্ব: স্ত্রী চাকরিজীবী হলে পূর্বোক্ত সহায়তা পাশাপাশি, গৃহস্থালি কাজ এবং পরিবারকে সুসংগঠিত রাখার জন্য দায়িত্ব পালন করা, যেমন রান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, এবং পরিবারের অন্যান্য কাজগুলো।
3. পারস্পরিক যোগাযোগ: সম্পর্কের মধ্যে সৎ, খোলামেলা এবং স্পষ্ট যোগাযোগ রাখা। স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীর অনুভূতিগুলি বুঝতে চেষ্টা করা এবং নিজেদের মতামত সঠিকভাবে ভাগ করা।
4. স্বামীকে উৎসাহ দেওয়া: স্বামীকে তার পেশাগত বা ব্যক্তিগত লক্ষ্য অর্জনে উৎসাহ দেওয়া এবং তার সাফল্যে প্রেরণা জোগানো।

- **উভয়ের কর্তব্য:**

1. ভালোবাসা ও সমর্থন: সম্পর্কের ভিত শক্তিশালী রাখতে উভয়ের কর্তব্য হলো একে অপরের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা।
2. পরস্পরের স্বাধীনতা ও গোপনীয়তার প্রতি শ্রদ্ধা: একে অপরের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তা সুরক্ষা করা, ব্যক্তিগত সীমারেখা অতিক্রম না করা।
3. বিশ্বাস এবং সততা: স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল স্তম্ভ হলো বিশ্বাস। উভয়েরই একে অপরের প্রতি সততা বজায় রাখা, যাতে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়।
4. পারস্পরিক সমঝোতা: কোনো সমস্যা বা অসুবিধার ক্ষেত্রে একে অপরকে বুঝতে চেষ্টা করা এবং যৌথভাবে সমাধান বের করা।

বিয়ে শুধু আইনি বা সামাজিক এক চুক্তি নয়, এটি দুজন মানুষের মধ্যে বিশ্বাস, ভালোবাসা, এবং সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন। তাই স্বামী ও স্ত্রীর কর্তব্যের মধ্যে একে অপরকে সম্মান এবং সহযোগিতা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহের পর স্ত্রী ও পুরুষকে নিজ-নিজ বর্ণের অনুসারে কর্তব্য-কর্ম করতে হয়, যাঁর মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ আদি সম্মিলিত। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী নিজের বেদভাষ্যে স্বামী-স্ত্রীর কী কী কর্তব্য রয়েছে সেই বিষয়ে বর্ণনা করেছেন,

যথা নদীসমুদ্রৌ মিলিত্বা রত্নান্যুৎপাদয়তস্যথা স্ত্রীপুরুষা অপত্যান্যুৎপাদয়ন্তু ॥
ঋগ্বেদভাষ্যভাবার্থ ৩.১.৭
অর্থাৎ, যেভাবে নদী এবং সমুদ্র মিলে রত্ন উৎপন্ন করে, সেভাবেই স্ত্রী-পুরুষ উত্তম সন্তানদের উৎপন্ন করুক।

যৌ স্ত্রীপুরুষৌ দুঃখবন্ধনানিচ্ছিত্বা দুষ্টাচারং বিহায় বিদ্যোন্নতিং কুর্য্যাতাং তৌ সততং সুখমাপ্নুয়াতামিতি ॥
ঋগ্বেদভাষ্যভাবার্থ ৩.৩৩.১৩

অর্থাৎ, যে স্ত্রী-পুরুষ দুঃখের বন্ধন ছিন্ন করে, দুষ্ট আচরণ ত্যাগ করে বিদ্যার উন্নতি করে তারা নিরন্তর সুখ লাভ করে।

যথা পুরুষা বিদ্যাভ্যাসং কুর্য্যুস্তথৈব স্ত্রিয়োঽপি কৃত্বা শ্রীমত্যো ভবন্তু উভয়ে আলস্যং বিহায় শিল্পবিষয়াণি সর্বাণি কর্মাণি সাধ্নুবন্তু ॥

ঋগ্বেদভাষ্যভাবার্থ ৩.৫৪.১৩

অর্থাৎ, যেবে পুরুষ বিদ্যার অভ্যাস করবে, তেমনই স্ত্রীও করে লক্ষ্মীযুক্তা হবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে আলস্য ত্যাগ করে শিল্প-বিষয়ক সম্পূর্ণ কর্মকে সিদ্ধ করতে থাকবে।

যদি স্ত্রীপুরুষৌ প্রসন্নতয়া কৃতবিবাহৌ বিদ্যাপ্রজ্ঞাসুবাণীযুক্তৌ ভূত্বেহ গৃহাশ্রমে স্থিত্বা প্রেমজান্যপত্যান্যুৎপাদ্য পালয়িত্বা সুশিক্ষাযুক্তানি কৃত্বা স্বয়ংবরং বিবাহং কারয়িত্বা নিবাসয়ন্তি ত এবাঽত্র গৃহাশ্রমে মোক্ষমিব সুখমনুভবন্তি ॥

ঋগ্বেদভাষ্যভাবার্থ ৩.৫৭.৫

অর্থাৎ, যদি প্রসন্নভাবে বিবাহ করেছে এমন স্ত্রী-পুরুষ বিদ্যা, বুদ্ধি এবং উত্তম বাণীযুক্ত হয়ে, এই সংসারে গৃহাশ্রমে স্থিত হয়ে প্রেমের মাধ্যমে সন্তানাদি উৎপন্ন করে, পালন করে এবং উত্তম শিক্ষাতে নিযুক্ত করে এবং তাদের স্বয়ম্বর বিবাহ করিয়ে নিবাস করায়, তবে তারা এই গৃহাশ্রমে মোক্ষের সদৃশ সুখের অনুভব করে।

হে স্ত্রীপুরুষা ! যূয়ং যদি রজন্যাশ্চতুর্থে প্রহর উত্থায় কৃতাঽবশ্যকা যানৈঃ পদ্ভ্যাং চ সূর্য্যোদয়াৎ প্রাক্ছুদ্ধবায়ুদেশে ভ্রমণং কুর্য্যুস্তর্হি যুষ্মান্ রোগা কদাচিন্নাগচ্ছেয়ুর্যেন বলিষ্ঠা ভূত্বা দীর্ঘায়ুষস্সন্তোঽস্মিন্ গৃহাশ্রমে পুষ্কলমানন্দং ভুঙ্ধ্বম্ ॥

ঋগ্বেদভাষ্যভাবার্থ ৪.১.১৪

অর্থাৎ, হে স্ত্রী-পুরুষগণ! আপনারা যদি রাত্রির চতুর্থ প্রহরে উঠে এবং আবশ্যক কৃত্য করে বাহন বা পদব্রজে সূর্যোদয়ের পূর্বে শুদ্ধ বায়ুযুক্ত দেশে, স্থানে ভ্রমণ করেন তাহলে আপনাদেরকে কখনও রোগ হবে না; যার ফলে বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘায়ু হয়ে এই গৃহাশ্রমে থেকে উত্তম আনন্দ ভোগ করবেন।

সদা স্ত্রীপুরুষাবৃতুগামিনৌ ভবেতাং সর্বদা শরীরস্যারোগ্যং পুষ্টিং চ সম্পাদয়েতাং বিদ্যোন্নতিঞ্চ বিধায়াঽঽনন্দমুন্নয়তামিতি ॥

ঋগ্বেদভাষ্যভাবার্থ ৫.৭৫.৯

অর্থাৎ, সর্বদা স্ত্রী-পুরুষ ঋতুগামী হবে, সদা শরীরে আরোগ্য এবং পুষ্টি বৃদ্ধি করবে তথা বিদ্যার উন্নতি করে আনন্দের উন্নতি করবে।

কৃতবিবাহাঃ স্ত্রীপুরুষাঃ প্রাতর্মধ্যসায়ংসময়েষ্বহর্নিশং কল্যাণকরৈঃ কর্ম্মভিঃ সুখানি প্রাপ্নুবন্তু কদাচিদালস্যং মা কুর্বন্তু ॥

ঋগ্বেদভাষ্যভাবার্থ ৫.৭৬.৩

অর্থাৎ, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ প্রাত, মধ্যাহ্ন, সায়ংকালে দিবারাত্র কল্যাণকারী কর্মের দ্বারা সুখ লাভ করবে, কখনও আলস্য করবেনা।

যত্র স্ত্রীপুরুষৌ কৃতবুদ্ধী পুরুষার্থিনৌ সৎকর্মণ্যাচরতস্তত্র সর্বা শ্রীর্বিরাজতে ॥

ঋগ্বেদভাষ্যভাবার্থ ৭.৩৯.১

অর্থাৎ, যেখানে স্ত্রী-পুরুষ বুদ্ধিমান এবং পুরুষার্থী হয়ে সৎকর্মের আচরণ করে, সেখানে সর্ব শ্রী বিরাজমান হয়।

অস্মিন্ সংসারে তুল্যগুণকর্মস্বভাবৌ স্ত্রীপুরুষৌ সূর্যবৎসৎকীর্তিপ্রকাশমানৌ পুরুষার্থিনৌ ভূত্বা ধর্মেণৈশ্বর্যং সততং সঞ্চিনুতাম্॥

যজুর্বেদভাষ্যভাবার্থ ২০.৫৫

অর্থাৎ, এই সংসারে সমতুল্য গুণ - কর্ম -স্বভাবযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ সূর্যের মতো কীর্তির দ্বারা প্রকাশমান এবং পুরুষার্থী হয়ে ধর্মপথে নিরন্তর ঐশ্বর্য লাভ করে।

সদুৎসাহবর্দ্ধকেষু কার্য্যেষু গৃহাশ্রমমাচরন্ত্যঃ স্ত্রিয়ঃ স্বসখিস্ত্রীজনান্ গৃহাশ্রমমিণঃ পুরুষা বা স্বেষ্টমিত্রবন্ধুজনাদীনাহূয় যথায়োগ্যং সৎকারেণ ভোজনাদিনা প্রসাদয়েয়ুরন্যোন্যমুপদেশং শাস্ত্রার্থং বিদ্যাবাগ্বিলাসং চ কুর্য্যুঃ॥

যজুর্বেদভাষ্যভাবার্থ ৮.১৩

অর্থাৎ, সদুৎসাহ বৃদ্ধিকারক কাজে গৃহাশ্রমের আচরণ করা স্ত্রীগণ নিজের বান্ধবীগণকে তথা গৃহাশ্রমী পুরুষ নিজের ইষ্ট-মিত্র এবং বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে ভোজন আদির দ্বারা যথাযোগ্য সৎকার করে প্রসন্ন করবে এবং পরস্পর উপদেশ, শাস্ত্রার্থ তথা বিদ্যা-বাগ-বিলাস করবে।

গৃহস্থৈঃ সততং যথোচিতসময়ে গৃহাশ্রমে স্থিত্বা সদ্গুণকর্ম্মধারণমৈশ্বর্য্যোন্নতিরক্ষণে প্রজাপালনম্, সুপাত্রেভ্যো দানম্, দুঃখিনাং দুঃখচ্ছেদনম্, শত্রুবিজয়ঃ, শরীরাত্মবলব্যাপ্তিশ্চ ধার্য্যা॥

যজুর্বেদভাষ্যভাবার্থ ৮.১৭

অর্থাৎ, গৃহস্থগণের উচিত যথাযোগ্য রীতিতে গৃহাশ্রমে থেকে উত্তম গুণ-কর্ম ধারণ, ঐশ্বর্যের উন্নতি তথা রক্ষা, প্রজাপালন, সুপাত্রদের দান, দুঃখীগণের দুঃখ থেকে মুক্তি, শত্রুজয় এবং শরীরাত্মবল প্রবৃত্তি ইত্যাদি নিরন্তর ধারণ করবে।

নহি কেনচিৎ মনুষ্যেণ কিল ব্রহ্মচর্য্যসুশিক্ষাবিদ্যাশরীরাত্মবলারোগ্যপুরুষার্থৈশ্বর্য্যসজ্জন-সঙ্গালস্যত্যাগয়মনিয়মসেবনসুসহায়ৈর্বিনা গৃহাশ্রমো ধর্ত্তুং শক্যঃ। নহ্যেতেন বিনা ধর্মার্থকামমোক্ষসিদ্ধির্ভবিতুং যোগ্যা, তস্মাদয়ং সর্বৈঃ প্রয়ত্নেন সেবিতব্যঃ॥

যজুর্বেদভাষ্যভাবার্থ ৮.৩১

অর্থাৎ, এই কথা নিশ্চিত যে, ব্রহ্মাচর্য, উত্তম শিক্ষা, বিদ্যা, শরীর এবং আত্মার বল, আরোগ্য, পুরুষার্থ ঐশ্বর্য, সজ্জনদের সঙ্গ, আলস্যের ত্যাগ, যম-নিয়মের অভ্যাস এবং উত্তম সহায় ছাড়া কোনো মানুষের গৃহাশ্রম ধারণ করা সম্ভব নয়। এঁদের ছাড়া ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের সিদ্ধি হতে পারে না। এজন্য এসবের পালন সবাইকে খুব যত্নের সাথে করা উচিৎ।"ম

যথেহ সূর্য্যকিরণাঃ সর্বত্র প্রসৃতাঃ প্রকাশন্তে, তথা রাজপ্রজাসভাজনাশ্শুভগুণ- কর্মস্বভাবেষু প্রকাশমানাস্সন্তু। কুতো নহি মনুষ্যশরীরং প্রাপ্য কস্যচিদুৎসাহপুরুষার্থসৎপুরুষসঙ্গয়োগাভ্যাসাচরিতস্য জনস্য ধর্ম্মার্থকামমোক্ষসিদ্ধিঃ শরীরাত্মসমাজোন্নতিশ্চ দুর্লভাস্তি, তস্মাৎ সর্বৈরালস্যং ত্যক্ত্বা নিত্যং প্রয়তিতব্যম্॥

যজুর্বেদভাষ্যভাবার্থ ১১.৪০

অর্থাৎ, বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের উচিৎ যেভাবে সূর্য তাঁর নিজের প্রকাশের দ্বারা সব জগৎকে প্রকাশিত করে, তেমনই নিজেদের সুন্দর বস্ত্র এবং আভূষণের দ্বারা শোভায়মান হয়ে ঘর ইত্যাদি বস্তুগ সদা পবিত্র রাখে ।

ব্রহ্মচর্য্যেণাধীতবিদ্যৌ কৃতবিবাহৌ স্ত্রীপুরুষৌ বহুশ্রুতৌ ভবেতাম্। নহ্যাপ্তানাং সকাশাচ্ছ্রবণেন বিনা পঠিতাপি বিদ্যা ফলবতী জায়তে। তস্মাৎ সদা শ্রুত্বা সত্যং ধরেতামসত্যং ত্যজেতাম্॥

যজুর্বেদভাষ্যভাবার্থ ১৩.৫৭

অর্থাৎ, বিবাহের সময় স্ত্রী-পুরুষের উচিৎ যে তাঁরা যেন বহুশ্রুত হয়। সত্যবক্তা, আপ্তজনগণের কাছ থেকে শুনে বিনা পঠিত বিদ্যা ফলদায়ক হয়না। এইজন্য সদৈব সজ্জনগণের উপদেশ শুনে সত্য চিন্তা ধারণ করা এবং মিথ্যাকে ত্যাগ করা উচিৎ।

স্ত্রীপুরুষৌ স্বয়ংবরং বিবাহং বিধায়াতিপ্রেম্শা পরস্পরং প্রাণপ্রিয়াচরণং শাস্ত্রশ্রবণমোষধ্যাদিসেবনং কৃত্বা যজ্ঞাদ্ বৃষ্টিং চ কারয়েতাম্॥

যজুর্বেদভাষ্যভাবার্থ ১৪.৮

অর্থাৎ, স্ত্রী-পুরুষগণের উচিৎ যে স্বয়ম্বর বিবাহ করে অতি প্রেমের সাথে পরস্পরের মধ্যে প্রাণের সমান যেন প্রিয় আচরণ, শাস্ত্র-শ্রবণ এবং ওষধি আদি গ্রহণ করে এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে যেন বর্ষা করায়।

উক্ত উদ্ধৃতিগুলোর দ্বারা পতি-পত্নীর নিম্ন কর্তব্যের উপর আলোকপাত হয়- শ্রেষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন করে তাঁদের যথোচিত পালন, শিক্ষণ করে স্বয়ম্বর বিবাহ করিয়ে তাঁদেরকে কার্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা, দুষ্ট আচরণের ত্যাগ, সদাচরণে প্রবৃত্তি, বিদ্যার উন্নতি, আলস্যের ত্যাগ, পুরুষার্থ, শিল্প-বিষয়ক উন্নতি, প্রাতঃভ্রমণ আদি আরোগ্যকারক

উপায় ধারণ করা, ঋতুগামিতা, ধর্মের দ্বারা ঐশ্বর্যোপার্জন, অতিথি-সৎকার, সৎপাত্রকে দান, দীন-দুঃখীদেরকে সহায়তা, বিজয়, শারীরিক-আত্মিক বলের বৃদ্ধি, জিতেন্দ্রিয়তা, সজ্জন-সঙ্গ, যম-নিয়মের পালন, পবিত্রতা, ব্যভিচার ত্যাগ, বহুশ্রুততা, যজ্ঞানুষ্ঠান।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

পঞ্চমহাযজ্ঞের তাৎপর্য - বেদে এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা

পঞ্চমহাযজ্ঞ হলো মনুষ্যজীবনের পাঁচটি কর্ম, যার দ্বারা মানুষ উত্তম সুখলাভ করে এবং মোক্ষলাভের পন্থা অনুসরণ করা। এখন পঞ্চমহাযজ্ঞ অর্থাৎ যে যে কর্মগুলো মানুষের প্রতিদিন অবশ্য কর্তব্য, সেই বিষয়ের বিধান সংক্ষেপে লেখা হচ্ছে।

● এই পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে প্রথম হলো ব্রহ্মযজ্ঞ :-

ব্রহ্মযজ্ঞ সাধন করতে হলে, সমস্ত অঙ্গের সাথে বেদশাস্ত্রের পঠন-পাঠন তথা সন্ধ্যোপাসনা অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ঈশ্বরের স্তুতি প্রার্থনা ও উপাসনা- মানুষ মাত্রেরই করা কর্তব্য। পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি, সেখানে দেখে নিবেন। সন্ধ্যোপাসনা ও অগ্নিহোত্রের মত বিষয়ের বিধান যেভাবে আমি (অর্থাৎ স্বামীজী) মৎকৃত পঞ্চমহাযজ্ঞ বিধি নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছি সেভাবে জানবেন। যাইহোক, আমি এখানেও ব্রহ্মযজ্ঞ ও অগ্নিহোত্রের মত বিষয়ে আরও কিছু বৈদিক প্রমাণ উদ্ধৃত করছি। যেমন:-

◆ সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্।

আস্মিন্ হব্যা জুহোতন◆

(যজুর্বেদ ৩/১)

অর্থাৎ হে মনুষ্যগণ! তোমরা বায়ু, ঔষধি ও বর্ষার জলের শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা সকলের কল্যাণে ঘি এর মত শুদ্ধ বস্তু ও সমিধা অর্থাৎ আম ও পলাশের মত কাঠ দ্বারা, অতিথি রূপে অগ্নিকে নিয়মিত প্রকাশিত কর (করতে থাক-অনুবাদক) এবং সেই অগ্নিতে হোমের উপযোগী পুষ্টিকারক, মধুর ও সুগন্ধিযুক্ত, দুধ, ঘি, শর্করা, গুড়, কেশর, মৃগনাভী, রোগনাশক যেমন গুরুচী ও সোমলতার মত শুদ্ধ পদার্থ দিয়ে ভালোভাবে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করে সকলের উপকার সাধন কর।

◆অগ্নিং দূতং পুরো দধে হব্যবাহমুপ ব্রুবে।

দেবাং আ সাদয়াদিহ◆

(যজুর্বেদ ২২/১৭)

অগ্নিহোত্রকারী মানুষ এরকম ইচ্ছা করবেন যে,

আমি সকল প্রাণীর কল্যাণকারী পদার্থকে পরম উচ্চ মেঘমণ্ডলে পৌঁছে দেবার জন্য, অগ্নিকে দূতরূপ সেবকের মত নিজের সামনে স্থাপন করছি, যেহেতু এই অগ্নি হব্য। অর্থাৎ হবনীয় যোগ্য বস্তুগুলোকে, দেশান্তরে পৌঁছে দেয়, এজন্য একে 'হব্যবাট্' বলে। যে এই অগ্নিহোত্র বিষয় জানতে ইচ্ছা করেন, আমি তাকে এমন উপদেশ করি যে, তিনি বায়ু ও বর্ষার জলের শুদ্ধির জন্য, ভৌতিক অগ্নিতে অগ্নিহোত্র বা হোম করে, তা সংসারে শ্রেষ্ঠ গুণ সকলকে পৌঁছে দিন।

(অর্থাৎ সংসারের কল্যাণে হোম করে বায়ু ও বৃষ্টির জলের শুদ্ধি সম্পাদন করে, সংসারের কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকুন) ।

উপরে উল্লেখিত মন্ত্রের আর এক প্রকার অর্থ হয়, তাও এখানে প্রকাশ করছি যেমন: প্রত্যেক প্রাণী সত্য উপদেশক অগ্নি নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ (অর্থাৎ হে অগ্নি নামধারী) পরমেশ্বর। আমি আপনাকে স্বেচ্ছায় উপাসনা করার যোগ্য মনে করে থাকি (অর্থাৎ অভিলাষ করি) হে পরমেশ্বর, আপনি এমন কৃপা করুন যে, আপনাকে যারা জানতে ইচ্ছা করেন, তাদেরকে আমি যেন শুভগুণযুক্ত বিশেষ জ্ঞানদায়ক উপদেশ করি (অর্থাৎ করতে সক্ষম হই), আপনিও কৃপা করে এই সংসারে প্রত্যেক প্রাণীকে শ্রেষ্ঠগুণসমূহ প্রাপ্ত করান।

◆সায়ংসায়ং গৃহপতির্নো অগ্নিঃ প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনস্য দাতা।

বসোর্বসোর্বসুদান এধি বয়ং ত্বেন্ধানাস্তন্বং পুষেম◆

(অথর্ববেদ - ১৯/৭/৩)

অর্থাৎ,

প্রতিদিন ভোরে ও সন্ধ্যার সময়, শ্রেষ্ঠ উপাসকের উপযুক্ত যেমন গৃহ ও আত্মার রক্ষক স্বরূপ ভৌতিকাগ্নি তথা পরমেশ্বররূপী উভয় প্রকার অগ্নিই পরিচালিত অর্থাৎ সর্বত্র সুগন্ধীকৃত করে ও উত্তমরূপে উপাসিত হয়ে, (ভৌতিকাগ্নি গৃহ ও বাহ্য পদার্থের রক্ষক ও কতক পরিমাণে আত্মার ও রক্ষক হয়ে থাকে, কারণ শরীরের আরোগ্যের সাথে কিছুটা আত্মারও সম্বন্ধ আছে, যদিও ভৌতিকাগ্নি বিশেষরূপে সব স্থান সুবাসিত করে থাকে, কিন্তু পরমেশ্বর রূপী অগ্নি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও উপাসনার যোগ্য এবং জীবাত্মার রক্ষকস্বরূপ জানবে-অনুবাদক) যেমন আরোগ্য ও আনন্দ দান করেন, তেমন (বসোর্বসো) আমরা ও রাজ্যের মত শ্রেষ্ঠ পদার্থ সকলের প্রদাতা বলে

(তিনিই বসুদানঃ) প্রসিদ্ধ ও সর্বৈশ্বর্য্যদাতা স্বরূপ হন। হে পরমেশ্বর, আপনি সর্বেশ্বর্য্যপ্রদ, আপনি আমাদের রাজ্য ব্যবহার বিষয়ে ও হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত হন। উপরে উল্লেখিত মন্ত্রে অগ্নিহোত্র করবার জন্য ভৌতিক অগ্নিরও গ্রহণ করা কর্তব্য। (বয়ং ত্বে০) হে পরমেশ্বর। যেরূপ আমি আপনাকে পূর্বে যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে উপাসনা করে নিজ শরীরের পুষ্টিসাধন করে থাকি, তেমন অগ্নিহোত্রের মত কর্ম দ্বারা ও ভৌতিকামিকে প্রজ্জ্বলিত করে সংসারের এবং নিজ দেহের পুষ্টিসাধন করে থাকি।

◆ প্রাতঃপ্রাতগৃহপতির্নো অগ্নিঃ সায়ংসায়ং সৌমনস্য দাতা।

বসোর্বসোর্বসুদান এধীন্ধানাত্বা শতহিমা ঋধেম◆

(অথর্ববেদ - ১৯/৭/৪)

(প্রাতঃ গৃহপতির্নো ইত্যাদি) এটার অর্থ পূর্ব্ব বৎ, কিন্তু এই মন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, অগ্নিহোত্র ও ঈশ্বরের উপাসনা করতে করতে আমরা যেন (শতহিমাঃ) শত হেমন্ত ঋতু বয়ে যাওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ শত বর্ষ পর্যন্ত যা মানুষের পূর্ণ আয়ু-অনুবাদক) ধনের মত পদার্থর দ্বারা (সহিত) (ঋষৈম) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই।

● দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ :

অগ্নিহোত্র করবার জন্য তামাপাত্র বা মাটির বেদী প্রস্তুত করে কাঠ, রুপা ও সোনা-নির্মিত চমস অর্থাৎ অগ্নিতে সুগন্ধযুক্ত পদার্থ ও ঘি ঢালবার হাতা ও আজ্যস্থালি অর্থাৎ ঘি রাখবার পাত্র নিয়ে বেদীতে হোমার্থ পলাশ ও আমের মত বৃক্ষের সমিধা স্থাপন করে, তাতে কপূর ইত্যাদি দিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করতে, পুর্বে উল্লেখিত পদার্থ দিয়ে, ভোর এবং সন্ধ্যাবেলা অথবা তেমনভাবে শুধুমাত্র ভোরে নিত্য হোম করবে, (অর্থাৎ করা কর্তব্য-অনুবাদক)।

অথাগ্নিহোত্রে হোমকরণমন্ত্রা:-

সূর্য়ো জ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য়ঃ স্বাহা

অর্থ- যিনি চরাচরের প্রকাশস্বরূপ, যিনি আত্মা ও সূর্য্যাদি প্রকাশরূপ লোক সকলেরও প্রকাশক, যিনি সকলের প্রাণস্বরূপ, তাঁর (অর্থাৎ এমন সর্বপ্রকাশক পরমাত্মার-অনুবাদক) স্বার্থে অর্থাৎ আজ্ঞা পালন ও প্রসন্নতার নিমিত্ত, সমস্ত জগতের উপকারের জন্য একাহুতি প্রদান অর্থাৎ আমরা হোম করছি

সূর্য়ো বর্চো জ্যোতির্বচঃ স্বাহা

অর্থ- সূর্য, যাঁকে পরমেশ্বর বলা হয়, তিনি আমাদের সকল প্রকার বিদ্যাপ্রদাতা, সেই সূর্য্যরূপী পরমেশ্বর সর্ব্ববিৎ ও জ্ঞানবান্। তিনি সকল

জ্ঞানীপুরুষদের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে সত্যোপদেষ্টা (হয়ে থাকেন-অনুবাদক), এরকম সর্বাত্মা পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য ও তাঁর অনুগ্রহ বলেই, আমরা অগ্নিহোত্র করছি।

জ্যোতিঃ সূর্য়ঃ সূর্য়ো জ্যোতিঃ স্বাহা

অর্থ- যিনি স্বয়ং প্রকাশমান্ ও সমগ্র জগৎ বা সংসারের প্রকাশকারী, এইরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার প্রসন্নতার জন্য আমরা হোম করছি।

সজূর্দেবেন সবিত্রা সজূরুষসেন্দ্রবত্যা। জুষাণঃ সূর্য়ো বেতু স্বাহা।

অর্থ- যে পরমেশ্বর সূর্য্যাদিলোকে ব্যাপ্ত এবং বায়ু ও দিবসের সাথে ব্যাপ্ত থেকে সংসারের পরম কল্যাণকারক হয়ে থাকেন, তাঁকে আমরা জানি এবং তিনি যেন আমাদের কৃত (প্রদত্ত) হোম গ্রহণ করেন। উপরোক্ত মন্ত্র পাঠ করে চারটি আহুতি প্রদান দ্বারা ভোরেবেলায় অগ্নিহোত্রীগণ হোম করে থাকেন।

ইতি প্রাতঃকালমন্ত্রাঃ

🔻এখন সন্ধ্যাকালে অগ্নিহোত্র করার মন্ত্র বর্ণনা করছি 🔻

যথাঃ

অগ্নিজ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা।

অর্থাৎ অগ্নি যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর, (অগ্নি শব্দ "অঞ্চ" ধাতু হতে উৎপন্ন হয়েছে, যার অর্থ জ্ঞান, গতি ও পুজনীয়, অর্থাৎ সেই অগ্নি নামক পরমেশ্বর যিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানপ্রদ তথা যিনি জ্যোতিস্মান্দিগেরও জ্যোতিঃস্বরূপ ও যিনি সকলের পতি তাকেই অগ্নি বলা হয়-পুনঃ অগ্নি শব্দে ভৌতিকাগ্নিও বুঝায়- অনুবাদক)। এইরূপ অগ্নিরূপী পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে অর্থাৎ তাঁর প্রীত্যর্থে আমরা পরোপকার করার জন্য হোম করছি এবং উক্ত জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বররূপী অগ্নির রচিত ভৌতিকাগ্নিতে সুগন্ধীযুক্ত ও পুষ্টিকারক হবনীয় পদার্থ অর্পণ করলে, উক্ত অগ্নি ঔ পদার্থ সকলকে পরমাণুতে পরিগণিত করে, বায়ু ও বর্ষার জলের সাথে মিশ্রিত হয়ে, উক্ত পদার্থদ্বয়কে শুদ্ধ করে দেয়, যা দ্বারা এই সংসারে সুখ ও আরোগ্যতা বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

অগ্নির্বচো জ্যোতির্বচ স্বাহা

অর্থাৎ অগ্নিরূপী পরমেশ্বর (বর্জ্য) অর্থাৎ সকল প্রকার বিদ্যার প্রদাতা এবং ভৌতিকাগাগ্নিও আরোগ্যতা ও বুদ্ধির বৃদ্ধিকারক হয়ে থাকে। এজন্য আমরা হোম দ্বারা পরমেশ্বরের প্রার্থনা করছি। এইটা দ্বিতীয় আহুতির মন্ত্র (মহর্ষি শ্রীস্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়, তৎকৃত পঞ্চমহাযজ্ঞ বিধি নামক পুস্তকে এই মন্ত্রের আর এক প্রকার অর্থ প্রকাশ করেছেন, যা আমি ভাষ্যের সাথে বর্ণনা এই করছি যথা:- "জ্ঞানপ্রদশ্চ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ পরমেশ্বরোৎস্তি তস্মৈ। (অগ্নিবচ্চো) য়ঃ পূর্বোক্তোমিরনন্তবিদ্য আত্মপ্রকাশক। সর্বপদার্থ প্রকাশকশ্চ সূর্য্যাদি দ্যোতকোৎস্তি তস্মৈ" অর্থাৎ যিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্যোতিষ্মানন্দগেরও জ্যোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বর, তাঁরই প্রীত্যরর্থে আমরা আহুতি প্রদান করছি। যিনি অনন্তবিদ আত্মা - ও সকল পদার্থের প্রকাশক সূর্য্যাদি লোকেরও দ্যোতক তাঁরই

অগ্নিজ্যোতি রিতি মন্ত্রং মনসোচ্চার্য্য তৃতীয়াহুতির্দেয়া

তৃতীয় আহুতি প্রদানকালে প্রথম মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করে, ঐ তৃতীয়াহুতি প্রদান করতে হয়।

সজুর্দেবেন সবিত্রা সজু রাত্র্যেন্দ্রবত্যা। জুষাণো অগ্নির্বেতু স্বাহা

অর্থাৎ যে অগ্নি পরমেশ্বর সূর্য্যাদি লোকে ব্যাপ্ত (প্রকাশমান) রয়েছেন, যিনি ইন্দ্রবতী অর্থাৎ বায়ু ও চন্দ্রযুক্ত রাত্রিতে বর্তমান আছেন, এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা সম্প্রীত হয়ে, আমাদেরকে নিজকৃপায় নিত্যানন্দ বা মোক্ষসুখ প্রদান করেন। সেই পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থেই আমরা আহুতি প্রদান করছি, (এই সকল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সন্ধ্যাবেলাঅগ্নিহোত্র করিবে-অনুবাদক)

যজুর্বেদ ৩/৯-১০

অথোভয়োঃ কালয়োগ্নিহোত্রে হোমকরণার্থাঃ সমানমন্ত্রা:-

ওঁম্ ভূরগ্নয়ে প্রাণায় স্বাহা

অর্থাৎ যিনি প্রাণস্বরূপ এবং সমস্ত জগতের প্রাণীগনের জীবন দাতা, যিনি প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম, যিনি অগ্নি অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ও প্রাণস্বরূপ, তাঁরই প্রীত্যর্থে আমরা হোম করছি।

ওঽম্ ভূবর্বায়বেঽপানায় স্বাহা

অর্থাৎ যিনি মুমুক্ষু, মুক্ত, স্বসেবক ও সকল ধর্মাত্মাদের দুঃখনাশক দয়ালু ঈশ্বর, এবং যিনি বায়ু অর্থাৎ অনন্ত বলশালী, তাঁরই প্রীতির জন্য আমরা হোম করছি।

ওঽম্ স্বরাদিত্যায় ব্যানায় স্বাহা

অর্থাৎ যিনি সর্ব বৃহৎ ব্রহ্ম তাঁরই প্রীতির জন্য আমরা হোম করছি

ওঽম্ ভূর্ভুবঃ স্বরগ্নিবায়াদিত্যেভ্যঃ প্রাণাপানব্যানেভ্যঃ স্বাহা

অর্থাৎ যিনি ভূর্ভুবঃ ও স্বঃ স্বরূপ অর্থাৎ যিনি অগ্নি বায়ু ও আদিত্য স্বরূপ ও যিনি প্রাণ, অপান ও ব্যান স্বরূপ পরমাত্মা, আমরা তাঁরই প্রীত্যর্থে অগ্নিহোত্র করছি।

ওঽম্ আপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোং স্বাহা

অর্থাৎ যিনি সর্বব্যাপক স্বপ্রকাশ রস অর্থাৎ নিত্যানন্দ ও মোক্ষরূপ ব্রহ্ম ও যিনি ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বরূপ তাঁরই প্রীত্যর্থে আমরা হোম করছি।

ওঽম্ সর্ব্বং বৈ পূর্ণং স্বাহা

হে জগদীশ্বর আমরা পরোপকারারের জন্য যে সমস্ত কার্য করছি আপনার কৃপায় আমাদের সেই সকল কার্য পরোপকারে পর্যাপ্ত হোক।

ইতি সর্ব্বে মন্ত্রান্তৈত্তিরীয়োপনিষদাশয়ৈনৈকীকৃতাঃ।

প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যোপাসনার পর যদি পূর্ববর্ণিত মন্ত্রগুলোর থেকে বেশী হোম করার ইচ্ছা হয়, তবে 'স্বাহা' শব্দ মন্ত্রের শেষে পাঠ বা উচ্চারণ করে, গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা হবন করা কর্তব্য। অগ্নিহোত্র এই শব্দ এইজন্য প্রয়োগ হয় যে, অগ্নি বা পরমেশ্বরের জন্য (অর্থাৎ প্রীত্যর্থে) বর্ষার জল ও বায়ুর শুদ্ধি জন্য তথা ঈশ্বরাজ্ঞা পালনের জন্য, যে হোমাদি কার্য করা হয় তাকেই অগ্নিহোত্র বলে, যেহেতু কেশর, কস্তুরী ইত্যাদি সুগন্ধীযুক্ত দ্রব্য, তথা ঘি দুধ ইত্যাদি পুষ্টিকারক পদার্থ, তথা গুড় ওশর্করাদি মিষ্ট ও বলবুদ্ধি ও ধৈর্য্যতা বর্দ্ধক ইত্যাদি শুভগুণযুক্ত দ্রব্যাদি

নিয়ে হোম বা হবন করলে, বায়ু ও বর্ষার জল শুদ্ধ হয়ে থাকে এবং এজন্য পৃথিবীতে জন্ম সকল পদার্থের উত্তমতা সম্পাদন করিয়ে দেয়, এজন্য অগ্নিহোত্র সম্পাদন করলে লোকে অত্যন্ত সুখলাভ করতে সমর্থ হন। উপরোক্ত হবনকারী বেদোপযোগী ঈশ্বরাজ্ঞা পালন করে থাকেন, অতএব এইরূপ লাভ প্রাপ্তির জন্য সকলেরই যথাসময় অগ্নিহোত্র করা কর্তব্য।

ইতি অগ্নিহোত্র বিধি সমাপ্ত

● তৃতীয় পিতৃযজ্ঞ :-

এখন তৃতীয় পিত্যজ্ঞ দুই প্রকার-প্রথম তর্পণ ও দ্বিতীয় শ্রাদ্ধ। যে কর্ম দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তি, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন হয়, তাকেই তর্পণ বলে। আর যে কর্ম দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তি, সকল ঋষিগণ এবং পিতৃগণের শ্রদ্ধাপূর্বক সেবা করা যায়, তাকেই শ্রাদ্ধ বলে। জীবিত ও প্রত্যক্ষ বিদ্বান, ঋষিও পিতৃগণের সেবা করবে। মৃত বিদ্বান, ঋষি অথবা পিতৃগণের তর্পণ বা শ্রাদ্ধ করা কখনই বিধেয় বা যুক্তিযুক্ত নয়। বলতে কি তাঁদের সন্নিকর্ষের অভাবের কারণে তাঁদের সেবা কখনো সম্ভব হতে পারে না। বিশেষতঃ মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি যা কিছু কার্য করা যায়, সেইসকল মৃত ব্যক্তির অপ্রাপ্তির কারণে নিষ্ফল হয়ে থাকে। অতএব শ্রাদ্ধ ও তর্পণ জীবিত এবং প্রত্যক্ষ বিদ্বান, ঋষি ও পিতৃগণের তৃপ্তি এবং সেবার জন্যই বেদে উপদিষ্ট হয়েছে। বিশেষতঃ সেবা করার উপযুক্ত পাত্র এবং সেবকও প্রত্যক্ষ থাকায় এমন কার্যই সম্ভব হয়ে থাকে, অর্থাৎ সেব্য ও সেবকের সন্নিকর্ষ থাকলেই শ্রাদ্ধ ও তর্পণ সম্ভব হতে পারে, নায়তো অন্যভাবে কখনোই সম্ভব হতে পারে না। দেব অর্থাৎ বিদ্বানগণ, ঋষিগণ এবং পিতৃগণই সৎকার যোগ্য এবং এঁদেরই সেবা করা কর্তব্য। এখন দেব, ঋষি ও পিতর কাকে বলে, সেই বিষয় প্রমাণ লিখছি যথা:-

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ। পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মা

যজুর্বেদ ১৯/৩৯

অর্থাৎ হে জাতবেদ পরমেশ্বর। আপনি আমাকে সর্বপ্রকারে পবিত্র করুন, এবং যে সকল নিষ্ঠাবান উপাসক আপনার আজ্ঞা পালন করুন, (দেবজনাঃ) অথবা যাঁরা বিদ্বান ও জ্ঞানীপুরুষ বলে কথিত হন, তাদের বিদ্যাদান দ্বারা আমাকে (পুনন্ত) পবিত্র করুন। তথা (পুনন্ত্র মনসা) আপনার প্রদত্ত বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান ও সেই

বিষয়ে ধ্যান দ্বারা আমার (আমাদের) বুদ্ধি সকল পবিত্র হোক। (পুনন্ত বিশ্বা ভূতানি) আপনার কৃপা বলে সংসারস্থ প্রাণীরাই পবিত্র ও আনন্দযুক্ত হয়ে আমাদেরও সুখ ও আনন্দদায়ক হোক।

দ্বয়ং বা ইদং ন তৃতীয়মস্তি। সত্যং চৈবানৃতং চ সত্যমেব দেবা অনৃতং মনুষ্যা ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমীতি তন্মনুষ্যেভ্যো দেবানুপৈতি। স বৈ সত্যমেব বদেৎ। এতদ্ধ বৈ দেবা ব্রতং চরন্তি যৎসত্যম্। তস্মাৎ তে য়শো য়শো হ ভবতি য় এবং বিদ্বান্ সত্যং বদতি

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১/১/১/৪-৫)

দুই প্রকার লক্ষণ অনুসারে মানুষকে দুই প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া যায় যথা: দেব ও মনুষ্য। সত্য ও মিথ্যা গুণকর্মস্বভাবের কারণে মানুষকে ঐ দুই ভাগে বিভাগ করা হয়েছে। (সত্যমেব) যাঁরা সত্যকারী, সত্যবাদী ও সত্যমানী তাদেরকেই দেব, এবং যারা মিথ্যাবাদী মিথ্যামানী ও মিথ্যাচারী অর্থাৎ যারা সর্বদা মিথ্যাকার্যের অনুষ্ঠানে রত থাকেন, তাদেরকেই মানুষ বলা হয়। (মিথ্যা পরিত্যাগ পূর্বক যিনি সত্যেরই সেবা করেন, তিনি দেবজাতির মধ্যে পরিগণিত, আর যিনি সত্য পরিত্যাগ করে মিথ্যার সেবন করেন, তিনিই মানুষ বলে গণ্য হন-অনুবাদক)। এজন্য মিথ্যা পরিত্যাগ করে সত্যকে প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ সত্যাচরণে রত থাকা সকলেরই কর্তব্য। অতএব বুদ্ধিমানেরা নিরন্তর সত্যেরই অবলম্বন করে থাকেন যেহেতু দেবগণই সত্যব্রত আচরণ করে কীর্তিমান্ বা যশস্বীগণের মধ্যেও কীর্তিমান্ অর্থাৎ যশোভাগী হয়ে সদা আনন্দে অবস্থিতি করেন। কিন্তু তার বিপরীত আচরণকারী মানুষেরা দুঃখ প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা পীড়িত বা দুঃখিত থাকেন।

বিদ্বাংসো হি দেবাঃ

(শতপথ ব্রাহ্মণ ৩/৭/৬/১৯)

এই কারণেই বিদ্বানদেরকেই দেবতা বলা হয়

অথর্ষিপ্রমানম :-

তং য়জ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষণ্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ। তেন দেবা অয়জন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ য়ে

(যজুর্বেদ ৩৭/৯)

মন্ত্রটি ঋষিদের প্রমাণ বিষয়ে লিখিত হয়েছে, কিন্তু এর ভাষ্য ও ভাবার্থ পূর্বে সৃষ্টি বিদ্যা বিষয়ে বর্ণন করেছি, এজন্য এখানে পুনরায় উল্লেখ করলাম না, সেখানে দেখে নিবেন

অথ য়দেবানুব্রুবীত। তেনর্ষিভ্য ঋণং জায়তে তদ্ধ্যেভ্য এতৎ করোত্যৃষীণাং নিধিগোপ ইতি হ্যনুচানমাহুঃ

(শতপথ ব্রাহ্মণ ১/৭/৫)

পুনশ্চ ঋষি কাকে বলে, তারই প্রমাণ দিতেছেন-

যিনি প্রথমে পূর্ণরূপে সমস্ত বিদ্যা পাঠ করে, (সেই বিষয়ে সমস্ত জ্ঞান লাভ করে-অনুবাদক) অপরকে পাঠ বা সেই বিষয়ে উপদেশ করাকে ঋষিকর্ম বলে, (অর্থাৎ মানুষ পূর্ব বয়সে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালনকালে সমস্ত বিদ্যা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর তিনি যে কার্য করেন, তাকে আর্য্যকর্ম বলে-অনুবাদক) এবং মানুষের ঋষিদের প্রতি যে পরিমাণে ঋণ থাকে, সেই সকল ঐ ঋষিদের সেবা দ্বারা নিবৃত্তি পায়। এজন্য নিত্য ঋষিদের নিকট হতে বিদ্যা গ্রহণ করা ও তাদের সেবা করা অর্থাৎ সেবায় রত থাকা মানুষের কর্তব্য, এবং বিদ্যা দান গ্রহণ ও তার পরিবর্তে ঋষিদের সেবা রূপ কার্য (বিদ্যাদাতা ও গ্রহীতা) উভয়েই আনন্দদায়ক হয়ে থাকে, এবং এরকম ব্যবহারই (নিধিগোপ) বিদ্যাকোষের রক্ষক স্বরূপ বলা হয়।

অথার্ষেয়ং প্রবৃণীতে। ঋষিভ্যশ্চৈবৈনমেতদ্দেবেভ্যশ্চ নিবেদয়ত্যয়ং মহাবীর্যো য়ো য়জ্ঞং প্রাপদিতি তস্মাদার্ষেয়ং প্রবৃণীতে

(শতপথ - ১/৪/৫)

অর্থাৎ যে সকল ঋষি এবং দেবগণ সর্বপ্রকার বিদ্যাধ্যয়ন করে নিজের কার্য করেন, তাদেরকে প্রিয়বস্তু দ্বারা সেবা করে মানুষ বিদ্বান্ ও মহাবীর্য্যশালী হয়ে বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। ঋষিগণ বিদ্যার্থীগণকে সর্ববিদ্যায় বিশারদ করে দেন। বিদ্বান্ ও বিদ্যার্থী এই উভয়কেই ঋষি বলা হয়। অতএব এই আর্যকর্ম অথবা মানুষ মাত্রেরই স্বীকার করা কর্তব্য

এখন পিতৃগণ বিষয়ে বেদ প্রমাণ দেওয়া হচ্ছে। যথা:-

ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতম্।

স্বধা স্থ তপয়ত মে পিতৃন্

(যজুর্বেদ ২/৩৪)

অর্থাৎ ঈশ্বর সকলের প্রতি এমন আজ্ঞা দিয়েছেন যে, হে মনুষ্যগণ! তোমরা পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী ও এ্যতৃবর্গের প্রতি এরূপ আদান প্রদান বা উপদেশ করবে যে, হে পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী এবং ভ্রাতৃবর্গ। তোমরা সকলে আমার মাননীয়

পিতা, পিতামহ, মাতা, মাতামহ ও আচার্য্যগণকে তথা অপরাপর বিদ্বানগণ যারা বয়সে জেষ্ঠ্য ও মান্যের উপযুক্ত, এরূপ জেষ্ঠ ও জ্ঞানী মনুষ্যকে সেবা দ্বারা সর্বদা সন্তুষ্ট কর, অর্থাৎ উত্তমোত্তম সুগন্ধি ও হৃদ্য জল দ্বারা (অমৃতং) অমৃতাত্মক অনেক প্রকার রস ও ঘৃত, (পয়ঃ) দুগ্ধ ও (কীলালং) অনেক প্রকার সংস্কার দ্বারা সম্পাদিত রোগনাশক অন্ন মাক্ষিক মধু (পরিশ্রুতং) ও সুপক্ক ফলাদি দ্বারা পিতা, পিতামহ ও আচার্যদেরকে নিত্য প্রসন্ন করবে, যা দ্বারা তাহারা প্রসন্ন ও তৃপ্ত হইয়া, তোমাদেরকে সত্যবিদ্যা দান করবেন। তোমরাও এভাবে সত্যবিদ্যা প্রাপ্ত হয়ে সদা প্রসন্ন থাকবে। (স্বধা স্থ) তোমরা এরূপ বিনয়ী হয়ে প্রার্থনা করবে যে, পূর্বোক্ত পিতরগণ! আপনারা আমার অমৃতরূপী পদার্থ সকলের ভোগ দ্বারা তৃপ্ত হন, এবং আমরা যে সকল পদার্থ আপনাদেরকে ইচ্ছানুকূল দিতে সমর্থ হই, তা দিতে আজ্ঞা করুন। যেহেতু আমরা শরীর, বচন ও কর্ম দ্বারা দ্বারা আপনাদেরকে সুখী করতে স্থিত (উপস্থিত) আছি, কোন প্রকার কষ্ট পাবেন না। কারণ যেভাবে আপনারা আমাদেরকে ছোটোবেলায় ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম কালে সর্ব প্রকারে সুখী করেছেন, এজন্য তাঁর প্রত্যুপকার করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য, যা দ্বারা আমরা কৃতঘ্নতা রূপ দোষ প্রাপ্ত বা দোষযুক্ত না হই।

আয়ন্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিস্বাত্তাঃ পথিভির্দেবয়ানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রু বন্তু ত্যেঽবন্তুস্মান্

(যজুর্বেদ ১৯/৫৮)

পিতৃ শব্দে সকলের রক্ষক, শ্রেষ্ঠ স্বভাবযুক্ত জ্ঞানী জনকে গ্রহণ করা হয়। কারণ মানুষ সুশিক্ষা ও বিদ্যাবলে যেমন রক্ষা করতে সমর্থ হয়, অন্য কোন উপায় দ্বারা তেমন করতে সমর্থ হয় না। এজন্য যে সকল বিদ্বান পুরুষ মানুষকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান পূর্বক তাঁর অবিদ্যারূপী অন্ধকারের নাশকারী হন, তাঁদেরকে পিতর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এইরূপ পিতরগণের সৎকারের জন্য ঈশ্বরের এইরূপ আজ্ঞা আছে যে, পিতরগণ গৃহীত বাটীতে আসলেই তাঁকে দেখা মাত্রই অভ্যুত্থান অর্থাৎ দণ্ডায়মান হয়ে প্রীতিপূর্বক বলবেন, আসুন। বসুন। আসন গ্রহণ করুন। কিছু জলযোগ করুন এবং কিরূপ আহারাদি হবে সে বিষয়ে আজ্ঞা প্রদান করুন। যে যে বিষয় উপদেশ যোগ্য হবে, তা প্রীতিপূর্বক বুঝিয়ে দিন, যা দ্বারা আমরাও সত্যবিদ্যাযুক্ত হয়ে সকল মানুষের পিতর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হতে পারি ও সদা এরূপ প্রার্থনা করি যে, হে পরমেশ্বর। আপনার অনুগ্রহে (সোম্যাসঃ) যে সকল শীলস্বভাব ও সকলের সুখদাতা বিদ্বানগণ, যারা পরমেশ্বর রূপী অগ্নিবিষয় এবং বিদ্যুৎরূপী বিদ্যাবিষয় যথাবৎ জ্ঞাত আছেন, তারা বিদ্যা ও সেবাদিরূপ যজ্ঞ দ্বারা (তাবন্ত্রস্থান) নিজ শিক্ষিত বিদ্যা প্রদান ও প্রকাশ দ্বারা অত্যন্ত হর্ষিত হয়ে আমাদের সদা রক্ষা করুন। পুনশ্চ ঐ সকল বিদ্যার্থীগণ ও সেবকের জন্যও ঈশ্বর এইরূপ আজ্ঞা দিয়েছেন যে, যখন ঐ সকল বিদ্বান পুরুষেরা বাড়িতে আগমন করবেন, তখন তাঁদেরকে দেখা মাত্র অভ্যর্থনা, নমস্কার ও প্রিয় বচন প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করবেন। পুনরায় তাঁরাও (বিদ্বানেরাও) নিজ নিজ সত্যভাষণ, নির্বৈরতা ও অনুগ্রহাদিরূপ

সদগুণ দ্বারা মনুষ্যগণকে ঐরূপ উত্তম মার্গে চালাবেন ও নিজেও দৃঢ়তার সাথে ঐরূপ মার্গে পরিচালনা করবেন। এইরূপে সকল প্রকার ছল ও লোভ ইত্যাদি রহিত হয়ে পরোপকারার্থ আপনাপন সত্য ব্যবহার রাখবেন (রক্ষা করবেন- অনুবাদক)।

উপরোক্ত মন্ত্র দ্বারা বিদ্বানগণের মধ্যে যে দুই প্রকার পথ আছে তা জানা যায় যথা-১ম দেবযান ও দ্বিতীয় পিতৃযান। অর্থাৎ যা বিদ্যমার্গ তাই দেবযান, এবং যা কর্মোপাসনা মার্গ তাই পিতৃযান নামে অবহিত হয়। সকলের এই দুই প্রকার পুরুষার্থে (পুরুষাকারে) সদা রত থাকা কর্তব্য।

অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং যথাভাগমাবৃষায়ধ্বম্।

অমীমদন্ত পিতরো যথাভাগমাবৃষায়িষত।

হে পিতরগণ! আপনারা আমার স্থানে (আশ্রম বা বাটীতে) আনন্দে অবস্থান করুন। (যথাভাগমার্চ) নিজ ইচ্ছানুকূল ভোজন ও বস্ত্রাদি ভোগ দ্বারা আনন্দিত হন। (অমীমদন্ত পিতরং) আপনি এই স্থানে বিদ্যা প্রচার দ্বারা সকলকে আনন্দযুক্ত করুন। (যথাভাগমা০) আমাদের দ্বারা যথাযোগ্য সৎকার প্রাপ্ত হয়ে, নিজ প্রসন্নতা প্রকাশ করে আমাকেও আনন্দিত করুন।

নমো বঃ পিতরো রসায় নমো বঃ পিতরঃ শোষায় নমো বঃ পিতরো জীবায় নমো বঃ পিতরঃ স্বধায়ৈ নমো বঃ পিতরো ঘোরায় নমো বঃ পিতরো মন্যবে নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বো গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত সতো বঃ পিতরোদেষ্মৈদ্ব পিতরো বাসঃ।

হে পিতরগণ! আমরা আপনাদেরকে এইজন্য নমস্কার করছি যে আপনাদের দ্বারা আমি বিদ্যানন্দ, ওষধি ও জল বিদ্যা বিষয় যথাবৎ জ্ঞান প্রাপ্ত হই, তথা (নমো ব০) শোধ অর্থাৎ অগ্নি ও বায়ু বিষয়ক বিদ্যা দ্বারা ঔষধি ও জল শুষ্ক হয়ে যায়, সেই বিষয়ের বোধারথে আমি আপনাকে নমস্কার করছি (আপনি কৃপাপূর্বক আমাকে উক্ত বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করুন-অনুবাদক)। (নমো ব০) হে পিতরগণ! ঘোর বিপদে অর্থাৎ আপৎকালে কীভাবে নির্বাহ করতে হয়, সেই বিষয়ক বিদ্যা জ্ঞাত হয়ে, দুঃখ হলে উত্তীর্ণ হবার জন্য আমরা আপনার সেবা করছি। (নমো ব০) হে পিতরগণ! যা দ্বারা দুষ্ট লোক ও দুষ্ট কর্মে সদা অপ্রীতি থাকে, সেই বিষয়ক বিদ্যা শিক্ষার্থে আমি আপনাদেরকে নমস্কার করছি। (নমো ব০) আমি আপনাদেরকে বারবার এইজন্য নমস্কার করছি যে, গৃহাশ্রম পালন করার জন্য যে যে বিদ্যা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, সেই সকল আপনারা আমাকে প্রদান করুন (শিক্ষা দিন)। (সতো ব০) হে পিতরগণ। আপনি সর্বপ্রকার গুণের ও সাংসারিক সুখের প্রদাতা, এজন্য আমরা আপনাদেরকে উত্তমোত্তম পদার্থ

অর্পণ করছি, তা আপনারা প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করুন। এবং প্রতিষ্ঠা জন্য উত্তমোত্তম বস্ত্রাদিও প্রদান করছি, এই সমস্তকেও আপনারা ধারণ করুন, এবং প্রসন্ন লাভ করে সকলের সুখের জন্য সত্যবিদ্যা প্রচার করতে থাকুন।

আধত্ত পিতরো গর্ভং কুমারং পুষ্করস্রজম্। য়থেহ পুরুষোঽসৎ

(যজুর্বেদ ২/৩১-৩৩)

হে বিদ্যাদাতা পিতরগণ। এই কুমার ব্রহ্মচারীকে নিজগর্ভে (সমীপে) রক্ষা করে উত্তম বিদ্যা প্রদান করুন, যা দ্বারা ঐ ব্রহ্মচারী বিদ্বান হয়ে (পুষ্করস্র০) যেভাবে পুরুষেরা মালা ধারণ করে শোভা প্রাপ্ত হয়, সেভাবে বিদ্যালাভ করে সুন্দরতাযুক্ত হয়ে শোভা প্রাপ্ত হোক। (য়থেহপুরুষোৎসৎ) অর্থাৎ যেভাবে এই সংসারে মনুষ্যগণ বিদ্যাদি শুভগুণ দ্বারা উত্তম কীর্তিযুক্ত হয়ে সুখ প্রাপ্ত হতে পারেন, সেভাবে আপনারা সদা প্রযত্ন করুন। উপরোক্ত আজ্ঞা ঈশ্বর বিদ্বানজনের প্রতি (বেদাদি শাস্ত্রে) প্রদান করেছেন। এজন্য সকল মানুষেরই সদা এই আজ্ঞা পালনে রত থাকা কর্তব্য।

যে সমানাঃ সমনসো জীবা জীবেষু মামকাঃ। তেষাংশ্রীময়ি কল্পতামস্মিল্লোকে শতংসমাঃ

(যজুর্বেদ ১৯/৪৬)

যে আচার্য্য (জীবাঃ) জীবিত অবস্থায়, (সমনসঃ) ধর্ম, ঈশ্বর ও সকল মানুষের কল্যাণ সাধন করতে সদা উদ্যত, যিনি (সমানাঃ) সত্যবিদ্যাদি শুভগুণ সকলের প্রচার বিষয়ে যথার্থরূপে বিচার ও (জীবেষু) সত্যোপদেশ করণে যোগ্য, যিনি ছল কপটাদি রহিত হয়ে শিষ্যদিগকে বিদ্যাদান করেন, এইভাবে আচার্য্যগণের (তেষাং) যে শ্রী অর্থাৎ সত্যবিদ্যাদি শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত শোভা ও রাজ্যলক্ষ্মী বিদ্যমান আছে, তা আমার জন্য (অস্মিংল্লোকে শতং সমাঃ) এই সংসারে একশত বর্ষ পর্যন্ত (অর্থাৎ আজীবন - অনুবাদক) স্থির, থাকুক, যা দ্বারা আমরা নিত্য সুখযুক্ত হয়ে, ধর্ম্মযুক্ত পুরুষাকারে রত থাকতে পারি।

উদীরতামবরঽপরাসঽউন্মধ্যমাঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ। অসুং যঽঈযুরবৃকাহঋতজ্ঞাস্তে নোবন্তু পিতরো হবেষু

যে সকল বিদ্বান্ পুরুষ (অবরে) কনিষ্ঠ, (উন্মধ্যমাঃ) মধ্যম ও (উৎপরাসঃ) উত্তম, (পিতরঃ সোম্যাসঃ) অর্থাৎ চাঁদ যেমন সকল প্রজাগণের আনন্দকারী সেইরকম সৌম্যগুণযুক্ত (অসুং য ঈয়ুঃ) প্রাণবিদ্যানিধান, (অবুকাঃ) শত্রু রহিত অর্থাৎ যিনি সকলের প্রিয় ও পক্ষপাত পরিত্যাগ করে সত্যমার্গে বিচরণ করে থাকেন, তথা (ঋতজ্ঞাঃ) অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম ও যথার্থ সত্যধর্মবিষয়াভিজ্ঞ, (তে নোেবন্ত পিতরো হবেষু) এইরকম পিতরগণ, যুদ্ধাদি ব্যবহার বিষয়ে আমার সাহায্যকারী হয়ে অথবা তাঁদের বিদ্যা আমাকে শিক্ষা করিয়ে, আমাদেরকে রক্ষা করুন

অঙ্গিরসো নঃ পিতরো নবগ্বাঽঅথর্বাণো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ। তেষাং বয়ং সুমতৌ য়জ্ঞিয়ানামপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম

(যজুর্বেদ ১৯/৪৯-৫০)

যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিব্যাদিরূপ অঙ্গের মর্মবিষয় অবগত, অথবা যিনি পরমেশ্বর বিষয় জ্ঞাত আছেন, (নবস্বা) যিনি স্বয়ং নতুন নতুন বিদ্যা গ্রহণ করেন ও অপরকে গ্রহণ করিয়ে থাকেন, যিনি (অথর্বাণঃ) অথর্ববেদীয় আয়ুর্বেদ ও ধনুর্বেদাদি বিদ্যা বিষয়ে পারদর্শী এবং যিনি দুষ্ট শত্রুকে দমন তথা নিজ দোষ নিবারণ করণে প্রবীণ বা নিপুণ, যিনি (ভৃগবঃ) পরিপক্ক অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানী ও তেজস্বী, (সোভ্যাসঃ) যিনি পরমেশ্বরের উপাসনা ও নিজ বিদ্যাবলে শান্তস্বভাব সম্পন্ন এবং (তেষাং বয়.. সুমতৌ০) যিনি যজ্ঞবিষয় সম্যক জ্ঞাত ও অনুষ্ঠানশালী, (পিতর) এমন পিতরগণ, যে সকল কল্যাণকারী বিদ্যাবলে তাদের (নিজ নিজ) সুমতি, (ভদ্রে) কল্যাণও (সোমনসে) ও মনের শুদ্ধি সম্পাদনে সমর্থ হন, তা দ্বারা আমরাও যেন চিত্ত স্থির করতে সমর্থ হই, অর্থাৎ উপরোক্ত বিদ্যা সম্যক জ্ঞাত হয়ে, আমরাও যেন ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়প্রকার সুখ প্রাপ্তি করে পরমানন্দে অবস্থান করতে সমর্থ হই।

যে সমানাঃ সমনসঃ পিতরো যমরাজ্যে। তেষাং লোকঃ স্বধা নমো য়জ্ঞো দেবেষু কল্পতাম্

(যজুর্বেদ ১৯/৪৫)

যে সকল পিতর অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষেরা, (য়মরাজ্যে) অর্থাৎ পরমেশ্বরের এই রাজ্য (সৃষ্টি) মধ্যে সভাসদ বা ন্যায়াধীশ হয়ে, ন্যায়কারী ও সৃষ্টির হিতকারী কার্যে সমান বুদ্ধিযুক্ত হন, (অর্থাৎ যাঁরা পক্ষপাত রহিত হয়ে, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন ও কখনো ধর্মাচরণ হতে বিচলিত হন না-অনুবাদক)। (তেষাং লোকঃ স্বধা) যাঁর সত্য (ব্যবহার) ও ন্যায়পরতা দ্বারা লোক অর্থাৎ সমগ্র দেশ মধ্যে সুখপ্রাপ্তি হয়ে থাকে, (নমঃ) তাঁকে আমরা নমস্কার করছি। যেহেতু তিনি পক্ষপাত রহিত হয়ে সত্য ব্যবস্থানুসারে চলে, আপন দৃষ্টান্ত দ্বারা, অপরকে ঐরূপ ন্যায়মার্গে পরিচালিত করে থাকেন। (যজ্ঞো দেবেষু কল্পতাং) এমন (অর্থাৎ উপরোক্ত প্রকার) সত্যধর্ম সম্বন্ধীয় প্রজাপালনরূপ যে অশ্বমেধ যজ্ঞ, তা পরমাত্মার কৃপায় বিদ্বান পুরুষের মধ্যে সত্য ব্যবহার উন্নতির জন্য সদা সমর্থ অর্থাৎ প্রকাশমান থাকুক

যে নঃ পূর্বে পিতরঃ সোম্যাসোঽনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ। তেভির্যমঃ সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু

যাঁরা আমার পূর্ব পিতর অর্থাৎ আমার পিতা, পিতামহ ও অধ্যাপকগণ, শান্তাত্মা এবং (অনুহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ) স্বয়ং যাঁরা সোমপান করতে ও অপরকে করাতে বসিষ্ঠ বা বিশারদ অর্থাৎ সমস্তপ্রকার বিদ্যায় রমণ করতে সমর্থ, (তে ভি য়মঃ সার) এইরূপ মহাত্মাদের সাথে সমাগম করে, বিদ্যালাভ পূর্বক যম অর্থাৎ ন্যায়কারী অন্তর্যামী

পরমেশ্বরকে নিঃসন্দেহে জানতে সমর্থ হওয়া যায়। (হবি০) যেজন সত্য ভক্তি আদি পদার্থের কামনা করেন, (উশদ্ভিঃ প্রতিকা০) এবং যিনি সর্বকর্মেই সত্যের সেবনকারী ও যার আধার একমাত্র পরমেশ্বর হন। হে মনুষ্যগণ। এইরূপ ধর্মাত্মা পুরুষদের সৎসঙ্গ দ্বারা তোমরাও উক্ত বিদ্বান্ পিতরগণের ন্যায় পরমেশ্বরের আনন্দে আনন্দিত হতে সমর্থ হও। এ বিষয়ের প্রমাণ নিরুক্ত গ্রন্থে, অ০ ১১ খং ১৯ (অঙ্গিরসো নবগতর ইত্যাদি পদে) লিখিত আছে, যদি ইচ্ছা হয় সেখানে দেখে নিবেন

বর্হিষদঃ পিতরঽঊত্যর্বাগিমা বৌ হব্যা চকৃমা জুষধ্বম্। তআ গতাবসা শংতমেনাথা নঃ শং য়োররপো দধাত ।

যাঁরা ব্রহ্ম এবং সত্যবিদ্যায় স্থিত পিতরগণ, তাঁরা আমার রক্ষার্থে যেন সদা তৎপর থাকেন। তাঁদের আমরা নিম্নলিখিত প্রকারে সেবা করব এবং তাঁরাও আমাদেরকে প্রীতিপূর্বক বিদ্যাদি দান করে প্রসন্ন করবেন। (ত অগতাবসা০) হে পিতরগণ। আমি এইরূপ আকাঙ্খা বা ইচ্ছা করতেছি, যে যখন আমি আপনার অথবা আপনি আমার নিকট আসবেন বা অন্যত্র গমন করবেন, তখন (ইমাহব্যা০) আমরা উত্তমোত্তম পদার্থ সকল দ্বারা আপনাদের সেবা করব, এবং আপনারাও (কৃপাপূর্বক) উহা গ্রহণ করবেন। (অবৃঃ) আমরা অন্নাদি পদার্থ দ্বারা ও আপনারা (শন্ত০) আমার কল্যাণকারী শুভগুণ সকলের উপদেশ (অথা নঃ শংয়োঃ) তথা আমার কল্যাণকারী বিধান দ্বারা (অরপঃ) যাহাতে আমরা পাপে পতিত না হই, তাহা ধারণ করতে আদেশ করুন।

আহং পিতৃনৎ সুবিদত্রাঁ। ২। অবিৎসি নপাতং চ বিক্রমণং চ বিষ্ণোঃ। বর্হিষদো য়ে স্বধয়া সুতস্য ভজন্ত পিতৃস্তঽইহাগমিষ্ঠাঃ

(যজুর্বেদ ১৯/৫১,৫৫,৫৬)

আমি জ্ঞাত আছি যে পিতরগণ নিজ নিজ উত্তম বিদ্যা ও উপদেশ দ্বারা আমার সুখকারী হয়ে থাকেন। (নপাতং চ বিক্রমণং ন বিষ্ণোঃ) সেই সর্বব্যাপক বিষ্ণুরূপী পরমেশ্বর বিক্রমণ অর্থাৎ সৃষ্টির রচনা ও নপাৎ, অর্থাৎ তাহার অবিনাশী পদ বা অবস্থার বিষয় যাহা সম্যক জ্ঞাত আছে, (বর্হিষদো যে০) উপরোক্ত জ্ঞান আমি উক্ত পিতরগণের কৃপাবলেই জ্ঞাত হতে সমর্থ হয়েছি, যাকে দেবযান সংজ্ঞা প্রদান করা যায় ও যার প্রাপ্তি হলে পুনরআয় কেউ কখনো দুঃখে পতিত হন না। এইরূপ যা দ্বারা পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ দুইটি মার্গও আমি বিদ্বানদিগের সঙ্গ দ্বারাই জানতে সক্ষম হয়েছি। (স্বধা) এজন্য যে সকল বিদ্বান আপনাদের অমৃতরূপী উপদেশ সকলকে পুত্রবৎ স্নেহ করে প্রদান করেন ও যাঁরা নিজে আনন্দে মগ্ন থেকে সংসারের সুখপ্রদাতা হন, এইরূপ সর্বহিতকারী সমাগম আমাদের সর্বদাই প্রার্থনীয়, যা দ্বারা আমরা নিত্যজ্ঞান লাভ করে উন্নতি প্রাপ্ত হতে সমর্থ হই।

উপহূতাঃ পিতরঃ সোম্যাসো বর্হিষ্যেষু নিধিষু প্রিয়েষু। ত২আ গমন্ত্র তইহ শ্রুবন্ত্বধি ব্রুবন্তু তে২বন্ত্বস্মান্।

যে সকল প্রতিষ্ঠাহাঃ (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার যোগ্য) পিতরগণ আছেন, তাঁদের আমি নিমন্ত্রণ করতেছি যে, যেন তাঁরা আমার গৃহে (কৃপাপূর্বক) আগমন করে, (বর্হিষ্যেষু) উত্তম আসনোপরি উপবেশন করে, আমাকে বহুমূল্য ও শ্রবণপ্রিয় উপদেশ (দ্বারা কৃতার্থ) করেন। (ত আগমন্ত্র০) যখন ঐ সকল পিতরগণ আসবেন, তখন সকলে উক্ত পিতরগণের এইরূপে সম্মান করবেন যে, আপনি আসুন, উত্তম আসনে উপবেশন করুন, (ইহ শ্রুবন্তু) আমার বিদ্যা সম্বন্ধে কথা ও প্রশ্ন শ্রবণ করুন, ও (অধিব্রুবন্তু০) ঐ গুলির উত্তর প্রদান করুন ও মনুষ্যদেরকে জ্ঞান প্রদান পূর্বক আমাদেরকে রক্ষা করুন।

অগ্নিস্বাত্তাঃ পিতরএহ গচ্ছত সদঃ সদঃ সদত সুপ্রণীতয়ঃ। অত্তা হবীং ষি প্রয়তানি বর্হিষ্যথা রয়িংসর্ববীরং দধাতন।

হে অগ্নিবিদ্যা জ্ঞাতকারী পিতরগণ। আপনি উপদেশক হয়ে আমার গৃহে শুভাগমন করতঃ অবস্তিতি পূর্বক উপদেশ করুন। পুনশ্চ ঐ পিতরগণের কীরূপ গুণসম্পন্ন হওয়া কর্তব্য, তা লেখা হচ্ছে। (সুপ্রণীতয়ঃ) উত্তমোত্তম গুণযুক্ত (বর্হিষি০) তথা সভামধ্যে সত্য ও ন্যায়কারী, (হবিঃ) যিনি বিদ্যা দান ও গ্রহণ উভয় কার্যোই উপযুক্ত বা পটু, (রয়িৎসর্ববীর দধাতন) এইরূপ পিতরগণের বিদ্যাদিরূপ যে উত্তম ধন আছে, যা দ্বারা বীরপুরুষযুক্ত সেনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদের উপদেশ দ্বারা আমাদেরকে পুষ্ট করুন। ঐ সকল বিদ্বানদের প্রতি ঈশ্বরের এইরূপ উপদেশ লেখা আছে যে, ঐ সকল বিদ্বানেরা দেশে দেশে ও গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ পূর্বক সকল মনুষ্যকে সত্যোপদেশ প্রদান করবেন।

য়ে২অগ্নিস্বাত্তা যে২অনগ্নিস্বাত্তা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে। তেভ্যঃ স্বরাডসুনীতিমেতাং য়থাবশং তন্বং কল্পয়াতি।

(যজুর্বেদ ১৯/ ৫৭,৫৯, ৬০)

যে সকল পিতরগণ অগ্নিবিদ্যা ও সোমবিদ্যা বিষয় সম্যক জ্ঞাত আছেন, তথা (মধ্যে দিবঃ স্বধয়া মাদয়ন্তে) যারা দিব অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ প্রকাশ মধ্যে সুখভোগ দ্বারা আনন্দিত রয়েছেন অর্থাৎ যারা বিজ্ঞান বলে নানা প্রকারে সুখী হয়ে থাকেন, (তেভ্যঃ স্বরাডসু০) তাদের কল্যাণে স্বরাট অর্থাৎ স্বপ্রকাশরূপী পরমেশ্বর (অসুনীতি) প্রাণবিদ্যা প্রকাশিত করে থাকেন। এজন্য আমরা প্রার্থনা করি যে (যথাবশং তন্বং কল্পয়াতি) হে পরমেশ্বর। আপনি নিজ কৃপাবলে তাঁদের শরীরকে সদা সুখী, তেজস্বী ও রোগরহিত করুন, যাতে আমরা উক্ত লোকদের নিকট হতে জ্ঞান প্রাপ্ত হতে থাকি।

অগ্নিস্বাত্তানৃতুমতো হবামহে নারাশংসে সোমপীথং য়আশুঃ।

তে নো বিপ্রাসঃ সুহবা ভবন্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্।

হে মনুষ্যগণ। যেমন আমরা অগ্নিবিদ্যা ও সময়বিদ্যার সম্যক পারদর্শী পিতরগণকে সম্মানের সাথে আহ্বান করি, তেমন তোমরাও ঐ সকল পিতরগণের নিকট গমন করবে ও তাঁদের নিকট আহ্বান করবে, যা দ্বারা তোমাদের দিন দিন বিদ্যার বৃদ্ধি হতে থাকে। (নারাশসে সোমপীথং য় আশুঃ) যাঁহারা (যজ্ঞে) সোমপানাদির রস পান করে ও (অন্যান্য প্রকারে) রক্ষা করে, মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ (উন্নতিশীল) করে দিয়া থাকেন, তাদের নিকট হতে তোমরা সত্যবিদ্যা শিক্ষা করে আনন্দিত হও। (তে নো বিপ্রাঃ সুতবা০) ঐ সকল মেধাবী ব্রাহ্মণেরা আমাদেরকে সদা (যেন) সত্যবিদ্যা গ্রহণ করাতে থাকুন। (বয়স্যাম পতয়ো রয়ীণাম) যা দ্বারা আমরা সুবিদ্যাবলে চক্রবর্তী রাজ্যের শ্রী আদি উত্তম পদার্থ সকলকে প্রাপ্ত তথা তার রক্ষা ও উন্নতি করণে সমর্থ হই।

য়ে চেহ পিতরো য়ে চ নেহ য়াঁশ্চ বিদ্ম যাঁ২।।

উচন প্রবিদ্ম। ত্বং বেত্থ য়তি তে জাতবেদঃ স্বধাভির্য়জ্ঞং সুকৃতং জুয়স্ব।

হে জাতবেদ পরমেশ্বর। যে সকল পিতরগণ আমার সমীপে তথা দুরদেশে অবস্থিতি করতেছেন, (যাঁচ বিদ্ম) তাঁদের মধ্যে যারা নিকটবর্তী থাকেন, তাঁদেরকে জানি, (উচন প্রবিদ্ম) এবং দূরে অবস্থিতি করায় যাদেরকে আমরা জানি না, (যদি তে) এম্ন জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়প্রকার পিতরগণ যাঁরা এই সংসার মধ্যে বিদ্যমান আছেন, (ত্বং বেত্থ০) তাঁদের সকলকেই আপনি জ্ঞাত আছেন, কৃপা করে তাদের ও আমার (আমাদের) পরস্পরের সম্বন্ধ সদা কালের জন্য স্থির করে দিন। (স্বধাভিয়জ্ঞ সুকৃতং) আর আপনি নিজ ধারণাদি শক্তি দ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ সকলকে প্রীতিপূর্বক সেবন করাবেন, যাদ্বারা আমরা সর্বপ্রকার সুখ প্রাপ্ত হতে থাকি।

ইদং পিতৃভ্যো নমোঅস্ত্বদ্য যে পূর্বাসো য় উপরাস ঈয়ুঃ।

যে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তা যে বা নূনং সুবৃজনাসু বিক্ষু।

যজুর্বেদ ১৯/৬১,৬৭,৬৮

আমরা ঐ সকল পিতরগণকে নমস্কার করতেছি, (তাদ্য পূর্বাসো য় উ পরাস ঈয়ুঃ) যাঁরা প্রথমে স্বয়ং বিদ্বান হয়ে (বিদ্যা লাভ করিয়া) আমাদেরকেও বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে থাকেন, অথবা যাঁরা বিরাগী ও সন্ন্যাসী হয়ে সর্বত্র বিচরণ পূর্বক সত্যোপদেশ করে বেড়ান। তথা (য়ে পার্থিবে রজস্যা নিষত্তাঃ) যারা পার্থিব অর্থাৎ ভূগর্ভবিদ্যা ও সূর্য্যাদি লোক বিষয় সম্যক জ্ঞাত আছেন, এবং (য়ে বা নূনসু) যারা নিশ্চয় করে (সর্ববিষয়ে দৃঢ় হইয়া) প্রজাদের কল্যাণে উদ্যত, উত্তম সেনাগণের মধ্যে অত্যন্ত চতুর অর্থাৎ তীক্ষ্নবুদ্ধিশালী, উপরোক্ত পিতরগণকে আমরা নমস্কার করতেছি, কারণ তারা সদা আমাদের উন্নতিতে রত থাকেন।

উশন্তত্ত্বা নি ধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।

উশন্নশত আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে

যজুর্বেদ ১৯/৭০

হে অগ্নি (নামক) পরমেশ্বর! আমরা আপনার প্রাপ্তি কামনায় আপনাকে আমাদের হৃদয়ে নিহিত অর্থাৎ স্থাপিত করি, (উশন্তঃ সমিধীমহি) এবং সর্বত্র আপনাকে প্রকাশ (অর্থাৎ আপনার মহিমা প্রকাশ-অনুবাদক) করে থাকি। (উশন্নশত আবহ পিতৃন) হে ভগবন্! আপনি আমার (আমাদিগের) কল্যাণার্থে পূর্বোক্ত পিতরগণকে প্রাপ্ত করান, যা দ্বারা (হবিষে অত্তবে) আমরা উক্ত পিতরগণের সেবা করে বিদ্যাপ্রাপ্তির জন্য স্থির থাকি।

পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ। পিতামহেভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ।

প্রপিতামহেভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ। অক্ষন্ পিতরোঽমীমদন্ত পিতরোঽতীতৃপন্ত পিতরঃ। পিতরঃ শুন্ধধ্বম্।

২৪ বছর পর্যন্ত যাঁরা ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করে বিদ্যাপাঠ করতঃ সকলকে বিদ্যাদান করেন, এরূপ পিতরগণকে আমার নমস্কার। (পিতামহেভ্যঃ০) যাঁরা ৪৪ বর্ষ বয়স পর্যন্ত ব্রহ্মচর্যাশ্রম সমাপন করে, বেদাদি বিদ্যা পাঠ করতঃ সকলের হিতকারী ও অমৃতরূপী জ্ঞান প্রদানকারী হন, তথা (প্রপিতামহেভ্যঃ০) যিনি ৪৮ বছর পর্যন্ত জিতেন্দ্রিয়তার সাথে সম্পূর্ণ বিদ্যা পাঠ করে, নিজ হাতে কর্ম দ্বারা সকল প্রকার বিদ্যার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, অপরকে শিক্ষা প্রদান করতে সমর্থ হন ও যিনি সকলের সুখের জন্য সর্বদা প্রযত্ন করে থাকেন, এইরূপ পিতরগণকে সকলেরই মান্য করা কর্তব্য।

পিতৃগণ সর্বপ্রকার বিদ্যাতে বাস (অর্থাৎ রমণ) করার উপযুক্ত পাত্র বলেই তাঁদেরকে বসু সংজ্ঞা দেওয়া যায়। পুনশ্চ পিতামহকে রুদ্র বলা যায়, কারণ তাঁরা বসু সংজ্ঞক পিতরগণ অপেক্ষা দ্বিগুণ ও শতগুণ বিদ্যাবান ও বলবান হয়ে থাকেন। এইরূপে প্রপিতামহকে আদিত্য সংজ্ঞা দেওয়া যায়, যেহেতু তিনি সর্বপ্রকার বিদ্যায় ও অপরাপর শুভগুণে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান হয়ে, সমগ্র বিদ্যাপ্রকাশ ও সকল লোককে শিক্ষা দিয়া প্রকাশমান করে থাকেন। উপরোক্ত তিনপ্রকার পিতরগণকে বসু, রুদ্র ও আদিত্য এইজন্য বলা যায়, যে তারা মানুষের হৃদয়ে কোন প্রকার দুষ্টতা থাকতে দেন না। এ বিষয়ে (পুরুষো বাব যজ্ঞ০ ইত্যাদি) ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রমাণ ইতিপূর্বে বর্ণন করেছি, সেখান্দ দেখে নিবেন।

হে পিতরগণ। আপনি বিদ্যারূপী যজ্ঞকে বিস্তৃত (বিস্তীর্ণ) করে সুখী হোম। তথা (অমীমদন্ত পিতরঃ) আমার সেবা দ্বারা অত্যন্ত প্রসন্ন হোন। (অতীতৃপন্ত পিতরঃ) আমার সেবা দ্বারা তৃপ্ত হয়ে আমাকেও আনন্দিত ও তৃপ্ত করতে থাকুন। এবং যে পদার্থ আপনার প্রয়োজন হয়, আমি ভ্রমবশতঃ যদি তা দ্বারা আপনার সেবা করতে ত্রুটি করি, সে বিষয়ে আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। (পিতরঃ শুন্ধধ্বম্) হে পিতরগণ। আপনি (আপনারা) আমাকে ধর্মোপদেশ ও সত্যবিদ্যা (দানে) শুদ্ধ করুন, যা দ্বারা আমরা আপনার সাথে মিলিত হয়ে, নিজ শুদ্ধার্থে প্রেমসহকারে সনাতন পরমাত্মার ভক্তিকরণে সমর্থ হই।

পুনন্তু মা পিতরঃ সোম্যাসঃ পুনন্তু মা পিতামহাঃ পুনন্তু প্রপিতামহাঃ পবিত্রেণ শতায়ুষা। পুনন্তু মা পিতামহাঃ পুনন্তু প্রপিতামহাঃ পবিত্রেণ শতায়ুষা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নবৈ

(যজুর্বেদ ১৯/৩৬,৩৭)

যে সকল পিতরগণ শান্তাত্মা ও পরম দয়ালু, তাঁরা আমাকে বিদ্যা দান দিয়ে পবিত্র করুন। (পুনন্তু মা পিতামহাঃ) এভাবে পিতামহ ও প্রপিতামহগণ আপনারাও আমাকে উত্তম বিদ্যা ও উপদেশ দিয়ে পবিত্র করুন, যা দ্বারা আপনাদের উপদেশ শ্রবণ করতঃ, ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করে একশত বছর পর্যন্ত আনন্দযুক্ত আয়ু লাভ করতে সমর্থ হই। এই মন্ত্র আদরার্থে কেবল দুইবার পাঠ করা হয়েছে।

অন্য মন্ত্র গুলিও এই বিষয়েরই পুষ্টিকারক মাত্র। তাদের অর্থ গুলিও উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বুঝে নেওয়া কর্তব্য। পুনশ্চ যেস্থানে অমাবস্যাতে পিতৃযজ্ঞ করআর কথা লেখা আছে, সেখানেও এই অভিপ্রায়ে লেখা হয়েছে, কি যদি কখনো কেউ নিত্য জীবিত পিতরগণের সেবা করতে অক্ষম হন, তবে অন্ততঃ মাসে দুইবার করেও সেবা করা কর্তব্য এবং অমাবস্যাতে মাস্যেষ্টি হয়ে থাকে, এজন্য সে সময় তাদেরকে আহ্বান করে, তাঁদের সেবা করা উচিত।

ইতি পিতৃ যজ্ঞঃ সমাপ্ত-

● চতুর্থ ভূতযজ্ঞ :-

জগতের সকল মানুষ এবং পশু পাখির মঙ্গলকামনা ও তাদের সর্বদাই যথাসাধ্য সাহায্য করাই হলো ভূতযজ্ঞ

এখন ভূতযজ্ঞ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হচ্ছে

অথ বলিবৈশ্বদেববিধির্লিখ্যাতে-

য়দন্নং পক্কমক্ষারলবণং ভবেত্তেনৈব বলিবৈশ্বদেবকর্ম কার্য়্যম - বৈশ্বদেবস্য সিদ্ধস্য গৃহ্যেঽগ্নৌ বিধিপূর্বকম্। আভ্যঃ কুর্য়্যাদ্ দেবতাভ্যো ব্রাহ্মণো হোমমন্বহম্

মনুস্মৃতি ৩/৮৪

অত্র বলিবৈশ্বদেব কর্ম্মণি প্রমাণম্ -

অহরহর্বলিমিত্তে হরন্তোঽশ্বায়েব তিষ্ঠতে ঘাসমগ্নে। রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে অগ্নে প্রতিবেশা রিষাম

(অথর্ব ১৯/৭/৭)

হে পরমেশ্বর! আপনার আজ্ঞায় যারা প্রতিদিন বলিবৈশ্বদেব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা (রায়স্পোষেণ) চক্রবর্তী রাজ্যলক্ষ্মী ও ঘৃত, দুগ্ধাদি পুষ্টিকর পদার্থ প্রাপ্তি ও সম্যক শুভেচ্ছা দ্বারা, (মদন্তঃ) নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হন, এবং মাতা, পিতা ও আচার্য্যদের প্রীতিপূর্বক উত্তমোত্তম পদার্থ দ্বারা নিত্য সেবা করেন। (অশ্বায়েব তিষ্ঠন্তে ঘাস০) যেরূপ অশ্বের সম্মুখে তার ভক্ষ্য তৃণ, লতাদি এবং পানার্থে জলাদি প্রচুর পরিমাণে সংস্থাপিত হয়, সেই রূপ পিতা, মাতা ও আচার্য্যের সেবার জন্য বহুবিধ উত্তমোত্তম পদার্থ প্রদান পূর্বক তাদের প্রসন্নতা সম্পাদন করবে। (মা তে অগ্নে প্রতিবেশরিষাম) হে পরম গুরু ঈশ্বর। আপনার আজ্ঞার বিরুদ্ধ ব্যবহারে আমরা যেন কখনোও প্রবৃত্ত না হই। অন্যায় পূর্ব্বক আমরা যেন কখনোও কোন প্রাণীকে পীড়া না দেই, পরন্ত সমস্ত জীবমাত্রকেই নিজ মিত্রবৎ ও আপনাকে সকলের মিত্রজ্ঞান করে পরস্পরের উপকার সাধনে রত থাকি। এটিই ঈশ্বর আজ্ঞা।

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনসা ধিয়ঃ। পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি জাতবেদঃ পুনীহি মা স্বাহা

(যজুর্বেদ ১৯/৩৯)

এই মন্ত্রের অর্থ তর্পণ বিষয়ে বর্ণন করেছি, এজন্য এস্থলে পুনর্বার বর্ণন করলাম না, তথায় দেখে নিবেন

ওঁম্ অগ্নয়ে স্বাহা

অগ্নি শব্দের অর্থ পূর্বে বর্ণনা করেছি, অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রীত্যর্থে আমরা আহুতি প্রদান করছি।

ওঁম্ সোমায় স্বাহা

সর্ব পদার্থের উৎপাদক অর্থাৎ সর্ব জগৎ উৎপাদক ও সর্বপ্রকার দুঃখনাশের হেতুস্বরূপ অর্থাৎ সর্বানন্দপ্রদ পরমাত্মার প্রীতির জন্য আমরা হোম করছি।

ওঽম্ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা

যিনি সমস্ত প্রাণীগণের হেতুস্বরূপ প্রাণ এবং দুঃখ নাশ হেতু অপান স্বরূপ, অথবা যিনি সংসারের প্রকাশক পরমাত্মা ও বিদ্বান জন যিনি জন্মমরণাদি দুঃখ দূরকারক পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং সর্বানন্দপ্রদ সর্বজগত উৎপাদক পরমেশ্বর, তাঁর প্রীতির জন্য আমরা হোম করছি।

ওঽম্ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা

বিশ্বপ্রকাশক ঈশ্বরের গুণ সকলের (প্রকাশ) অথবা (বিদ্বানগণের প্রীত্যর্থে) আমরা হোম করছি।

ওঽম্ ধন্বন্তরয়ে স্বাহা

জন্মমরণাদিরূপ দুঃখনাশক অথবা সর্বরোগনাশক ঈশ্বরের প্রীতির জন্য আমরা হোম করছি।

ওঽম্ কুহৈব স্বাহা

অমাবস্যেষ্টি বা সর্বশাস্ত্র প্রতিপাদিত ঈশ্বরের চিতিশক্তির প্রীতির জন্য আমরা হোম করছি।

ওঽম্ অনুমত্যৈ স্বাহা

পৌর্ণমাস্যেষ্টি অথবা বিদ্যা পঠনান্তর পরমেশ্বরের যে চিতিশক্তির মনন করা যায়, সেই চিতিশক্তির প্রীতির জন্য আমরা হোম করছি।

ওঽম্ প্রজাপতয়ে স্বাহা

সর্বজগৎকর্তা ও জগতের রক্ষক স্বরূপ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য আমরা হোম করছি।

ওঽম্ সহ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা

ঈশ্বরের প্রকৃষ্ট গুণদ্বারা উৎপাদিত দ্যুলোক ও ভূলোকের পুষ্টিকরণার্থ আমরা হোম করছি।

ওঽম্ স্বিষ্টকৃতে স্বাহা

যিনি ইষ্ট সুখকারী সেই পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে আমরা হোম করছি।

উপরোক্ত দশপ্রকার মন্ত্রগুলি দ্বারা দশ প্রকার প্রয়োজন জ্ঞাত হওয়া কর্তব্য।

ইতি নিত্যশ্রাদ্ধম্।

ওঽম্ সানুগায়েন্দ্রায় নমঃ

(ণম্ ধাতুর অর্থ প্রহ্বত্ব অর্থাৎ নম্রতা এবং শব্দ) এ দ্বারা সৎক্রিয়া পুরঃসর বিচারপূর্বক মনুষ্যের যথার্থ বিজ্ঞান লাভ হয়

ওঽম্ সানুগায় য়মায় নমঃ

নিত্যগুণ সহ বর্তমান ও পরমৈশ্বর্য্যবান্ পরমেশ্বরকে আমরা নমস্কার করছি।

ওঽম্ সানুগায় বরুণায় নমঃ

পক্ষপাতরহিত সত্য ও ন্যায়কারিত্বাদি গুণযুক্ত পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মার সৃষ্টিতে সত্য ও ন্যায়কারী সভাসদগণকেও আমরা নমস্কার করছি

ওঽম্ সানুগায় সোমায় নমঃ

পুণ্যাত্মাদেরকে আনন্দপ্রদ পরমেশ্বর এবং শান্ত্যাদিগুণযুক্ত বিদ্বান ও পুণ্যাত্মাদের (উভয়কেই) আমরা নমস্কার করছি।

ওঽম্ মরুদ্ভ্যো নমঃ

প্রাণ বায়ু যা শরীরে অবস্থান করলে জীবন ও বহির্গত হলেই মৃত্যু বলে, এই প্রাণাদি বায়ু বা মরুদ্গণের রক্ষাকারী পরমেশ্বরকে অথবা ঈশ্বর রূপ আধারে সমস্ত জগৎকে ধারণ বা চেষ্টাযুক্তকারী মরুদ্গণকে আমরা নমস্কার করছি

ওঽম্ ওমদভ্যো নমঃ

বিশ্বব্যাপক পরমাত্মাকে আমরা নমস্কার করছি। (এই মন্ত্রের বিস্তারিত অর্থ আমরা "শন্নোদেবী" এই মন্ত্রে বর্ণন করেছি, সেখানে দেখে নিবেন।

ওঁম্ বনস্পতিভ্যো নমঃ

ঈশ্বরের সৃষ্ট বায়ু ও মেঘাদির রক্ষা ও পালন হেতু বর্ষা জলে যে সকল মহাবৃক্ষাদি উৎপন্ন হয় ও তা দ্বারা জগতের উপকার সাধিত হয়, তা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এই মন্ত্রের আর এক প্রকার অর্থ এইরূপ যে, লোক সকলের পালনকারী ঐশ্বরিক গুণ সকল, (এখানে বহুবচন আদরার্থে ব্যবহৃত হয়েছে- অনুবাদক)। অর্থাৎ ঈশ্বরকে আমরা নমস্কার করছি অথবা পরমেশ্বরের উত্তমগুণ যোগদ্বারা ঈশ্বর কর্তৃক উৎপাদিত মহাবৃক্ষ সকল সদা আমাদের রক্ষণীয়।

ওঁম্ শ্রিয়ৈ নমঃ

সকলের সেব্য ও রাজ্য শ্রী ও সমগ্র বিশ্বের (শ্রী) অর্থাৎ শোভা উৎপাদনকারী পরমাত্মাকে আমরা নমস্কার করছি।

ওঁম্ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ

কল্যাণকারিণী ঈশ্বর শক্তি বা সামর্থকেই আমরা নমস্কার করছি।

ওঁম্ ব্রহ্মপতয়ে নমঃ

সর্বশাস্ত্রবিদ্যাযুক্ত বেদশাস্ত্র তথা ব্রহ্মাণ্ডের পতিরূপ ঈশ্বরকে আমরা নমস্কার করছি।

ওঁম্ বাস্তুপতয়ে নমঃ

যাতে সর্বভূত বাস করে এরূপ কর্তারূপ আকাশের যে পতি পরমেশ্বর তাঁকে অথবা গৃহসম্বন্ধীয় পদার্থের পালনকারী পরমেশ্বরকে আমরা নমস্কার করছি।

ওঁম্ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

বিশ্বদেবগণকে আমরা নমস্কার করছি।

ওঁম্ দিবাচরেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ

ওঁম্ নক্তংচারিভ্যো নমঃ

দিবস ও রাত্রিকালে বিচরণকারী প্রাণিগণ ঈশ্বর কৃপায় আমাদের কোনরূপ বিঘ্ন করতে যেন না পারে এবং তাদের সাথে যেন আমাদের কোনরূপ বিরোধ না ঘটে, এজন্য আমরা তাদের নমস্কার করছি অর্থাৎ ঐরূপ জীব দ্বারা আমরা যা কিছু উপকার প্রাপ্ত হই, তা গ্রহণ করব ও তাদেরও যথাযোগ্য সেবাদি করব।

ওঁম্ সর্বাত্মভূতয়ে নমঃ

সমস্ত জীবের একমাত্র আশ্রয় স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা নমস্কার করছি।

ওঁম্ পিতৃভ্যঃ স্বধায়িভ্যঃ স্বধা নমঃ

পিতৃগণ ও সত্যবিদ্যা ভক্তি স্বপদার্থধারীগণ ও সত্যবিদ্যাকে আমরা নমস্কার করছি অর্থাৎ পিতা মাতা আদিকে আমরা প্রথমে ভোজনাদি করিয়ে তারপরে ভোজনাদি করি। স্বাহা শব্দের অর্থ পূর্বেই বলেছি। নিরভিমান প্রকাশার্থ অপরকে উৎকৃষ্ট মেনে, মান্য জ্ঞাপনার্থ নমঃ শব্দের প্রয়োগ হয়।

শুনাং চ পতিতানাং চ স্বপচাং পাপরোগিণাম্। বাযসানাং কৃমীণাং চ শনকৈনির্বপেদ্ ভুবি।

(শুনাং) কুকুর প্রভৃতি জন্তু, পতিত ব্যক্তি, চণ্ডাল, পাপরোগী, বয়সাদি পক্ষী ও কৃমিগণের তৃপ্তি সাধন ছয়টি পৃথক পৃথক ভাগ করে, ভুমিতে বলি অর্থাৎ খাদ্য প্রদান করবে। -মনু

ইতি ভূতযজ্ঞ : সমাপ্ত –

● পঞ্চম অতিথি যজ্ঞ :- অতিথিদের যথাযথ সেবা করাই অতিথিযজ্ঞ।

এখন অতিথি যজ্ঞের বিষয় লেখা হচ্ছে-

অর্থাৎ অতিথিগণের কীরূপে যথাযোগ্য সেবা করা কর্তব্য, তদ্বিষয় লেখা হচ্ছে:- যাঁরা পূর্ণবিদ্বান, জিতেন্দ্রিয় ধর্মাত্মা, সত্যবাদী, ছল ও কপটাদি দোষরহিত ও নিত্য ভ্রমণ করে বিদ্যা ও ধর্মবিষয় উপদেশ দেন ও অবিদ্যা ও অধর্মের সদা নিবৃত্তিতে রত থাকেন, এইরূপ মনুষ্যগণই অতিথি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে অনেক বৈদিকমন্ত্র প্রমাণ স্বরূপ থাকলেও, এস্থলে সংক্ষেপতঃ দুইটি মন্ত্র লেখা হলো:-

তদ্যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যোঽতিথিগৃহানাগচ্ছেৎ

যাঁর গৃহে পুর্বোক্ত বিশেষণযুক্ত (ব্রাত্য) ও উত্তম গুণবিশিষ্ট ও সেবা করবার যোগ্য বিদ্বান আগমন করেন, তার ঐ মহাত্মার যথাবৎ সেবা করা কর্তব্য। এবং তাঁকে (অর্থাৎ ঐরূপ আগমনকারীকে) এই জন্য অতিথি বলা যায়, যেহেতু তাঁর গমনাগমনের কোনরূপ নির্দিষ্ট তিথি বা দিবস নাই।

স্বয়মেনমত্যুদেত্য ব্রুয়াদ ব্রাত্য ক্বাৎবাৎসীব্রাত্যোদকং ব্রাত্য তর্পয়ন্ত ব্রাত্য য়থা তে প্রিয়ং তথাস্তু ব্রাত্য য়থা তে বশস্তথাস্তু ব্রাত্যয়থা তে নিকামস্তথাস্তু◌িতি

(অথর্ব- ১৫/২/১১/১,২)

এইরূপে অকস্মাৎ স্বেচ্ছাক্রমে আগমন ও গমনকারী ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত হলে, গৃহস্বামী তাঁকে দেখামাত্র অতি প্রীতিসহকারে দণ্ডায়মান হয়ে, নমস্কার পূর্বক তাঁকে উত্তম আসনে উপবেশন করিয়ে, পরে জিজ্ঞাসা করবেন যে, আপনার জল বা অন্য কোন দ্রব্যের আবশ্যক আছে কিনা, তা নিবেদন করবেন, পরে সেবা দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন ও সুস্থচিত্ত করে এরূপ জিজ্ঞাসা করবেন, (ব্রাত্য ক্বাবাৎসীঃ) হে ব্রতধারী বা ব্রতানুষ্ঠানকারী পুরুষোত্তম। আপনি গতকাল কোথায় অবস্থান করেছিলেন? (অর্থাৎ এখন কোথা হতে আগমন করছেন- অনুবাদক)। (ব্রাত্যোদকম্) হে অতিথে। আপনি এই জলাদি গ্রহণ পূর্বক (তর্পয়ন্ত্র) আমাকে আপনার সত্যাপদেশ দ্বারা আমাদের মিত্রগণ (তপয়িত্বা) আপনাকে সেবা দ্বারা প্রসন্ন করে বিজ্ঞানযুক্ত হউক। (ব্রাত্যা যথা) হে বিদ্বান! যে যে কার্য দ্বারা আপনার প্রসন্নতা জন্মে, আমরা তাই সম্পাদন করবো। যে বস্তু আপনার প্রিয় আপনি আজ্ঞা করুন। (ব্রাত্য যথাতে) হে অতিথে। যেরূপ করলে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, আমরা তদ্রূপেই আপনার সেবা করব। এইরূপে আমরা পরস্পর সেবা ও সৎসঙ্গ পূর্বক বিদ্যা বৃদ্ধি করে, সর্বদা আনন্দিত মনে অবস্থান করতে থাকি।

ইতি সংক্ষেপতঃ পঞ্চমহাযজ্ঞ বিষয়ঃ

আর্য সংস্কৃতির প্রবল প্রচারক — লালা রামজস

সনাতনী সমাজ এক কালে বেদের জ্ঞানকে ভূলে গিয়েছিলো। এর পরিণামস্বরূপ, হয় তারা ভোগ্যবাদী হয়ে গিয়েছিলো আর না হয় জগতকে মিথ্যা মনে করে বসেছিলো। এইজন্য তারা পরিশ্রম করা ছেড়ে দিয়ে অলস ভাবে জীবনযাপন করছিলো। এই মানসিকতার কারণে ভারতবর্ষে বিদেশীরা তাদের রাজ্য নির্মাণ করেছিলো। এই ভয়াবহ কালে ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভাব হলো মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীজীর। তিনি ঘুমন্ত হিন্দুজাতিকে জাগালেন। তিনি শিখিয়েছেন আত্মা অমর এবং কর্ম হলো ভাগ্যের নির্ধারক। মহর্ষি দয়ানন্দ সত্যার্থ প্রকাশে লিখেছেন, একটি ক্রিয়াশীল জীবনের মান্যতা ভাগ্যের নির্ধারিত ফলের স্বীকৃতি অপেক্ষা অধিক মহত্ত্বপূর্ণ। ভাগ্য হলো কর্মের ফল। কর্ম ভাগ্যের নির্মাতা। স্বামীজীর উপদেশ শুনে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন পরিবর্তন হয়েছিলো। সেই মহাত্মাদের মধ্যে একজন ছিলেন লালা রামজস আর্য।

লালা রামজসজীর জন্ম ১৮৬৫ সালে মেরঠের অমানুল্লাপুর গ্রামে হয়েছিলো। স্বামী দয়ানন্দের যখন মেরঠে আগমণ হয়েছিলো তখন তাঁর দর্শনে এবং উদ্বোধনে বালক রামজসের বৈদিক ধর্মে প্রবেশ ঘটেছিলো। তিনি স্বামী দয়ানন্দের সামাজিক কাজে অংশ নিতে লাগলেন। তাঁর কাছে দলিতোদ্ধার এবং শুদ্ধিযজ্ঞ বিশেষ পছন্দের ছিলো।

■ একবার তিনি শুনেছিলেন যে আলী শের নামক এক ব্যক্তি তুচ্ছ অপরাধের জন্য জেলে গিয়েছে। রামজসজী ব্যক্তিটির জামানত (বেল) করিয়েছিলেন। তাকে বৈদিক ধর্মের মর্ম বুঝিয়েছিলেন। আলী শের বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। রামজসজীর চেষ্টার পর তিনি তার স্বপরিবারে শুদ্ধি হয়ে আর্য হয়েছিলেন। রামজসজী ঘোষণা করেছিলেন যে আলী শের আমার ছোট ভাই, আজ থেকে তার নাম ধর্ম সিংহ। সে আমার পরিবারের সদস্য। সে আমার ঘরে থাকবে। কিছুসময় পর ধর্ম সিংহের দুজন মেয়ে বিদ্যা এবং তারা জন্ম নেয়। বড় হওয়ার পর রামজসজী তাদের বিবাহ হিন্দু পরিবারে সম্পন্ন করিয়েছিলেন। রামজসজী সেই সময় বলেছিলেন, ধর্ম সিংহের যদি কোন ছেলে হতো তাহলে আমি নিজের পরিবারের কোনো নারীর সাথে তার বিবাহ করাতাম। এমনই ছিলেন লালা রামজসজী। এক কথার মানুষ। যা বলেছেন তাই করে দেখিয়েছেন।

আর্যদের এই ব্যক্তিত্বের আদালতও সম্মান করতো। রামজসজী ইংরেজদের অত্যাচারেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। বিভিন্ন সময় তাদের বিরোধীতা করতে তিনি উত্তরের দিকে যেতেন।

নারী জাতি সেই সময় অশিক্ষা, বাল্যবিবাহ এবং বিধবাদের করুণ অবস্থায় পীড়িত ছিলো। নারীদের এই দশা রামজসজী দেখতে পারলেন না। তিনি এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ আরম্ভ করেছিলেন।

১৯১০ এর একটি ঘটনা। পতলা গ্রামের গাজিয়াবাদ জেলার এক ব্রাহ্মণের মেয়ে 'ভগবান দেই', যার বিবাহ যৌবনের প্রথম চরণেই কলীনা গ্রামে হয়েছিলো। সেই মেয়ের সামনে অন্ধকারময় জীবন ছিলো। সমাজ তাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। রামজসজী তার পুনঃর্বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যখন পৌরাণিকরা এটি জেনেছিলো তখন তারা এটির বিরোধীতা করলো।আর্যসমাজীরা বিধবা বিবাহের সমর্থনে অবস্থান নিয়েছিলো। পৌরাণিকদের সাথে এই বিষয় নিয়ে শাস্ত্রার্থ হয়েছিলো। সেখানে এটি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছিলো। আর্যসমাজের প্রতিনিধিরা শাস্ত্রার্থে জয়লাভ করেছিলো। অবশেষে একটি ব্রাহ্মণ পরিবারের যুবক বাবু রামের সাথে তার পুনর্বিবাহ সম্পন্ন হলো। সমাজে নব চেতনার প্রকাশ ঘটলো। রামজসজীর উৎসাহ এবং মনোবল দুটোই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিলো।

রামজসজীর কাছে অনেক জমি ছিলো। তিনি দেখলেন গ্রামে দলিতেরা অনেক দরিদ্র। তিনি তাঁর জমিগুলো দলিত ভাইদের দান করেছিলেন এবং নিজের ক্ষেত থেকে ফসল নেয়ারও স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এর ফলে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলো। রামজসজী অনেক দলিত পরিবারদের আর্থিক সহযোগীতাও দিয়েছিলেন। দলিত সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

বৈদিক সিদ্ধান্তের প্রবল প্রচারক, বিধবা বিবাহ ও শুদ্ধির সমর্থক, দলিতদের সহায়ক, ঈশ্বর ভক্ত এবং ঋষি দয়ানন্দের অনন্য শিষ্য লালা রামজসজী ৫৯ বছর বয়সে তাঁর প্রাণ ত্যাগ করেন।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মহর্ষি দয়ানন্দ ও আর্যসমাজ সম্পর্কে পদ্মভূষণ রাষ্ট্রকবি রামধারী সিংহ 'দিনকর'

রামধারী সিং দিনকর" (২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯০৮ – ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৪) একজন ভারতীয় হিন্দি কবি, প্রাবন্ধিক, দেশপ্রেমিক এবং শিক্ষাবিদ ছিলেন, যাঁকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিন্দি কবি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে রচিত তার জাতীয়তাবাদী কবিতার জন্য তাকে বিদ্রোহী কবি হিসাবে স্মরণ করা হয়। তার কবিতা *বীর রস* দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছে এবং তার অনুপ্রেরণামূলক দেশাত্মবোধক রচনার জন্য তাকে *রাষ্ট্রকবি* ("জাতীয় কবি") হিসাবে প্রশংসিত করা হয়েছে। তার সময়কালে তিনি হিন্দি কবি সম্মিলনের একজন নিয়মিত কবি ছিলেন এবং রুশদের কাছে পুশকিন যেমন জনপ্রিয়, তেমনি হিন্দি ভাষী কবিতা প্রেমীদের কাছে তিনি জনপ্রিয় ও সংযুক্ত ছিলেন।

দিনকর তিনবার রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং তিনি ৩রা এপ্রিল ১৯৫২ থেকে ২৬শে জানুয়ারি ১৯৬৪ পর্যন্ত ঐ সংসদের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৫৯ সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে তিনি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরও (ভাগলপুর, বিহার) উপাচার্য ছিলেন।

> মহর্ষি দয়ানন্দ রূঢ়িবাদীদের যে হুঙ্কার দিয়েছিলেন তার থেকে কয়েকগুণ বেশী হুঙ্কার দিয়েছিলেন প্রকাশ্যে হিন্দুত্বের নিন্দুক খ্রিস্টান ও মুসলমানদের। খ্রিস্টান ও মুসলিমদের গ্রন্থে ঢুকে তিনি সেই দোষ দেখিয়েছিলেন যেই দোষ দেখিয়ে তারা হিন্দুত্বের নিন্দা করতো। এতে দুটো লাভ হলো। প্রথমত নিজের নিন্দা শুনে আতংকিত হিন্দুরা এটা জেনে খুশি হলো যে পৌরাণিক বিষয়ের তুলনায় খ্রিস্টান ও মুসলমানরাও হিন্দুত্বের থেকে একটা ভালো না । দ্বিতীয়তব, হিন্দুদের দৃষ্টি তাদের ধর্মের মূলের দিকে আকৃষ্ট হলো, তারা তাদের প্রাচীন পরম্পরার জন্য গর্ববোধ করতে লাগলো।

-পদ্মভূষণ রাষ্ট্রকবি রামধারী সিংহ 'দিনকর', সংস্কৃতির চার অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৬০

> আর্যসমাজের আবির্ভাবের পরে হিন্দুদের অবিচল উদাসীনতা দূর হলো। হিন্দুদের ধর্ম আরেকবার জেগে উঠলো। আজকের হিন্দু নিজের ধর্মের নিন্দা শুনে আর চুপ করে থাকতে পারেনা। প্রয়োজনে ধর্মরক্ষায় নিজের জীবনও দিতে পারে ।

- পদ্মভূষণ রাষ্ট্রকবি রামধারী সিংহ 'দিনকর', সংস্কৃতির চার অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৬৭

> স্বামী দয়ানন্দের শিষ্যরা ঘোষণা দিলো, 'ধর্মচ্যুত হিন্দু যে কোনো অবস্থায় নিজ ধর্মে ফিরে আসতে পারবে আর অহিন্দুও যদি চায় তবে হিন্দুধর্মে প্রবেশ করতে পারবে' । এটি কেবল সংস্কারের কথা নয়, জাগ্রত হিন্দুত্বের সমর-শঙ্খনাদ ছিলো। আর সত্যিই, রণারূঢ় হিন্দুত্ববাদের যেমন নির্ভীক নেতা স্বামী দয়ানন্দ হয়েছেন, আর কেউ তেমন হতে পারেনি ।

- পদ্মভূষণ রাষ্ট্রকবি রামধারী সিংহ 'দিনকর', সংস্কৃতির চার অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫৬০

অবিদ্যা থেকে মুক্তি

অবিদ্যা কি?

মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত -এই চারটিকে একত্রে অন্ত:করণ চতুষ্টয় বলে। তবে যোগদর্শনে 'মন' ও 'চিত্ত' কে সমার্থক হিসেবেই গ্রহণ করা হয়েছে। বলে রাখা ভালো, এখানে আমরা অবিদ্যা বলতে 'অপরাবিদ্যা' র কথা বলছি না। আমরা দর্শনশাস্ত্রে বর্ণিত 'অবিদ্যা' সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত জানবো। যোগদর্শনমতে, আমাদের চিত্তে উদয় হওয়া সকল ভাবনা/চিন্তা-কে বলে 'বৃত্তি'। আর এই বৃত্তি ৫ প্রকারের হয়ে থাকে।

প্রমাণবিপর্যযবিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ।। (যোগদর্শন ১/৬)

সূত্রার্থ- প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এগুলো হলো পাঁচ প্রকারের বৃত্তি।।

হুবহু একই বিষয় সাংখ্যদর্শনেও বর্ণিত আছে।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ।। (সাংখ্যদর্শন ২/৩৩)

সূত্রার্থ- ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট ভেদে বৃত্তি পাঁচ প্রকারের হয়।।

এই বৃত্তিসমূহ সমাধির বিঘ্নস্বরুপ। এই পাঁচটি বৃত্তির মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ 'বিপর্যয় বৃত্তি'-র স্বরুপঃ

বিপর্যযো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রুপপ্রতিষ্ঠিতম্।। (যোগদর্শন ১/৮)

সূত্রার্থ- 'বিপর্যয়বৃত্তি' অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞান, যে জ্ঞান পদার্থের বাস্তবিক স্বরুপকে প্রকাশিত করে না।।

বিপর্যয় বৃত্তিকেও অবিদ্যা বলা হয়, তবে বিপর্যয় বৃত্তির পর্বসমূহের মধ্যে 'অবিদ্যা' একটি।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মাসুনিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।। (যোগদর্শন ২/৫)

সূত্রার্থ- অনিত্য, অশুচি, দুঃখ এবং অনাত্মাকে ক্রমশ নিত্য, শুচি, সুখ এবং আত্মা মনে করাকে 'অবিদ্যা' বলা হয়।।

অর্থাৎ যা কোনো বস্তু, ব্যাক্তি, পদার্থ, সত্ত্বা-র স্বরুপ সম্পর্কে যথাবৎ জ্ঞান প্রকাশ না করে, মিথ্যা জ্ঞানের প্রকাশ করে, তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

'বিপর্যয় বৃত্তি' র ৫ টি পর্বকে পঞ্চক্লেশ (ক্লেশ বলতে বোঝায় দুঃখ প্রদানকারী)বলা হয়।

অবিদ্যাSস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।। (যোগদর্শন ২/৩)

সূত্রার্থ- অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচটিকে ক্লেশ বলে।।

অবিদ্যা কে সকল ক্লেশের জননী বলা হয়। কারণ অবিদ্যা উপস্থিত থাকলে, বাকি ক্লেশগুলো By product হিসেবেই আসে।

▶️অবিদ্যা'র ফলে কি হয়?

অবিদ্যা'র ফলে জীব নিজের চেতন সত্ত্বাকে জানতে পারে না। যার ফলে চিত্তে উৎপন্ন হওয়া কাম, ক্রোধ আদি বিষয়কেই জীব নিজের স্বরুপ বলে মনে করে। একে যোগদর্শন ১/৪- এ 'বৃত্তিসারুপ্যমিতরত্র' বলা হয়েছে। অবিদ্যার ফলে জীব প্রকৃতি ও পুরুষ সম্পর্কে জানতে পারে না।

প্রধানাবিবেকাদন্যবিবেকস্যতদ্ধানে হানম্।। (সাংখ্যদর্শন ১/৫৭)

সূত্রার্থ- মুখ্য বস্তু জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধে অবিবেক হওয়ায় গৌণ পদার্থসমূহের সম্বন্ধেও অবিবেক হয়ে যায়। আর মুখ্য পদার্থসমূহের সম্বন্ধে অবিবেক দূর হলে গৌণ পদার্থসমূহের সম্বন্ধেও অবিবেক দূর হয়।।

অবিবেক মানে হলো প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যকার ভেদাভেদ-কে জানতে না পারা। এটি অবিদ্যারই ফল। তাই অবিদ্যা একাধারে আত্মোপলব্ধি, ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও মোক্ষের পথে বিঘ্নস্বরুপ।

▶️ অবিদ্যা নাশের কি কোনো উপায় আছে?

সমস্যা যেহেতু আছে, তার সমাধানও অবশ্যই থাকবে।

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিযাযোগঃ।। (যোগদর্শন ২/১)

সূত্রার্থ- তপ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধানকে ক্রিয়াযোগ বলা হয়।।

স্বাধ্যায়ঃ শ্রুতি, শ্রুতি প্রতিপাদিত স্মৃতিশাস্ত্রসমূহের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে।

জপঃ ঈশ্বরের মুখ্য নামকে 'ওঽম্' বলে।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।। (যোগদর্শন ১/২৭)

সূত্রার্থ- ওই ঈশ্বরের বোধক = নাম 'ওঽম্'।।

ধ্যানপূর্বক ঈশ্বরের গুণের চিন্তা করে 'ওঽম্' উচ্চারণ করাকে বলে জপ।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।। (যোগদর্শন ১/২৮)

সূত্রার্থ- ওই ওঽম্ শব্দের জপ এবং ওঽম্ নামের ঈশ্বরের ভাবনা অর্থাৎ তাঁর রক্ষণাদি গুণের চিন্তন করা উচিৎ।।

ঈশ্বরপ্রণিধানঃ সকল কর্মে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পিত থাকা এবং ঈশ্বরকেই সকল কিছুর কর্তা মনে করা কে ঈশ্বরপ্রণিধান বলে।

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।। (যোগদর্শন ১/২৩)

সূত্রার্থ- ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাও শীঘ্র সমাধি ও সমাধি ফলের লাভ হয়।।

স্বাধ্যায়, জপ ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই তিনটি কে বলে ক্রিয়াযোগ।

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ।। (যোগদর্শন ২/২)

সূত্রার্থ- উক্ত ক্রিয়াযোগ সমাধির উৎপত্তি এবং অবিদ্যা ইত্যাদি ক্লেশকে নির্বল করার জন্য করা হয়।।

অর্থাৎ, ক্রিয়াযোগের অভ্যাসের দ্বারাই অবিদ্যার নাশ সম্ভব।

▶ অবিদ্যার নাশের ফলে কি হয়?

অবিদ্যার নাশ হলে যোগী সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকে প্রাপ্ত করে। তখন যোগী বিষয়গুলোকে ছেড়ে নিজের প্রকৃত স্বরুপকে জানতে পারে এবং পরমাত্মার সম্পর্কেও যথার্থ জ্ঞান লাভ হয়।

তদ্রা দ্রষ্টুঃ স্বরুপে অবস্থানম্।। (যোগদর্শন ১/৩)

সূত্রার্থ- অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে জীবাত্মা নিজ স্বরুপে এবং পরমাত্মার স্বরুপে অবস্থান করে।।

প্রকৃতি ও পুরুষের পার্থক্যের জ্ঞানকে 'বিবেকখ্যাতি' বলে। যোগদর্শনের 'বিবেকখ্যাতি' এবং সাংখ্যদর্শনের 'বিবেকজ্ঞান' পরস্পর সমার্থক।

নিযতকারণাত্তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ।। (সাংখ্যদর্শন ১/৫৬)

সূত্রার্থ- যেমন অন্ধকারের বিনাশ হয় তার বিরোধী কারণ আলোর দ্বারা, তেমনি অবিবেকের নাশ তার বিরোধী কারণ বিবেকের দ্বারা হয়।।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে।। (গীতা ১৩/২৩)

অনুবাদ- যিনি এই প্রকার পুরুষতত্ত্ব এবং বিকারাদি গুণ সহিত প্রকৃতিতত্ত্ব অবগত হন, তিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, পুনরায় জন্মলাভ করেন না অর্থাৎ মুক্ত হন।।

▶অবিদ্যা বস্তু না অবস্তু?

সাংখ্যদর্শন অনুসারে অবিদ্যাকে বস্তু ধরা হয়নি, বরং অবস্তু বলা হয়েছে।

বস্তুত্বে সিদ্ধান্তহানিঃ।। (সাংখ্যদর্শন ১/২১)

সূত্রার্থ- অভাবরুপ অবিদ্যাকে বস্তু মানলে দার্শনিক সিদ্ধান্তের হানি হয়।।

অবস্তু বলতে বিনাশ হয় এমন সত্ত্বাকে বোঝায়। আর যার কখনো বিনাশ হয় না, তাকেই বস্তু বলে। যেহেতু ক্রিয়াযোগের দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হয়ে যায় (উপরের আলোচনায় দেখেছি), তাই অবিদ্যা অবস্তুই হবে।

▶ অবিদ্যা কি অনাদি?

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদ অনুসারে অবিদ্যা অনাদি। কিন্তু যা অনাদি, তা অনন্তও হতে হবে। অনাদি সত্ত্বার কখনো বিনাশ হয় না বলেই সে অনন্ত। আর অনন্ত সত্ত্বার কখনো সৃষ্টি হয় না বলেই তা অনাদি। যদি অবিদ্যা অনাদি হয় তবে তা অনন্তও হবে। আর যদি অনন্ত হয়, তবে অবিদ্যার নাশ হবে না। আর অবিদ্যার নাশ না হলে কখনো মোক্ষলাভও সম্ভব না। কিন্তু ক্রিয়াযোগের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলে অবিদ্যার নাশ হয় বলেই অবিদ্যা অনন্ত নয়, তাই অনাদিও নয়। বরং অবিদ্যা হলো প্রবাহরুপে অনাদি। কারণ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসলেই বদ্ধ পুরুষের পুনঃ পুনঃ অবিদ্যার উৎপত্তি হয়। আর বারবার নাশ হয়ে পুনরায় সৃষ্টি হয়ে যায় বলেই অবিদ্যা কে প্রবাহ রুপে অনাদি স্বীকার করা হয়।

▶ঈশ্বরেরও কি অবিদ্যা হয়?

না, ঈশ্বরের কখনোই অবিদ্যা হয় না। কারণ ঈশ্বরকে সাংখ্যদর্শন ১/১৬২-তে 'নিত্যমুক্তত্বম্' বলা হয়েছে। ঈশ্বর যদি অবিদ্যাগ্রস্থ হয়ে বদ্ধ হতেন, তবে তিনি সৃষ্টি আদি কার্য করতে অসমর্থ হতেন। আর যদি মুক্ত হতেন, তবে বুঝতে হবে যিনি এখন মুক্ত তিনিও কখনো না কখনো বদ্ধ ছিলেন। তাই সাংখ্যদর্শন অনুসারে ঈশ্বর মুক্তও নন, বদ্ধও নন। ঈশ্বর সদামুক্ত/নিত্যমুক্ত।

ক্লেশকর্মবিপাকাশযৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।। (যোগদর্শন ১/২৪)

সূত্রার্থ- অবিদ্যা ইত্যাদি পাঁচটি ক্লেশ, শুভ-অশুভ মিশ্রিত কর্ম, সুখ-দুঃখ ভোগের সংস্কার; এই সকল হতে সম্বন্ধরহিত এবং জীব হতে ভিন্ন স্বভাব যুক্ত চেতন বিশেষকে ঈশ্বর বলে।।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্।। (গীতা ১৩/১৭)

অনুবাদ - তিনি সকলের(সূর্যাদিরও) জ্যোতিঃ, তিনি তমের অর্থাৎ অবিদ্যারুপ অন্ধকারের অতীত, তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় তত্ত্ব তিনি জ্ঞানের দ্বারা লভ্য, তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন।।

তথ্যসূত্রঃ

(১) সাংখ্যদর্শন- স্বামী ব্রহ্মমুনিজী পরিব্রাজক [বাংলায় অনুবাদ করে দেয়া]।

(২) সাংখ্যদর্শন- পণ্ডিত যতীন্দ্রনাথ মল্লিক (দেবশর্মন্)

(৩) যোগদর্শন - আচার্য কপিল আর্য(দর্শনাচার্য্য)।

(৪) গীতা- শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির ভিন্নতা

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ সম্পূর্ণ পাঠের ফলে এমনটাই প্রতীত হয় যে, এই উপনিষদের রচনা 'ত্রৈতবাদ'-এর সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের জন্যই করা হয়েছে। কারণ এই উপনিষদে ত্রৈতবাদ অতি স্পষ্ট। এই উপনিষদের প্রারম্ভ এই প্রশ্ন দ্বারা করা হয়েছে— "এই জগতের কারণ কে? আমরা কোথা থেকে উৎপন্ন হয়েছি? আমরা কার দ্বারা জীবিত থাকি? আমরা কার ওপর আশ্রিত? কার ব্যবস্থানুসারে আমরা সুখ-দুঃখ ভোগ করে থাকি?" অর্থাৎ এই উপনিষদে— সৃষ্টির কারণ কী? জীবাত্মার প্রকাশ কীভাবে হয়েছে? এবং ব্রহ্ম সৃষ্টির কীরূপ কারণ? এভাবে অচেতন জগৎ (প্রকৃতি), জীবাত্মা এবং ব্রহ্মের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে।

ঈশ্বর— এই উপনিষদে ঈশ্বরের স্বরূপ এরূপে বর্ণিত হয়েছে— ঈশ্বর জন্মরহিত (২।১৫), এক ও অদ্বিতীয় (৩।২), অতুলনীয় (৩।৯), অরূপ (৩।১০), সর্বব্যাপক (৩।১১), কল্যাণকারী (৩।১১), প্রকাশস্বরূপ (৩।১২), সকল ইন্দ্রিয়ের বন্ধন রহিত (৩।১৭), সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম এবং মহান থেকে অতি মহান (৩।২০) অজর, অনাদি, জন্ম-রহিত, নিত্য (৩।২১), বর্ণ-রহিত (৪।১), প্রাণিগণের শাসক (৪।১৩), জগতের স্রষ্টা (৪।১৪) জগতের রক্ষক

(৪।১৫), অবিনাশী (৪।১৮), মূর্তিহীন বা নিরাকার (৪।১৯), চক্ষু দ্বারা অদর্শনীয় (৪।২০), সংসারের একমাত্র অধিষ্ঠাতা (৫।৪), সৃষ্টি-রচনার নিমিত্ত কারণ (৬।৫), লিঙ্গ-রহিত (৬।৯), চেতনস্বরূপ ও নির্গুণ (৬।১১), সবকিছুর প্রকাশক (৬।১৪) জগতের নিয়ন্তা (৬।১৭), এবং অগ্নি, বায়ু আদি বিভিন্ন নামে তাঁকে সম্বোধন করা হয় (৪।২)।

জীবাত্মা— শরীরে অবস্থিত জীবাত্মার সত্তা স্বীকার করে এই উপনিষদে বলা হয়েছে— 'যদি একটি কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ডে বিভক্ত করা হয়, আবারো সেগুলোর প্রত্যেকটিকে আরো শত খণ্ডে বিভক্ত করা যায়, জীবাত্মাকে সেই ক্ষুদ্রতম ভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম বলে জানা উচিত (৫।৯)। জীবাত্মা 'লিঙ্গ-রহিত' অর্থাৎ এই জীবাত্মা স্ত্রী নন, পুরুষও নন, আবার নপুংসকও নন। যে যে শরীরকে ইনি গ্রহণ করেন, সেই সেই শরীর দ্বারা তিনি সংরক্ষিত হন (৫।১০)। জীবাত্মা কর্মানুসারে বিভিন্ন যোনিতে শরীর ধারণ করে। নিজের শুভ-অশুভ কর্ম দ্বারাই বহুপ্রকার ছোট-বড় শরীর লাভ করে (৫।১১, ১২)। যেরূপ মাটি দ্বারা লিপ্ত স্বর্ণপিণ্ড ভালোভাবে ধুয়ে নিলে সেটি নিজস্ব তেজ (ঔজ্জ্বল্য) দ্বারা চমকাতে থাকে; তদ্রূপ জীব আত্মতত্ত্বকে যথাবৎ জেনে কৃতার্থ ও শোকরহিত হয়ে যায় (২।১৪)। এভাবে এই উপনিষদে স্পষ্টরূপে জীবাত্মার বর্ণনা করা হয়েছে।

ঈশ্বর ও জীবাত্মার ভিন্নতা— এই উপনিষদে দীপের উপমা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যোগী যখন দীপের ন্যায় প্রকাশস্বরূপ আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে এই জীবনে সাক্ষাৎ করেন, তখন তিনি— জন্ম-রহিত, কম্পন-রহিত, সমস্ত তত্ত্ব থেকে অধিক শুদ্ধ পরমাত্মাকে জেনে, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হন (২।১৫)। উপনিষদে জীবাত্মাকে ইন্দ্রিয়যুক্ত শরীরে আবদ্ধ মানা হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বরকে ইন্দ্রিয়-রহিত বলা হয়েছে (৩।১৯)। যখন জীব নিজেকে ও ব্রহ্মকে পৃথক বলে জানেন, তখন তিনি ব্রহ্মের দ্বারা স্বীকৃত হয়ে মোক্ষলাভ করেন (১।৬)। এভাবে জীব ও ব্রহ্ম উভয়কে অনাদি ও ভিন্ন সত্তা রূপে স্বীকার করা হয়েছে।

প্রকৃতি— এই উপনিষদে প্রকৃতির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। শুধু উল্লেখই করা হয়নি, বরং প্রকৃতি ও মায়ার স্বরূপের একত্বকেও স্বীকার করা হয়েছে। এখানে মায়াকে অনির্বচনীয় বলা হয়নি, বরং বলা হয়েছে— মায়াকে 'প্রকৃতি' বলে জানবে এবং মায়ার অধিষ্ঠাতাকে 'মহেশ্বর' বলে জানবে (৪।১০)। এই উপনিষদে প্রকৃতিকে বৃক্ষ রূপেও কল্পনা করা হয়েছে (৬।৬)। একটি উদাহরণ দ্বারা এটাও সিদ্ধ করা হয়েছে যে, এই জগতের নিমিত্তকারণ '**ঈশ্বর**' আর উপাদান কারণ '**প্রকৃতি**'। প্রকৃতিকে '**প্রধান**' শব্দ দ্বারাও সম্বোধন করে বর্ণনা হয়েছে— তন্তু দ্বারা মাকড়সা যেমন নিজেকে আচ্ছাদিত করে, সেভাবেই অদ্বিতীয় পরমাত্মদেব অনায়াসে প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন তন্তুরূপ মায়া-জাল (কার্যরূপ জগৎ) দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদিত করেন (৬।১০)। এখানে মাকড়সার শরীর তন্তুর উপাদান-কারণ এবং মাকড়সার শরীরস্থ আত্মা নিমিত্ত-কারণ। অনুরূপভাবে ঈশ্বর সৃষ্টির (ব্রহ্মাণ্ডের) নিমিত্ত-কারণ এবং প্রকৃতি উপাদান-কারণ। পরমেশ্বর প্রকৃতির মাধ্যমে কার্য-জগতে অবস্থান করে তাতে ব্যাপ্ত থাকেন। এইপ্রকারে প্রকৃতির স্পষ্ট বর্ণনা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বিদ্যমান।

তিন তত্ত্বকে একত্রে বর্ণন— শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এমন অনেক শ্রুতিবাক্য আছে যেখানে ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি এই তিনটি তত্ত্বের বর্ণনা একসাথে করা হয়েছে। শুধু এতটুকুই নয়, বরং তিন সংখ্যা-বাচক শব্দের প্রয়োগ করে

তিনটি তত্ত্বেরই একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনটি তত্ত্বের বিশেষ পার্থক্য স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে— এই তিনটির মধ্যে জীবাত্মা কর্মফলের ভোক্তা, প্রকৃতি ভোগ্য এবং ঈশ্বর প্রেরক (১।১২)। উপনিষদের প্রারম্ভেই ঋষি বর্ণনা করছেন— আমরা যা কিছু গুণগান করছি, তা ব্রহ্মের স্তবগান; কারণ পরব্রহ্মই সর্বাপেক্ষা স্তুতিযোগ্য। এই সংসারচক্রে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি— এই তিন অক্ষর (অবিনাশী) সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন (১।৭)। এই শ্রুতিবাক্যে ত্রৈতবাদের সমর্থক তিন সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। অন্য একটি শ্রুতিতে তিনটি তত্ত্বেরই বিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে— এই প্রকৃতি কার্যরূপে নাশবান, কিন্তু কারণরূপে অবিনাশী। কার্যরূপে দৃশ্যমান (স্থূল) এবং কারণরূপে অদৃশ্য (সূক্ষ্ম)— দুই রূপেই সংযুক্ত এই জগৎকে সকলের স্বামী ঈশ্বরই ধারণ ও পালন করেন। অসমর্থ জীবাত্মা সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল ভোগের কারণে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ। যখন তিনি (জীবাত্মা) সেই পরমাত্মাকে জানতে পারেন, তখন সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হন (১।৮)। এখানে প্রকৃতির দুইটি রূপ বর্ণিত হয়েছে, পরিণামী ও অবিনাশী। এই ভাবকে 'ব্যক্ত' ও 'অব্যক্ত' শব্দ দ্বারা প্রকট করা হয়। ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতিকে একই শ্রুতিতে জন্মরহিত (অনাদি) বলা হয়েছে, যা ত্রৈতবাদ আধারিত। সেই তিনটি তত্ত্বকে নির্দেশ করে ত্রৈতবাদ পর্যায়বাচক শব্দ **'ত্রয়ম্'** এর প্রয়োগ করে তিনটি তত্ত্বের ভেদ প্রতিপাদন করা হয়েছে। পরবর্তী শ্রুতির মূল ভাব— পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই জন্মরহিত, পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, কিন্তু জীবাত্মা অল্পজ্ঞ। নিশ্চয় এক প্রকৃতিও জন্মরহিত এবং ভোক্তা জীবাত্মার ভোগ্য অর্থে যুক্ত হয়েছে। সাধক যখন এই তিনটি মহান তত্ত্বকে সম্যক্ জানতে পারেন, তখন তিনি ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়ে মোক্ষলাভ করেন (১।৯)। ত্রৈতবাদের স্বরূপকে এই শ্রুতিতে অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি— এই তিনটির উল্লেখ আরো শ্রুতিবাক্যে রয়েছে। সেইসব শ্রুতিতে এই জীবাত্মা ও ঈশ্বর একই বৃক্ষরূপ প্রকৃতিতে অবস্থান করে— এমনটা বর্ণনা করে একটিকে **'অনীশ'** এবং অপরটিকে **'ঈশ'** সম্বোধন করে এই ভেদকে অতীব স্পষ্ট করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা প্রকৃতিতে আসক্ত থাকে, ততক্ষণ শোকগ্রস্ত থাকে। কিন্তু যখন জীব নিজে থেকে প্রেরিত হয়ে, নিজ থেকে ভিন্ন ঈশ্বরকে ও তাঁর মহিমাকে উপলব্ধি করে, তখন সে শোক-রহিত হয়ে যায় (৪।৬-৭)। উপনিষৎকারের এই দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ যথার্থ। তিনি এই তিনটি তত্ত্বকেই পরস্পর ভিন্ন সত্তা রূপে স্বীকার করেছেন। এই তিন তত্ত্বের বর্ণনা আরো একটি শ্রুতিতে বিদ্যমান। সেই শ্রুতিতে বর্ণিত হয়েছে— পরিণামধর্মী ক্ষর, প্রধান, জগতের কারণ (প্রকৃতি), দ্বিতীয়টি অমৃত অবিনাশী আত্মতত্ত্ব (জীবাত্মা) এবং তৃতীয়টি জগতের সংহারকর্তা পরমেশ্বর (১।১০)। এদের মধ্যে এক পরমাত্মদেবই প্রকৃতি ও জীবাত্মাকে শাসন করেন। এখানে প্রকৃতিকে পরিণামী নির্দেশ করে জীবকে অপরিণামী সম্বোধন করে এই দুটিকে পরস্পর ভিন্ন তত্ত্বে স্বীকার করা হয়েছে। আর জীব ও প্রকৃতির 'শাসক' সম্বোধন করে এই দুটি তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে। এইপ্রকারে ত্রৈতবাদ দর্শনকে প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই তিনটিকে জন্মরহিত, অনাদি তত্ত্ব প্রতিপাদন করে বর্ণিত হয়েছে— অনাদি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণাত্মক প্রকৃতি নিজের সমান ত্রিগুণময় বহু ভূতসমূহ (কার্যরূপ সৃষ্টি) উৎপন্ন করে থাকে। এই প্রকৃতিকে অনাদি জীবাত্মা ভোগ করে এবং তাতে লিপ্ত হয়। কিন্তু অন্য এক অনাদি পরমাত্মা এই জীব দ্বারা ভুক্ত প্রকৃতিকে ত্যাগ করেন অর্থাৎ তিনি এই প্রকৃতিতে না তো লিপ্ত হন এবং না ভোগ করেন (৪।৫)। আরেকটি শ্রুতিতে এই তিন তত্ত্বের সংকেত দেওয়া হয়েছে। উক্ত শ্রুতিতে বর্ণিত হয়েছে— যিনি মনুষ্যাদি যোনির অধিষ্ঠাতা , যাঁর থেকে জগতের উৎপত্তি হয় এবং প্রলয়কালে যাঁর মধ্যে লীন হয় অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, সেই

বরদাতা, স্তুতিযোগ্য পরমাত্মদেবকে উপলব্ধি করে জীব অত্যন্ত প্রশান্তি লাভ করে (৪।১১)। এই শ্রুতিতে সম্পূর্ণ জগতের অদ্বিতীয় স্বামী ঈশ্বরকে নির্দেশ করা হয়েছে। বস্তুত প্রকৃতিরূপ উপাদান দ্বারা কার্য জগতের উৎপন্ন হওয়া এবং প্রলয়াবস্থায় প্রকৃতিতেই লীন হওয়া— এই দুই অবস্থা সেই কূটস্থ পরমাত্মার আশ্রয়েই হয়ে থাকে। পরমেশ্বর তো কেবল নিমিত্ত-কারণ রূপে নির্দেশিত (৬।৫, ১০)। অতএব উপনিষদের এই উপর্যুক্ত শ্রুতিতেও এরূপ অর্থ গ্রহণ করা উচিত— "**য়স্মিন্** = যে সর্বব্যাপক ঈশ্বরে, **ইদম্** = এই জড়-জগৎ তাঁর মূল উপাদান (প্রকৃতি) থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং তাঁর অভ্যন্তরে লীন হয়ে যায়।" এইপ্রকারে কারণসমূহের অধিষ্ঠাতা সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মদেব। অতএব, তিনটি তত্ত্বেরই বর্ণনা বিদ্যমান এই শ্রুতিতে। এই শ্রুতির ভাবার্থ এই উপনিষদের ই অন্য শ্রুতিবাক্যে আরো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। যিনি সবকিছু বশ করতে সমর্থ এক অখণ্ড পরমেশ্বর অনেক অনেক নিষ্ক্রিয় জড়-ভূতসমূহের এক প্রকৃতিরূপী বীজকে (কারণকে) বহুবিধ রূপে (কার্যে) পরিণত করেন, সেই ঈশ্বরকে যে সমস্ত ধীরগণ নিজের আত্মার মধ্যে স্থিতরূপে উপলব্ধি করেন, তাঁদেরই শাশ্বত সুখের প্রাপ্তি হয়ে থাকে, অপর অজ্ঞানীদের হয় না (৬।১২)। এখানেও ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় সত্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি স্বয়ং নিমিত্ত-কারণ হয়ে উপাদান-কারণরূপ প্রকৃতিতে বিবিধ সৃষ্টি উৎপন্ন করে থাকেন। **'আত্মস্থ'** শব্দ দ্বারা তাঁকে আত্মার মধ্যেও ব্যাপক-রূপে বলা হয়েছে। এখানেও তিনটি তত্ত্বের ভিন্নতা বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এই উপনিষদে ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি একে অপরের থেকে পরস্পর ভিন্নতা এবং এই তিন সত্তার স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। একটি অংশে তো অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, প্রধান (প্রকৃতি) ও ক্ষেত্রজ্ঞ (জীবাত্মা) এই দুটির স্বামী হচ্ছেন পরমেশ্বর (৬।১৬)। '**ত্রৈতবাদ**' সিদ্ধান্তের এর চেয়ে অধিক স্পষ্টীকরণ আর কী হতে পারে!

নেপালের রক্তঋণ -আর্যবীর পণ্ডিত শ্রী শুক্ররাজ শাস্ত্রীর বলিদান

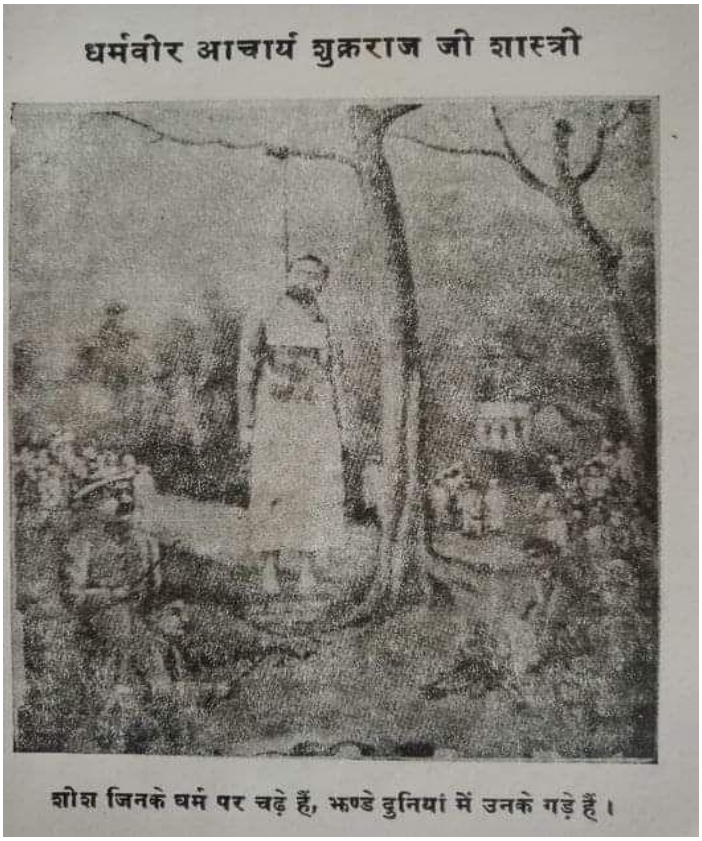

লেখকঃ- শ্রদ্ধেয় স্বামী ওমানন্দ সরস্বতী

সন্দর্ভ পুস্তকঃ- আর্যসমাজের বলিদান

✓ ভূমিকা

নেপাল রাজ্য - আর্যরাজ্য হওয়ার পরেও সুদীর্ঘকাল এ ভূমি পৌরাণিক পাখণ্ডিদের মায়াজালে আবদ্ধ ছিল। একারণে এমনকি বর্তমান সময়েও বিজয়া দশমীর মতো পবিত্র বৈদিক পর্বদিবসে সহস্র সহস্র মূক, নিরপরাধ ছাগল-মহিষ প্রভৃতি প্রাণীদেরকে পাথর-নির্মিত বালকল্পিত, মিথ্যা দেবী-দেবতার কাছে বলি হিসেবে উৎসর্গ করা হয়। উপাসনার উদ্দেশ্যে নির্মিত পবিত্র মন্দিরগুলোতে এই বামমার্গীয় উলঙ্গ বিভৎস নৃত্য দ্বারা ভগবানের পূজার নামে রক্তের নদী বইতে থাকে। এরূপ ঘোর অত্যাচার আর্যসমাজের জন্য সর্বদাই অসহ্য হওয়ায় আর্যসমাজের বীরগণ এইরূপ দুষ্কর্মের বিরুদ্ধে নেপালেও প্রতিবাদী দল প্রস্তুত করা শুরু করে। সেসময় এই নেপালে জন্ম নেয়া নাথ সম্প্রদায়ের এক সন্ত স্বামী শ্রী ব্রহ্মনাথজী আর্যসমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি ভ্রমণার্থে ও তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য প্রায়ই ভারতবর্ষে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি আর্যসমাজের সত্য, পবিত্র সিদ্ধান্তসমূহের প্রবচন শুনে প্রবলভাবে প্রভাবিত হন ও আর্যসমাজী হয়ে যান। তিনি নেপালী ভাষায় সত্যার্থ প্রকাশও অনুবাদ করে ছাপান কিন্তু নেপাল রাজ্যে এই পবিত্র গ্রন্থেরও প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল। কতটা অসহায় পরিবেশ ছিল তখন!

তাই তিনি তখন নেপাল রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত তুলশীপুর আর্যসমাজে সকল সত্যার্থ প্রকাশের কপি রেখে দেন এবং সেখান থেকে গুপ্তরূপে নেপাল রাজ্যে সত্যার্থ প্রকাশ ছড়িয়ে দেয়ার কাজ শুরু করেন। এই তপস্বী সাধু অনুপ্রেরণা দিয়ে অনেক বিদ্যার্থীকে ভারতবর্ষের গুরুকুলগুলোতে শিক্ষার জন্য পাঠাতে থাকেন। এই বিদ্যার্থীদের স্রোতে প০ শ্রী শুক্ররাজ শাস্ত্রী, প০ শ্রী রায়সিংহ তথা প০ শ্রী ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ছিলেন যারা গুরুকুলে স্নাতক হয়ে নেপালে প্রচারের কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁদের কী কী কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তার বাস্তবিক ইতিহাস প০ শ্রী শুক্রবীর শাস্ত্রীর বৃত্তান্ত পড়ার মাধ্যমে সকলে জানতে পারবেন।

✓ প০ শ্রী শুক্ররাজ জীর জন্মপরিচয়

প্রসিদ্ধ আর্যবীর, অমর হুতাত্মা প০ শ্রী শুক্ররাজ জী শাস্ত্রীর জন্ম হয়েছিল আর্যরাজ্য নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে, নেপাল রাজ্যের রাজ জ্যোতিষী শ্রী প০ মাধবরাও জোশীর ঘরে। কাশীতে শ্রী যোশীজীর সাথে মহর্ষি দয়ানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সেখানেই তিনি মহর্ষির প্রবচন শোনেন। তিনি আর্যসমাজ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নেপাল পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে সর্বপ্রথম দৃঢ়ভাবে সিদ্ধান্ত নেন যে প্রথমে নিজের সন্তানদেরকে আর্যসমাজী হিসেবে প্রস্তুত করে আর্যসমাজের জন্য উৎসর্গ করবেন।

একদিকে প০ মাধবরাও জী নেপালে আর্যসমাজের প্রচার আরম্ভ করেন অন্যদিকে তিনি তাঁর দুই পূত্রকেই গুরুকুল সিকন্দরাবাদ জিলা বুলন্দ শহরে শিক্ষার্থে ভর্তি করান। তার্কিক শিরোমণি, শাস্ত্রার্থ মহারথী, বীতরাগ মহাত্মা, স্বামী দর্শনানন্দ জী এই গুরুকুল খুলেছিলেন। এই নিঃশুল্ক গুরুকুলে স্নাতক হয়ে নেপালে প্রচারার্থে যাওয়ার পূর্বে সবাইকে লাহোর থেকে পাঞ্জাবের শাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। এরপর তাঁরা নেপাল গিয়ে ঝড়বেগে তাদের নিজনিজ প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করতেন, এ ঝড়ে পুরাণী, কিরাণী প্রভৃতি পাখণ্ডিরা কীভাবে টিকে থাকবে? এসব স্নাতকের অন্যতম প০ শ্রী শুক্ররাজ জী শাস্ত্রী ছিলেন ধুরন্ধর বিদ্বান ছিলেন। তিনি মূর্তিপূজা, মৃতকশ্রাদ্ধ এবং অবতারবাদের খণ্ডন করতেন কিন্তু নেপালের রাণাগণের রাজ্যে এসব অধর্মের বিরুদ্ধে বলা ঘোর অপরাধ ছিল, এসব জায়গায় এসব অধর্মের বিরুদ্ধে কেউ মুখই খুলতে পারত না। [প্রকৃতপক্ষে, এসব রাণারা ছিল অধর্মের-কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অহংকারী, স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী, ইংরেজদের টাট্টুঘোড়া]

হে বানী! থাকো যদি চুপ তুমি, উড়ে যাবে শির।
করো যদি প্রতিবাদ, বলবে লোকে বীর॥

এমন পরিস্থিতিতে এই বীর বিদ্বানেরা পাষণ্ডদের ক্রর দৃষ্টি থেকে কীভাবে বাঁচত? কিন্তু আমাদের এও মনে রাখতে হবে, বৈদিক ধর্মের এই প্রকৃত বীরেরা কাউকে ভয় করে চলে না। এই নির্ভীকতার সংস্কার তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পিতার নির্ভীকতা থেকে, যার কিছু দৃষ্টান্ত আমরা পাঠকদের জ্ঞাতার্থে এখানে উল্লেখ করছি।

✓ ধর্মের জন্য নিবেদিত পিতার ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রামের সংস্কার

প্রকৃতপক্ষে নেপালে আর্যসমাজের প্রচার নেপালকেশরী বীরশিরোমণি প০ মাধবরাও জোশীর পরিবারের সাথে মূখ্যরূপে জড়িত। শ্রী প০ শুক্ররাজ শাস্ত্রীর পিতা শ্রী মাধবরাও জোশীর জন্ম হয়েছিল নেপালের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শ্রীকণ্ঠরাজ জোশীর ঘরে। ধার্মিক পরিবার হওয়ার কারণে জোশীজী নিজের ঘরেই পৌরাণিক সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা সহজেই লাভ করেন। শিক্ষা লাভের শেষে তিনিও অন্য পৌরাণিকদের মতো বামমার্গের সাধনার শিক্ষা, মাংস-মদের খোলাখুলিভাবে ব্যবহার ও ভক্ষণ ইত্যাদির প্রচার করতে থাকেন। এরপরও তাঁর আত্মায় কিছু পুরোনো সংস্কার ছিল, সেখানের সন্ত, মোহন্ত এবং পূজারিদের পতিত পাখণ্ডপূর্ণ জীবন তাঁর ভালো মনে হয়নি। তাদের কলুষতার কালিমা দেখে তাঁর মনে ঘৃণা উৎপন্ন হওয়া শুরু হয় এবং প্রকৃত-ধর্মজিজ্ঞাসা তাঁর হৃদয়মন্দিরে উৎপন্ন হতে থাকে। মাধবরাওজী প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, মোক্ষম মূহুর্তে তিনি ঘড় ছেড়ে পালান। মাতা পিতার আজ্ঞা না নিয়েই তিনি জগন্নাথ ধাম, পুরীতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি পায়ে হেটেই পাটনা পৌঁছান এবং সেখান থেকে রেলগাড়ীতে চড়ে পুরী পৌঁছান। সেখানেও তিনি ধর্মের নামে ভণ্ডামির সম্মুখীন হন। পুরী থেকে প্রস্থান করে তিনি ধর্মনগরী কাশীতে পৌঁছান। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানেও পাখণ্ডি তিলকধারী পাণ্ডাদের দুষ্কর্ম দেখে নিরাশ হন। সেসময় সারা দেশেই স্বামী শ্রী দয়ানন্দ মহারাজের বড্ড চর্চা হচ্ছিল। সেই কাশীতেই মহর্ষি দয়ানন্দের পবিত্র দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল মাধবরাওজীর। মহর্ষি দয়ানন্দের ভাষণসমূহ শুনে তিনি এতই প্রভাবিত হন যে তাঁর জীবনঘড়ির কাটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। সেসময়েই তিনি বাস্তবিক বৈদিকধর্মী হয়ে যান। তিনি স্বামীজীর পবিত্র দর্শন ও উপদেশসমূহ শুনে বিশেষ উৎসাহের সাথে নিজের দেশ নেপালে পুনরায় ফিরে আসেন।

শ্রী মাধবরাওজী মহর্ষির থেকে শঙ্কা সমাধানের জন্য অনেক প্রশ্ন করেন। জাতি, বর্ণব্যবস্থা, ঈশ্বর নিরাকার না সাকার, পরমেশ্বর প্রাপ্তির উপায়, যম, নিয়ম, যোগসাধন তথা শাস্ত্রের বিরোধ প্রভৃতি বিষয় জিজ্ঞাসা করে তাঁর শঙ্কা সমাধান করেন এবং এ সমাধানে সন্তুষ্ট হয়ে ঋষিরভক্ত হিসেবে পুনরায় নেপাল পৌছান। জোশীজী নেপালের রাজ-পুরোহিত ছিলেন, তাঁর সেখানে বড় সম্মান ছিল। তিনি রাজকুমারদের শিক্ষা দেয়ার কাজে নিজের অধিক সময় ব্যয় করতেন। তিনি স্পষ্টভাষী ও প্রখর উপস্থিত বুদ্ধির ব্যক্তি হওয়ার কারণে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। স্বামী দয়ানন্দের বলিদানের খবর শুনে তিনি বড্ড ধাক্কা খান। এরপর থেকেই ওনার বর্তমান জীবনের প্রতি প্রচুর ঘৃণা ও গ্লানি অনুভূত হতে থাকে এবং তিনি স্বামী দয়ানন্দের দর্শনের দ্বারা পবিত্র হয়ে নিজের জীবন পরিবর্তন করার জন্য বিবশ হয়ে যান। রাজকীয় বিলাসিতা ও সম্মানের প্রতিও তাঁর বৈরাগ্য উৎপন্ন হতে থাকে এবং তিনি নিজের ভাইকে সাথে নিয়ে পুনরায় কাশী চলে যান। কাশী নগরে ওনাদের দুইবছর ধরে স্বাধ্যায় তথা সৎসঙ্গ চলতে থাকে। মাধবরাওজীর সত্যার্থ প্রকাশ পড়ার প্রতি প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেসময় সত্যার্থ প্রকাশ প্রাপ্তি ছিল যেন অমাবস্যার চাঁদ হাতে পাওয়া। বহু চেষ্টা করার পরেও উনি কোথাও থেকে সত্যার্থ প্রকাশ জোগাড় করতে পারেননি।

তাঁর সত্যার্থ প্রকাশ পড়ার ইচ্ছা সে সময় পর্যন্ত কেবল স্বপ্নই ছিল। তিনি আবার নেপাল ফিরে গেলেন। একদিন আরেক প্রসিদ্ধ নেপালী জ্যোতিষী জোশীজীকে তাঁর নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ করেন। সেখানে তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই বার্তালাপ চলছিল কিন্তু হঠাৎ করে জোশীজীর নজর যায় ঘরের এক কোনায় পরে থাকা একটি পুরোনো অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের স্তুপের দিকে। সেখানে তিনি আশ্চর্যের সাথে কয়েকটি পৃষ্টা-ছেঁড়া সত্যার্থ প্রকাশ দেখতে পান। বইটি দেখে তিনি বড় প্রসন্ন হন। বহু প্রতীক্ষার পর তিনি তাঁর কাঙ্খিত বস্তু খুঁজে পেলেন। তিনি বইটি দেখেই আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়েন এবং বইটিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। শ্রদ্ধাপূর্বক সম্পূর্ণ সত্যার্থ প্রকাশ স্বাধ্যায় করার পর বৈদিক সিদ্ধান্তসমূহের যথাযথ জ্ঞান হওয়ায় বৈদিক সিদ্ধান্তের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আরো অধিক বৃদ্ধি পায় এবং সকল শঙ্কা পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়। এরপর থেকেই তিনি কোন পরিণামের চিন্তা না করে আর্যসমাজের প্রচারে পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

"যে বলে বৈদিক ধর্মের জয়, সেই হয় অভয়"- এই নির্ভীক জ্বয়ধ্বনি ঋষি দয়ানন্দ ও আর্যসমাজের দান। যিনিই আর্যসমাজের ছত্রছায়ায় আসেন তিনিই নির্ভয়তার অমৃতপান করেন। মাধবরাওজীও নির্ভীক হয়ে সমগ্র নেপালে আর্যসমাজের প্রচারের দুন্দুভী বাজান। ফলশ্রুতিতে নেপালের সর্বত্র আর্যসমাজের চর্চা হতে থাকে। এদিকে আর্যসমাজের বিরোধীরাও সত্য না মেনে নিয়ে জোশীজীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাঁর নামে কানভাঙানি দেয়া শুরু করে। বিরোধীদের এই অভিযোগসমূহের কারণে জোশীজীকে রাজদরবারে ডাকানো হয়। সেসময় সরকার দেব শমশের জঙ্গবাহাদুর রাণাজী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি জোশীজীর বাল্যমিত্র ছিলেন। বাল্যকালের সখা হওয়ার কারণে অনেক বর্ষ তারা একসাথে খেলাধুলা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রেমপূর্বক বললেন, "মাধব! তুমি আর্যসমাজের এই গঙ্গায় ডুব দিয়ো না। যদি আমার কথা না মানো তবে এতে তলিয়ে যাবে। অতএব তুমি নিজে এ থেকে বাঁচো, অন্যকেও বাঁচাও।" উত্তরে যোশীজী বলেন, "হে দেব! এই অমৃতময়ী গঙ্গায় ডুব দিলে এর যে অমৃতপূর্ণ জলবিন্দু মুখ দিয়ে পেটে প্রবেশ করে তা আমার কাছে সুমিষ্ট ও মধুর মনে হয়। শ্রীমান্ দেব তূল্য, শ্রী মহারাজও স্বয়ং এই অমৃত পান করে আনন্দিত হবেন তথা প্রজাদেরও অমৃতপান করিয়ে পূণ্যভাগী হবেন।" শ্রী মহারাজ জোশীজীর বচন শুনে ওনার বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ থেকে ওনাকে মুক্ত করে দেন। সেবার মহারাজের প্রেম এবং উদারতার কারণে জোশীজী বেঁচে যান। বিরোধীদের ষড়যন্ত্র সেইবার সফল হয়নি। কিন্তু মহারাজ চন্দ্র শমশের রাণাজীর শাসনকালে বিরোধীরা পুনরায় ষড়যন্ত্র করার সুঅবসর পান।

✓ তিরস্কার

একবার শাস্ত্রার্থের বাহানায় জোশীজীকে দরবারে ডেকে খুব মারপিট করা হয়, এরপর এক ক্ষুদ্র কুঠুরিতে বন্দি করে রাখা হয়। অন্য আর্যসমাজীদেরও উপরে ভয়ানক অত্যাচার শুরু হয়। যোশীজীকে মার-পিটের পরে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত অবস্থায় সিপাহীদের দ্বারা বেধে পুরো নগরে খুবই জঘন্যভাবে ঘুরানো হয়। নিজের পিতার এই দুর্দশা শুক্ররাজ শাস্ত্রী তাঁর নিজের চোখে বাল্যকালেই দেখেছিলেন। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য বালকের সুকোমল হৃদয়ে এক গভীর ছাপ ফেলে। এসমস্ত দৃশ্য বালক এক দোকানে বসে বসে নিজের চোখেই দেখছিলেন। জোশী

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও একইভাবে নির্মম অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছিল। এক ধর্মাত্মা ব্যক্তির ধার্মিক পরিবারকে এরূপ বিকট ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে দেখে, এরূপ ভয়ঙ্কর দূর্যোগের মুখোমুখি হয়ে অনেক মহান ধৈর্যশীল ব্যক্তিরও ধৈর্যচ্যুতি হয় কিন্তু জোশীজীর পরিবার এরূপ পরিস্থিতিতেও ভীত হলো না। এসময় যদি যোশীজী ক্ষমাপ্রার্থনা করতেন তবে তিনি এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করতে পারতেন কিন্তু তিনি মহারাজা ভর্তৃহরি বিরচিত ও মহর্ষি দয়ানন্দের প্রিয়বচন নিজের হৃদয়ে খোদাই করে রেখেছিলেন-

নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায়্যাৎপথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥
[ভর্তৃহরি নীতিশতক ৮৫]

অর্থাৎ, নীতিকুশল লোক আমার নিন্দা করুক বা প্রশংসা করুক, আমার ধন-বৈভব অর্জিত হোক বা নষ্ট হোক, আজই মৃত্যু হোক বা দীর্ঘায়ু লাভ হোক - এরূপ সকল দূর্ঘট পরিস্থিতেও ধৈর্যবান ও নীতিজ্ঞ সৎপুরুষ সন্মার্গ থেকে বিচলিত হয়ে কখনো এর প্রতিকূল আচরণ করেন না।

এরূপ আদর্শকে ধারণ করে জোশীজী ক্ষমাভিক্ষা করতে অস্বীকার করলেন। কারাগারে বসেই তিনি খবর পেলেন মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথেই তাকে পুনরায় খুবই জঘন্যরকম অমমান করা হবে। মুখে কালি মেখে মহিষের পিঠে চড়িয়ে তাঁকে সারা নগরে ঘুরানো হবে এবং তাঁর গলায় একটি বোর্ড ঝোলানো হবে যাতে লেখা থাকবে - "নেপালের জনতার মনে আতঙ্ক উৎপন্ন করা ব্যক্তিকে এই দণ্ড দেয়া হলো।" একথা শুনে তিনি জেল থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং সুযোগ পেয়েই নিজের এক সাথীকে নিয়ে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান।

কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি তাঁর পরিবারসমেত বীরগঞ্জ থেকে রক্সোল হয়ে গোরখপুর পৌঁছান। তাঁর সাহসী কার্যকলাপের ব্যাপক আলোচনা শুনে বিভিন্ন প্রান্তের আর্যসমাজের সভাসমূহ তাঁকে ভরপুর সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে। তাঁর সন্তানদের শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থাও করে দেয়া হয়। শুক্ররাজজীকেও গুরুকুল সিকন্দারাবাদে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয় এবং সেখান থেকেই তিনি বিদ্বান্ স্নাতক হিসেবে প্রচারকার্যের জন্য বেরিয়ে আসেন।

✓ কার্যক্ষেত্রে প০ শুক্ররাজ শাস্ত্রী

ভারতে বিদ্যাধ্যয়ন সম্পন্ন করে প০ শুক্ররাজ শাস্ত্রী নেপালে গিয়ে সেখানে মহারানা ৩ মহারাজ চন্দ্র শমশেরের সাথে দেখা করেন। রানা জোশীজীর প্রতি করা ব্যবহারের জন্য অনুতাপ করেন তথা শাস্ত্রীজীকে

নির্ভীক ও স্বতন্ত্র শাস্ত্রার্থের জন্য আমন্ত্রণ জানান, শাস্ত্রীজীও সহর্ষে সে আমন্ত্রণ স্বীকার করেন। মহারাজের গুরু শ্রী হেমরাজের সাথে তাঁর শাস্ত্রার্থ হয়। শাস্ত্রার্থে শুক্ররাজ শাস্ত্রী মূর্তিপূজার প্রবল খণ্ডন করেন এবং শ্রী হেমরাজকে নিরুত্তর করে দেন। এই খণ্ডন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহারাণারকেও প্রচণ্ড রাগান্বিত করে কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞানুযায়ী তিনি শাস্ত্রীজীকে বাড়ি ফিরে যেতে দেন।

শাস্ত্রীজীর কাছে সংবাদ আসে যে মহারাণা তাঁর প্রতি অপ্রসন্ন হয়েছেন তাই তিনি একবার পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন। মহারাজও বুঝে যান যে এই পরিবারের অস্তিত্ব থাকলে নেপালেও আর্যসমাজের প্রচার বৃদ্ধি পাবে সুতরাং তিনি এই পরিবারকে সমূলে বিনষ্ট করার সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহারাজ কিছু অযুহাত দিয়ে পুনরায় নেপালে ডাকেন এবং শাস্ত্রীজীর সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করতে থাকেন। শাস্ত্রীজীও এর মধ্যে সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে যান এবং পুনরায় ভারতে ফিরে এসে প্রয়াগে অবস্থান করে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হন।

এরই মধ্যে তাঁর কাছে খবর আসে যে তাঁর ভাই এবং তাঁর পত্নী দুজনেই স্বর্গগত হয়েছেন। এতেও তিনি তাঁর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে বলেন- "১৪বছর বয়সী এক কন্যার সাথে আমার বিবাহ হয়েছিল, তাঁর সাথে আমার কোন দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি। আমি আদিত্য ব্রহ্মচারী, এখন আমি অধিক স্বতন্ত্রতাপূর্বক নেপালে আর্যসমাজ ও সমাজসংস্কারের কাজ করতে পারব। এই পবিত্র কাজের জন্য যদি আমার দেহত্যাগও করার প্রয়োজন হয় তবে তাও আমি সহর্ষে করব।" নেপালে তখন এক নিয়ম ছিল, "যে ব্যক্তি তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের বিয়ে না করাবেন তাকে তার জাতি থেকে বহিস্কার করা হবে।" শাস্ত্রীজীর প্রভাবেই নেপালে এই নিয়মেরও উচ্ছেদ হয়। তাঁর প্রভাবেই 'ত্রিবেন্দ্র কলেজ' এও প্রতিষ্ঠিত হয়।

✓ প০ মদনমোহন মালবীয়ের সাথে সাক্ষাৎ

হঠাৎ একদিন শুক্ররাজ শাস্ত্রীর কাছে খবর আসে কোলকাতায় প০ মদনমোহন মালবীয় এসেছেন। শাস্ত্রীজী তাঁর সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে নেপালের পরিস্থিতি জানান। মালবীয়জী তাঁর পরিবারের কাজে অত্যন্ত প্রভাবিত হন তথা ভবিষ্যতেও তাঁকে কাজে লেগে থাকার প্রেরণা দেন ও কিছু আর্থিক সহায়তাও করেন। দার্জিলিং পৌঁছে শাস্ত্রীজী তাঁর প্রচার কার্য আরো তীব্র গতিতে করতে থাকেন এবং 'দয়ানন্দ এংলো বৈদিক হাই স্কুল', হিন্দু মহাসভা এবং প্রাচ্য হিন্দু মহাসভা স্থাপন করেন।

✓ মোহনচাঁদ গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ

একবার মোহনচাঁদ গান্ধী কলকাতা যান তখন শাস্ত্রীজী তার সাথেও মিলিত হন এবং নেপালের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে দুজনে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনা করেন। নেপালের গুপ্তচর তাঁর পিছে লেগেই ছিল,

সে শাস্ত্রীজীর সকল খবরাখবর মহারাণার কাছে পাঠাতে থাকে। শাস্ত্রীজী সেসময় মোহনচাঁদ গান্ধীকে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের ভামতী টীকার উপরে করা তাঁর নিজের ভাষ্য উপহার দেন। এই ভাষ্যের এক কপি আমার কাছেও আছে।

✓ নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর সাথে সাক্ষাৎ

সেদিন মোহনচাঁদ গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর যখন শাস্ত্রীজী ফিরে যাচ্ছিলেন তখন পথে তাঁর সাথে নেতাজীর সাক্ষাৎ হয়, এসময়ও নেপালের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে দুজনের দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনা করেন। সংবাদপত্রের সাংবাদিকও তখন সেখানে ছিল। এই সম্মেলনের বিস্তৃত বিবরণ পরেরদিনই 'নেপালের সমাজসংস্কারক ও রাষ্ট্রনেতা প০ শুক্ররাজ শাস্ত্রী গান্ধীজী ও নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসুর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নেপালে সুধারকর্ম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন' এই শিরোনামে সকল সংবাদপত্রে ছাপানো হয়। এ খবরে সারা নেপালে প্রচুর হুলস্থুল শুরু হয়।

✓ শাস্ত্রীজীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চুড়ান্ত পর্যায়

রাজপুরোহিত এবং পূজারীরা এই পরিস্থিতির লাভ উঠান এবং সরকারকে শাস্ত্রীজীর বিরুদ্ধে তীব্রভাবে উত্তেজিত করে তোলেন। শাস্ত্রীজীর হিতাকাঙ্ক্ষীগণ তাঁকে জানান যে নেপালের পরিস্থিতি তাঁর সম্পূর্ণ প্রতিকূল সুতরাং এ অবস্থায় তিনি যেন নেপালে না আসেন। কিন্তু শাস্ত্রীজী ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভীক। তিনি তাদের জানান - আমি নির্ভীক সন্ন্যাসী মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্য, নিজের ধর্মপ্রচারের কাজে আমি মৃত্যুরও পরোয়া করিনা সুতরাং আমি নেপালে গিয়ে আর্যসমাজের প্রচার অবশ্যই করব।

এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে শাস্ত্রীজী নেপালে চলে আসেন এবং নিজের সহযোগীদের সাথে মিলে ' 'প্রজা পরিষদ' নির্মাণ করেন। এই পরিস্থিতি দেখে মহারাণা সরকার নিজের বাস্তবিক কুটিল স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং পূর্বরচিত ষড়যন্ত্রে আস্থা রেখে তদানুযায়ী কার্য শুরু করে। শাস্ত্রীজী এবং তাঁর পরিষদের সদস্যদের জেলে ঢোকানো হয়। শাস্ত্রীজীর বিরুদ্ধে আরোপ দেয়া হয় যে তিনি ভারতে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের সাথে মিলে নেপালের সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। এই দোষে অভিযুক্ত করে শাস্ত্রীজীকে রাণার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। শাস্ত্রীজী সালামের স্থানে 'নমস্তে' করলেন। [শাস্ত্রীজীকে নমস্তে করতে দেখে উত্তেজিত হয়ে রাণা বললেন, শাস্ত্রী তুমি এখানেও কুটিলতা করেছ, এক হাতে সালাম করার পরিবর্তে তুমি দুই হাতজোর করে নমস্তে করেছ। এ আমাদের জন্য অপমান। তোমাকে এর সাজা শীঘ্রই ভোগ করতে হবে।] তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি ও তর্কপূর্ণ বার্তালাপের সাথে সকলের পরিচিত ছিলেন। সকলে তাঁকে বিপ্লবীদের গুরু মানতেন। তাই রাণার সরকার সর্বপ্রথমেই তাঁকে নিধনের পরিকল্পনা সাজায় একইসাথে তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আরোপ লাগানোর চেষ্টা করে যে, শাস্ত্রীজী 'নারায়ণ হট্টীর রক্তপাত কাণ্ড' সংগঠিত করে রাণাদের মারার চেষ্টা চালিয়েছেন।

নেপালের জনসাধারণ তখন একদিকে রাণার কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকেন যে শাস্ত্রীজীকে যেন ক্ষমা করে দেয়া হয় অন্যদিকে শাস্ত্রীজীকেও ক্ষমা চাওয়ার অনুরোধ জানাতে থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রীজী তৎক্ষণাৎ এর বিরোধিতা করে বলেন, আমার তো কোন দোষই নেই তবে আমি কেন ক্ষমা চাইব? যদি আমার বাস্তবিক কোন অপরাধ থেকেই থাকে তবে আমার তো দণ্ডই পাওয়া উচিত। কয়েকদিন পরে শাস্ত্রীজীকে বিচারবহির্ভূতভাবে ফাঁসির সাজা শুনিয়ে পুনরায় জেলে পাঠানো হয়। জনসাধারণ তাঁর ধর্মের প্রতি প্রবল দৃঢ়তা দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হন।

✓ ধর্মের জন্য সহর্ষে জীবন বলিদান

অন্তিম দিন সন্ধ্যাবেলায় শাস্ত্রীজী ভোজনের জন্য কেবল বসেছেন এমন সময়েই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়। ভোজন সেখানেই থেকে গেলো। রাত ঠিক ১২ টায় পুলিশ কর্মচারী ভর্তি একটি গাড়ি জেলে প্রবেশ করে। তার ঠিক পিছনেই দ্বিতীয় গাড়িতে রাণা শমশের এবং অন্য আধিকারিকগণ আসেন। জনবিদ্রোহ এড়াতে প০ শুক্ররাজ শাস্ত্রীকে দড়ি দিয়ে বেধে নগর থেকে দূরে নেপাল-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত এক জঙ্গলে নিয়ে যাওয়া হয়। এক বড় বৃক্ষের নিচে কিছু ইটের উপরে শাস্ত্রীজীকে দাঁড় করানো হয়। এই বৃক্ষের ডালেই ফাঁসির দড়ি ঝুলানো ছিল। তিনি পুলিশ কর্মচারীদের সড়িয়ে দিয়ে ফাঁসির দড়ি স্বয়ং নিজের গলায় লাগিয়ে নেন। [শোনা যায় যে ইটের উপরে শুক্ররাজ শাস্ত্রীকে দাঁড় করানো হয়েছিল সেই ইট বীর স্বয়ং নিজের পা দিয়ে ঠেলে ফেলে দেন] কয়েক মূহুর্তেই দড়িতে টান পড়ে আর শাস্ত্রীজী "ওও৩ম্ - ওও৩ম্" উচ্চারণ করতে করতে তাঁর নশ্বর শরীরকে আর্যসমাজের উদ্দেশ্যে বলিদান করলেন। এই বলিদান একইসাথে রাণা সরকারের কপালে অসীমকালের জন্য এক কলঙ্কের টীকা লাগিয়ে দিল। জনসাধারণকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার জন্য শাস্ত্রীজীর মৃতদেহ ৮প্রহর ধরে সেখানেই ঝুলিয়ে রাখা হয় আর তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহের গলায় একটি কাঠের বোর্ড ঝুলিয়ে তাতে লিখে দেয়া হয়- "আর্যসমাজী হওয়ার কারণেই সমগ্র দেশে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী, স্বাধীনতাকামী বিপ্লবীদের এই গুরু এরূপ শাস্তিরই যোগ্য ছিল।"

এই বৃক্ষ আজও নেপালের রাজমার্গে দাড়িয়ে থেকে অমর হুতাত্মা পণ্ডিত শ্রী শুক্ররাজ জী শাস্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভারত নেপালের সীমানায় এই স্থানটি আজও 'পচলী ঘাট' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এখনও জনসাধারণ এই গাছের শিকড়ে তিলক লাগান। স্থানটিকে অতিক্রম করা প্রত্যেক যাত্রীর মস্তক এখানে এসে শাস্ত্রীজীর প্রতি শ্রদ্ধায় নত হয়ে যায়।

বস্তুতঃ আর্যসমাজের বলিবেদীর উপরে নিজেকে আহুত করে শাস্ত্রীজী তাঁর ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য নেপালে বৈদিক ধর্ম প্রচারের মার্গ প্রশস্ত করে যান। যুগ-যুগান্তর ধরে শ্রী শাস্ত্রীজীর এই পবিত্র বলিদান রাষ্ট্রসেবকদের প্রেরিত করতে থাকবে। শ্রী শুক্ররাজ শাস্ত্রীর পরে তাঁর সাথী প্রসিদ্ধ আর্যসমাজী শ্রী গঙ্গালালজীকে গাছের সাথে

বেধে গু*লি করে হ*ত্যা করা হয়। তাঁর দ্বিতীয় সহযোগী শ্রী ধর্মভক্তজীকেও একইভাবে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়ে হ*ত্যা করা হয়। পাঞ্জাব নিবাসী শ্রী মাস্টার গুরুদয়াল সিংহজীও একইভাবে বীরগতি প্রাপ্ত হন। দেশ থেকে নির্বাসিত তাঁর অনেক অনুসারীকে পরবর্তীতে জেলে বন্দি করা হয়। অনেক বলিদানকারীর নাম পর্যন্ত জানা যায়নি। নেপালে আজ যত পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় তার সবটুকুই এরূপ বীর হুতাত্মাদের পবিত্র বলিদানের সুপরিণাম।

নোটঃ- সংযুক্ত ছবিটি হরিয়ানা সাহিত্য সংস্থান, গুরুকুল ঝজ্জর থেকে প্রকাশিত শাস্ত্রার্থকেশরী প০ শ্রী অমর স্বামী শাস্ত্রীজীর পুস্তক শ্রী শুক্ররাজ শাস্ত্রীজীর বলিদান নামক পুস্তক থেকে নেয়া হয়েছে।

উপনিষদ্ বিষয়ক মহর্ষি দয়ানন্দের বচন

১. "বেদান্তসূত্র অধ্যয়নের পূর্বে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য এবং বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করবে। ছয় (দর্শন) শাস্ত্রের ভাষ্যবৃত্তি সূত্র দুই বছরের মধ্যে পড়াবে এবং পড়বে।" (স০ প্র০ ৩য় সমু০)

২. "বেদান্ত শাস্ত্র যেগুলো ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদ্ এবং ব্যাসমুনিকৃত সূত্র যেগুলো বৌধায়ন বৃত্ত্যাদি ব্যাখ্যাসহ

আছে, তাকে বেদান্ত-শাস্ত্র বলে॥" (ঋ০ ভা০ ভূ০, গ্রন্থপ্রামাণ্যবিষয়ঃ)

৩. "বেদের ছয় উপাঙ্গ অর্থাৎ যাকে ষট্শাস্ত্র বলে।" (ঋ০ ভা০ ভূ০ গ্রন্থপ্রামা০)

৪. "শারীরকসূত্রাণি তত্রোপনিষন্মন্ত্রাণাং ব্যাখ্যানমস্তি।" (পত্রবিজ্ঞাপন ২) অর্থাৎ শারীরক সূত্র (ব্রহ্মসূত্র) উপনিষদের মন্ত্রের ব্যাখ্যান।

৫. "কেন থেকে শুরু করে বৃহদারণ্যক পর্যন্ত নয়টি উপনিষদ্ ব্রাহ্মণগ্রন্থান্তর্গত হওয়ার কারণে তাদেরও "ব্রাহ্মণানীতিহাসান্" এই বচন অনুসারে ইতিহাস সংজ্ঞা।" (ল০ গ্র০ সং০ ৩৬৪ পৃঃ)

৬. "উপনিষদে জীব ও পরমাত্মার ভিন্নতা অনেক স্থানে দেখানো হয়েছে। সকল জীবে পরমাত্মা অন্তর্যামীরূপে স্থিত, কারণ সেই পরমাত্মার ব্যাপকত্বাদি ধর্ম উপনিষদের সর্বত্র ব্যাখ্যাত।" (স০ প্র০ ১১শ সমু০)

৭. "এক ঈশাবাস্য উপনিষদ্ তো যজুর্বেদের চল্লিশ অধ্যায় হওয়ার কারণে বেদ।" (ল০ গ্র০ সং০ ৩৬৪ পৃঃ)

৮. "যদি বেদে পরাবিদ্যা না থাকতো, তবে **'কেন'** আদি উপনিষদ্ কোথা থেকে আসলো? **মূলং নাস্তি কুতঃ শাখাঃ**? যদি পরমেশ্বর নিজের প্রোক্ত বেদে নিজের স্বরূপবিদ্যার প্রকাশ না করতেন, তাহলে কোনো ঋষি-মুনির

ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণনা করার সামর্থ্য হতো না। কেননা, কারণ বিনা কার্য হওয়া সর্বথা অসম্ভব।" (ল০ গ্র০ সং০ ৩৬৬ পৃঃ)

৯. "যেমন এই উপনিষদ্ (অল্লোপনিষদ্) রচনা করা হয়েছে, তেমনি অনেক উপনিষদ্ মত-মতান্তরে পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিগণ রচনা করেছেন। যেমন স্বরোপনিষদ্, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী, গোপালতাপনী আরো অনেক।" (স০ প্র০ ১৪ সমু০)

১০. 'কালাগ্নিরুদ্রোপনিষদ্' কোনো 'ছাইমাখা' অর্থাৎ ভস্মধারী ব্যক্তি রচনা করিয়াছে। (স০ প্র০ ১১ সমু০)

মহর্ষি দয়ানন্দের উপর্যুক্ত বচন দ্বারা অনেক কথা স্পষ্ট হয়ে যায়। তার মধ্যে কিছু তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১. উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয় এক।

২. মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী ঈশাদি দশ উপনিষদকেই বিশেষত প্রামাণিক মেনেছেন। কারণ সেগুলো বেদ-মূলক। আর উপনিষদ্-সমূহে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

৩. উপনিষদে যে ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণনা আছে, তার আদি মূল বেদ। উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যার আদিস্রোত নয়, বরং আদিস্রোত তো বেদ। উপনিষৎকার ঋষিগণ বেদ অধ্যয়ন করেই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছেন। বেদে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা দুটিরই বর্ণনা আছে।

৪. 'কেন' থেকে শুরু করে 'বৃহদারণ্যক' পর্যন্ত নয়টি উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের অন্তর্গত।

ঔপনিষদ্ ব্রহ্ম

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ নমঃ পরমঋষিভ্যো নমঃ পরমঋষিভ্যঃ, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, পরম ঋষিগণকে নমস্কার করি, এবং অদ্যকার সভায় সমাগত আর্য্যমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করি— ব্রহ্মবাদী ঋষিরা যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সে কি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? অদ্য আমরা কি তাঁহাদের সহিত সমস্ত যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি? বৃক্ষ হইতে যে জীর্ণ পল্লবটি ঝরিয়া পড়ে সেও বৃক্ষের মজ্জার মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তির সঞ্চার করিয়া যায় সূর্য্যকিরণ হইতে যে তেজটুকু সে সংগ্রহ করে তাহা বৃক্ষের মধ্যে এমন করিয়া নিহিত করিয়া যায় যে মৃত কাষ্ঠও তাহা ধারণ করিয়া রাখে, আর আমাদের ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ ব্রহ্ম-সূর্য্যলোক হইতে যে পরম তেজ, যে মহান্ সত্য আহরণ

করিয়াছিলেন তাহা কি এই নানা শাখাপ্রশাখা-সম্পন্ন বনস্পতির, এই ভারতব্যাপী পুরাতন আর্য্যজাতির, মজ্জার মধ্যে সঞ্চিত করিয়া যান নাই?

তবে কেন আমরা গৃহে গৃহে আচারে অনুষ্ঠানে কায়মনে বাক্যে তাঁহাদের মহাকাব্যকে প্রতি মুহূর্ত্তে পরিহাস করিতেছি? তবে কেন আমরা বলিতেছি, নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের গম্য নহেন, আমাদের ভক্তির আয়ত্ত নহেন, আমাদের কর্ম্মানুষ্ঠানের লক্ষ্য নহেন? ঋষিরা কি এ সম্বন্ধে লেশমাত্র সংশয় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কি প্রত্যক্ষ এবং তাঁহাদের উপদেশ কি সুস্পষ্ট নহে? তাঁহারা বলিতেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি

ন চেৎ ইহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে যদি তাঁহাকে জানা যায় তবেই জন্ম সত্য হয়, যদি না জানা যায় তবে **"মহতী বিনষ্টিঃ"**, মহা বিনাশ। অতএব ব্রহ্মকে না জানিলেই নয়। কিন্তু কে জানিয়াছে? কাহার কথায় আমরা আশ্বাস পাইব? ঋষি বলিতেছেন—

ইহৈব সন্তোহথ বিদ্মস্তৎ বয়ং

ন চেৎ অবিদির্মহতী বিনষ্টিঃ।

এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে আমরা জানিয়াছি, যদি না জানিতাম তবে আমাদের মহতী বিনষ্টি হইত। আমরা কি সেই তত্ত্বদর্শী ঋষিদের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তরে কেহ কেহ সবিনয়ে বলেন আমরা অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ঋষিদের সহিত আমাদের অনেক প্রভেদ; তাঁহারা যেখানে আনন্দে বিচরণ করিতেন আমরা সেখানে নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি না। সেই প্রাচীন মহারণ্যবাসী বৃদ্ধ পিপ্পলাদ ঋষি এবং **সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ শৈবশ্চ সত্যকামঃ, সৌর্য্যায়ণী চ গার্গ্যঃ, কৌশল্যশ্চাশ্বলায়নো ভার্গবো বৈদর্ভিঃ কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রহ্মান্বেষমাণাঃ**— সেই ভরদ্বাজপুত্র সুকেশা, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি, কাত্যায়নপুত্র কবন্ধী, সেই ব্রহ্মপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পরংব্রহ্মান্বেষমাণ ঋষিপুত্রগণ, যাঁহারা সমিৎ হস্তে বনস্পতিচ্ছায়াতলে গুরুসম্মুখে সমাসীন হইয়া ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতেন তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা হয় না।

না হইতে পারে, ঋষিদের সহিত আমাদের প্রভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু সত্য এক, ধর্ম্ম এক, ব্রহ্ম এক;— যাহাতে ঋষিজীবনের সার্থকতা, আমাদের জীবনের সার্থকতাও তাহাতেই; যাহাতে তাঁহাদের মহতী বিনষ্টি তাহাতে আমাদের পরিত্রাণ নাই। শক্তি এবং নিষ্ঠার তারতম্য অনুসারে সত্যে ধর্ম্মে এবং ব্রহ্মে আমাদের ন্যূনাধিক অধিকার হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া অসত্য অধর্ম্ম অব্রহ্ম আমাদের অবলম্বনীয় হইতে পারে না। ঋষিদের সহিত আমাদের ক্ষমতার প্রভেদ আছে বলিয়া তাঁহাদের অবলম্বিত পথের বিপরীত পথে গিয়া আমরা সমান ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না। যদি তাঁহাদের এই কথা বিশ্বাস কর যে, **ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি,** এখানে তাঁহাকে জানিলেই

জীবন সার্থক হয়, নচেৎ **মহতী বিনষ্টিঃ,** তবে বিনয়ের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত মহাজনপ্রদর্শিত সেই সত্যপথই অবলম্বন করিতে হইবে।

সত্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলেরই পক্ষে এক মাত্র এবং ঋষির মুক্তিবিধানের জন্য যিনি ছিলেন আমাদের মুক্তিবিধানের জন্যও সেই একমেব অদ্বিতীয়ং তিনি আছেন। যাঁহার পিপাসা অধিক তাঁহার জন্যও নির্ম্মল নির্ঝরিণী অভ্রভেদী অগম্য গিরিশিখর হইতে অহোরাত্র নিঃস্যন্দিত, আর যাঁহার অল্প পিপাসা এক অঞ্জলি জলেই পরিতৃপ্ত তাঁহার জন্যও সেই অক্ষয় জলধারা অবিশ্রাম বহমানা,— হে পান্থ, হে গৃহী, যাহার যতটুকু ঘট লইয়া আইস, যাহার যতটুকু পিপাসা পান করিয়া যাও।

আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসর সংকীর্ণ তথাপি সমুদয় সৌর জগতের একমাত্র উদ্দীপনকারী সূর্য্যই কি আমাদিগকে আলোক বিতরণের জন্য নাই? অবরুদ্ধ অন্ধকূপই আমাদের মত ক্ষুদ্রকায়ার পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারে, তবু কি অনন্ত আকাশ হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি? পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র একাংশ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান থাকিলেই আমাদের জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায়, তবু কেন মনুষ্য চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারার অপরিমেয় রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অশ্রান্ত কৌতূহলে নিরন্তর লোকলোকান্তরে আপন গবেষণা প্রেরণ করিতেছে? আমরা যতই ক্ষুদ্র হই না কেন তথাপি **ভূমৈব সুখং**, ভূমাই আমাদের সুখ, **নাল্পে সুখমস্তি**, অল্পে আমাদের সুখ নাই। হঠাৎ মনে হইতে পারে ব্রহ্ম হইতে অনেক অল্পে, পরিমিত আকারবদ্ধ আয়ত্তগম্য পদার্থে আমাদের মত স্বল্পশক্তি জীবের সুখে চলিয়া যাইতে পারে— কিন্তু তাহা চলে না। **ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ং**— যিনি উত্তরতর অর্থাৎ সকলের অতীত, যাঁহাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না, যিনি অশরীর, রোগশোকরহিত— **য এতদ্‌বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি**, যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারাই অমর হন— **অথ ইতরে দুঃখমেব অপিয়ন্তি**, আর সকলে কেবল দুঃখই লাভ করেন।

উপনিষৎ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি।

তিনি সত্য, তিনি অমৃত, তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য, তাঁহাকে বিদ্ধ কর!

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং

উপনিষদে যে মহাস্ত্র ধনুর কথা আছে, সেই ধনু গ্রহণ করিয়া—

শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত

উপাসনা দ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে!

আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি।

তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্যস্বরূপ সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর!

এই উপমাটি অতি সরল। যখন শুভ্র সবলতনু আর্য্যগণ আদিম ভারতবর্ষের গহন মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, যখন হিংস্র পশু এবং হিংস্র দস্যুদিগের সহিত তাঁহাদের প্রাণপণ সংগ্রাম চলিতেছে, তখনকার সেই টঙ্কারমুখর অরণ্য-নিবাসী কবির উপযুক্ত এই উপমা!

এই উপমার মধ্যে যেমন সরলতা তেমনি একটি প্রবলতা আছে। ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিতে হইবে— ইহার মধ্যে লেশমাত্র কুণ্ঠিত ভাব নাই। প্রকৃতির একান্ত সারল্য এবং ভাবের একাগ্র বেগ না থাকিলে এমন অসঙ্কোচ বাক্য কাহারো মুখ দিয়া বাহির হয় না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-দ্বারা যাঁহারা ব্রহ্মের সহিত অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারাই এরূপ সাহসিক উপমা এমন সহজ এমন প্রবল সরলতার সহিত উচ্চারণ করিতে পারেন। মৃগ যেমন ব্যাধের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য, ব্রহ্ম তেমনি আত্মার অনন্য লক্ষ্যস্থল। **অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ।** প্রমাদশূন্য হইয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এবং শর যেমন লক্ষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইবে।

উপমাটি যেমন সরল, উপমার বিষয়গত কথাটি তেমনি গভীর। এখন সে অরণ্য নাই, সে ধনুঃশর নাই; এখন নিরাপদ নগর-নগরী অপরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুরক্ষিত। কিন্তু সেই আরণ্যক ঋষিকবি যে সত্যকে সন্ধান করিয়াছেন, সেই সত্য অদ্যকার সভ্য যুগের পক্ষেও দুর্লভ। আধুনিক সভ্যতা কামান বন্দুকে ধনুঃশরকে জিতিয়াছে, কিন্তু সেই শত শত শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মজ্ঞানকে পশ্চাতে ফেলিতে পারে নাই। সমস্ত প্রত্যক্ষ পদার্থের মধ্যে **তদেতৎ সত্যং,** সেই-যে একমাত্র সত্য, **যদ্ অণুভ্যোণুচ,** যাহা অণু হইতেও অণু অথচ **যস্মিন্ লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ,** যাহাতে লোকসকল এবং লোকবাসী-সকল নিহিত রহিয়াছে— সেই অপ্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্যকে শিশুতুল্য সরল ঋষিগণ অতি নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন। **তদমৃতং,** তাহাকেই তাঁহারা অমৃত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং শিষ্যকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, **তদ্ভাবগতেন চেতসা,** তদ্ভাবগত চিত্তের দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্য কর— **তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি,** তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, হে সৌম্য তাঁহাকে বিদ্ধ কর! **শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ,** লক্ষ্যপ্রবিষ্ট শরের ন্যায় তাঁহারই মধ্যে তন্ময় হইয়া যাও!

সমস্ত আপেক্ষিক সত্যের অতীত সেই পরম সত্যকে কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারা বিচার করা সেও সামান্য কথা নহে, শুদ্ধ যদি সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতেন তবে তাহাতেও সেই স্বল্পাশী বিরলবসন সরল-প্রকৃতি বনবাসী প্রাচীন আর্য্য ঋষিদের বুদ্ধি-শক্তির মহৎ উৎকর্ষ প্রকাশ পাইত। কিন্তু উপনিষদের এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির সাধনা নহে— সকল সত্যকে অতিক্রম করিয়া ঋষি যাঁহাকে একমাত্র **তদেতৎ সত্যং,** বলিয়াছেন, প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞদের পক্ষে তিনি কেবল জ্ঞানলভ্য একটি দার্শনিক তত্ত্বমাত্র ছিলেন না। একাগ্রচিত্ত ব্যাধের ধনু হইতে শর যেরূপ প্রবলবেগে প্রত্যক্ষ সন্ধানে লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হয়, ব্রহ্মর্ষিদের আত্মা সেই পরমসত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইবার জন্য সেইরূপ আবেগের সহিত ধাবিত হইত। কেবলমাত্র সত্যনিরূপণ নহে, সেই সত্যের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কারণ সেই সত্য কেবলমাত্র সত্য নহে, তাহা অমৃত। তাহা কেবল আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র অধিকার করিয়া নাই, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই আমাদের আত্মার অমরত্ব। এই জন্য সেই অমৃতপুরুষ ছাড়িয়া আমাদের আত্মার অন্য গতি নাই, ঋষিরা ইহা প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

স যঃ অন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ—

অর্থাৎ যিনি পরমাত্মা ব্যতীত অন্যকে আপনার প্রিয় করিয়া বলেন— **প্রিয়ং রোৎস্যতীতি**— তাহার প্রিয় বিনাশ পাইবে! আমাদের জ্ঞানের পক্ষে যে সত্য সকল সত্যের শ্রেষ্ঠ, আমাদের আত্মার পক্ষে তাহাই সকল প্রিয়ের প্রিয়তম—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই যে সর্বাপেক্ষা অন্তরতর পরমাত্মা— ইনি আমাদের পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি শুষ্ক জ্ঞানমাত্র নহেন, তিনি আমাদের আত্মার প্রিয়তম।

আধুনিক হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা বলেন ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া কোন ধর্ম সংস্থাপন হইতে পারে না, তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের অবলম্বনীয়, তাঁহারা উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ করিবেন। ইহা কেবল বাক্যমাত্র নহে— প্রীতিরসকে অতি নিবিড় নিগূঢ় রূপে আস্বাদন করিতে না পারিলে এমন উদার উন্মুক্ত ভাবে এমন সরল সবল কণ্ঠে প্রিয়ের প্রিয়ত্ব ঘোষণা করা যায় না।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা—

ব্রহ্মর্ষি এ কথা কোন ব্যক্তিবিশেষে বদ্ধ করিয়া বলিতেছেন না— তিনি বলিতেছেন না যে, তিনি আমার নিকট আমার পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। তিনি বলিতেছেন, আত্মার নিকটে তিনি সর্বাপেক্ষা অন্তরতর। জীবাত্মা মাত্রেরই নিকট তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়। জীবাত্মা যখনই তাঁহাকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে, তখনি বুঝিতে পারে তাঁহা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছুই নাই।

অতএব পরমাত্মাকে যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা জানিব **তদেতৎ সত্যং,** তাহা নহে, তাঁহাকে হৃদয়ের দ্বারা অনুভব করিব **তদমৃতং**। তাঁহাকে সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া জানিব। সকলের অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রীতি করিব। জ্ঞান ও প্রেম-সমেত আত্মাকে ব্রহ্মে সমর্পণ করার সাধনাই ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনা— **তদ্ভাবগতেন চেতসা,** এই সাধনা করিতে হইবে। ইহা নীরস তত্ত্বজ্ঞান নহে, ইহা ভক্তি-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম।

উপনিষদের ঋষি যে জীবাত্মা মাত্রেরই নিকট পরমাত্মাকে সর্বাপেক্ষা প্রীতিজনক বলিতেছেন, তাহার অর্থ কি? যদি তাহাই হবে তবে আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাম্যমাণ হই কেন? একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার অর্থ বুঝাইতে ইচ্ছা করি। কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি যখন বলেন কাব্যরস অবতারণায় বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ কবি, তখন এ কথা বুঝিলে চলিবে না যে, কেবল তাঁহারই নিকট বাল্মীকির কাব্যরস সর্বাপেক্ষা উপাদেয়। তিনি বলেন সকল পাঠকের পক্ষেই এই কাব্যরস সর্বশ্রেষ্ঠ— ইহাই মনুষ্য-প্রকৃতি। কিন্তু কোন অশিক্ষিত গ্রাম্য জানপদ বাল্মীকির কাব্য অপেক্ষা যদি স্থানীয় কোন পাঁচালিগানে অধিক সুখ অনুভব করে, তবে তাহার কারণ তাহার অজ্ঞতামাত্র। সেই লোক অশিক্ষাবশতঃ বাল্মীকির কাব্য যে কি তাহা জানে না এবং সেই কাব্যের রস যেখানে, অনভিজ্ঞতাবশতঃ সেখানে

সে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। কিন্তু তাহার অশিক্ষা-বাধা দূর করিয়া দিবামাত্র যখনি সে বাল্মীকির কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবে, তখনি সে স্বভাবতই মানব-প্রকৃতির নিজগুণেই গ্রাম্য পাঁচালি অপেক্ষা বাল্মীকির কাব্যকে রমণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। তেমনি যে ঋষি ব্রহ্মের অমৃতরস আস্বাদন করিয়াছেন, যিনি তাঁহাকে পৃথিবীর অন্য সকল হইতেই প্রিয় বলিয়া জানিয়াছেন, তিনি ইহা সহজেই বুঝিয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বভাবতই আত্মার পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রীতিদায়ক— ব্রহ্মের প্রকৃত পরিচয় পাইবামাত্র আত্মা স্বভাবতই তাঁহাকে পুত্র বিত্ত ও অন্য সকল হইতেই প্রিয়তম বলিয়া বরণ করে।

ব্রহ্মের সহিত এই পরিচয় যে কেবল আত্মার আনন্দসাধনের জন্য তাহা নহে, সংসারযাত্রার পক্ষেও তাহা না হইলে নয়। ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি বৃহৎ বলিয়া না জানিয়া সংসারকেই বৃহৎ বলিয়া জানে, সংসারযাত্রা সে সহজে নির্ব্বাহ করিতে পারে না— সংসার তাহাকে রাক্ষসের ন্যায় গ্রাস করিয়া নিজের জঠরানলে দগ্ধ করিতে থাকে! এ জন্যে ঈশোপনিষদে লিখিত হইয়াছে—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

– ঈশ্বরের দ্বারা এই জগতের সমস্ত যাহা কিছু আচ্ছন্ন জানিবে এবং

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্॥

– তাঁহার দ্বারা যাহা দত্ত, যাহা কিছু তিনি দিতেছেন, তাহাই ভোগ করিবে— পরের ধনে লোভ করিবে না।

সংসারযাত্রার এই মন্ত্র। ঈশ্বরকে সর্বত্র দর্শন করিবে, ঈশ্বরের দত্ত আনন্দ-উপকরণ উপভোগ করিবে, লোভের দ্বারা পরকে পীড়িত করিবে না।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত সংসারকে আচ্ছন্ন দেখে সংসার তাহার নিকট একমাত্র মুখ্যবস্তু নহে— সে যাহা ভোগ করে, তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়া ভোগ করে— সেই ভোগে সে ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করে না— নিজের ভোগমত্ততায় পরকে পীড়া দেয় না। সংসারকে যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত না দেখি, সংসারকেই যদি একমাত্র মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া জানি, তবে সংসারসুখের জন্য আমাদের লোভের অন্ত থাকে না, তবে প্রত্যেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য হানাহানি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়, দুঃখ হলাহল মথিত হইয়া উঠে। এইজন্য সংসারীকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে, কারণ সংসারকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত জানিলে এবং সংসারের সমস্ত ভোগ ব্রহ্মের দান বলিয়া জানিলে, তবেই কল্যাণের সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্ভব হয়। পরের শ্লোকে বলিতেছেন—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কর্ম করিয়া শত বৎসর ইহলোকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে— হে নর, তোমার পক্ষে ইহার আর অন্যথা নাই, কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

কর্ম করিতেই হইবে এবং জীবনের প্রতি উদাসীন হইবে না, কিন্তু ঈশ্বর সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া আছেন— ইহাই স্মরণ করিয়া কর্ম্মের দ্বারা জীবনের শতবর্ষ যাপন করিবে। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া ভোগ করিতে হইবে এবং ঈশ্বর সর্বত্র আছেন অনুভব করিয়া কর্ম করিতে হইবে।

সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে নিরত থাকা তাহাও ঈশোপনিষদের উপদেশ নহে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যা অর্থাৎ সংসার-কর্ম্মেরই উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমসের মধ্যে প্রবেশ করে, তদপেক্ষা ভূয় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে যাহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যায় নিরত।

ঈশ্বর আমাদিগকে সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্মে স্থাপিত করিয়াছেন। সেই কর্ম যদি আমরা ঈশ্বরের কর্ম বলিয়া না জানি, তবে পরমার্থের উপর স্বার্থ বলবান হইয়া উঠে এবং আমরা অন্ধকারে পতিত হই। অতএব কর্মকেই চরম লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মের উপাসনা করিবে না, তাহাকে ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া পালন করিবে।

কিন্তু বরঞ্চ মুগ্ধভাবে সংসারের কর্ম-নির্ব্বাহও ভাল, তথাপি সংসারকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত কর্ম পরিহার-পূর্ব্বক কেবলমাত্র আত্মার আনন্দসাধনের জন্য ব্রহ্ম-সংযোগের চেষ্টা শ্রেয়স্কর নহে। তাহা আধ্যাত্মিক বিলাসিতা, তাহা ঈশ্বরের সেবা নহে।

কর্মসাধনাই একমাত্র সাধনা। সংসারের উপযোগিতা, সংসারের তাৎপর্য্যই তাই। মঙ্গলকর্ম-সাধনেই আমাদের স্বার্থপ্রবৃত্তি-সকল ক্ষয় হইয়া আমাদের লোভ মোহ, আমাদের হৃদ্‌গত বন্ধন-সকলের মোচন হইয়া থাকে— আমাদের যে রিপুসকল মৃত্যুর মধ্যে আমাদিগকে জড়িত করিয়া রাখে, সেই মৃত্যুপাশ অবিশ্রাম মঙ্গলকর্ম্মের সংঘর্ষেই ছিন্ন হইয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের সাধনাই স্বার্থপাশ হইতে মুক্তির সাধনা,— **এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে**— ইহার আর অন্যথা নাই— কর্ম্মে লিপ্ত হইবে না এমন পথ নাই।

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র করিয়া জানেন, তিনি অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মলাভের দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন।

ইহাই সংসারধর্ম্মের মূলমন্ত্র— "কর্ম এবং ব্রহ্ম" জীবনে উভয়ের সামঞ্জস্যসাধন। কর্ম্মের দ্বারা আমরা ব্রহ্মের অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকিব, ব্রহ্ম সেই মন্দির পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। নহিলে কিসের জন্য আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাম পাইয়াছি— কেন এই পেশী, এই স্নায়ু, এই বাহুবল, এই বুদ্ধিবৃত্তি— কেন এই স্নেহপ্রেম দয়া— কেন এই বিচিত্র সংসার? ইহার কি কোন অর্থ নাই? ইহা কি সমস্তই অনর্থের হেতু? ব্রহ্ম হইতে সংসারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জানিলেই তাহা অনর্থের নিদান হইয়া উঠে এবং সংসার হইতে ব্রহ্মকে দূরে রাখিয়া তাঁহাকে একাকী উপভোগ করিতে চেষ্টা করিলেই আমরা আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় নিমগ্ন হইয়া জীবনের বিচিত্র সার্থকতা হইতে ভ্রষ্ট হই।

পিতা আমাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াছেন, সেখানকার নিয়ম এবং কর্ত্তব্য সর্বদা সুখজনক নহে। সেই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বালক পিতৃগৃহে পালাইয়া আনন্দলাভ করিতে চায়। সে বোঝে না বিদ্যালয়ে তাহার কি প্রয়োজন— সেখান হইতে পলায়নকেই সে মুক্তি বলিয়া জ্ঞান করে, কারণ পলায়নে আনন্দ আছে। মনোযোগের সহিত বিদ্যা সম্পন্ন করিয়া বিদ্যালয় হইতে মুক্তিলাভের যে আনন্দ তাহা সে জানে না। কিন্তু সুছাত্র প্রথমে পিতার স্নেহ সর্বদা স্মরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার দুঃখকে গণ্য করে না, পরে তাহার সহিত বিদ্যাশিক্ষায় অগ্রসর হইবার আনন্দও যুক্ত হয়, অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়া মুক্তিলাভের আনন্দে সে ধন্য হইয়া থাকে।

যিনি আমাদিগকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, সংসার-বিদ্যালয়কে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে যেন সন্দেহ না করি— এখানকার দুঃখকাঠিন্য বিনীতভাবে গ্রহণ করিয়া, এখানকার কর্ত্তব্য একান্তচিত্তে পালন করিয়া, পরিপূরণ জীবনের মধ্যে ব্রহ্মামৃত লাভের স্বার্থকতা যেন অনুভব করি। ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জানিয়া সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া যে মুক্তি, তাহাই মুক্তি। সংসারকে অপমানপূর্ব্বক পলায়নে যে মুক্তি তাহা মুক্তির বিড়ম্বনা, তাহা একজাতীয় স্বার্থপরতা।

সকল স্বার্থপরতায় চূড়ান্ত এই আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা। কারণ সংসারের মধ্যে এমন একটি অপূর্ব্ব কৌশল আছে যে, স্বার্থসাধন করিতে গেলেও পদে পদে স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। সংসারে পরের দিকে একেবারে না তাকাইলে নিজের কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। নৌকা যেমন গুণ দিয়া টানে তেমনি সংসারের স্বার্থবন্ধন আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সর্বদাই প্রতিকূল স্রোত বাহিয়া নিজের দিক হইতে পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। আমাদের স্বার্থ ক্রমশই আমাদের সন্তানের স্বার্থ, পরিবারের স্বার্থ, প্রতিবেশীর স্বার্থ, স্বদেশের স্বার্থ এবং সর্বজনের স্বার্থে অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যাপ্ত হইতে থাকে।

কিন্তু যাঁহারা সংসারের দুঃখ, শোক, দারিদ্র্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার প্রলোভনে আধ্যাত্মিক বিলাসিতায় নিমগ্ন হন, তাঁহাদের স্বার্থপরতা সর্বপ্রকার আঘাত হইতে সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় হইয়া উঠে।

বৃক্ষে যে ফল থাকে, সে ফল বৃক্ষ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া পরিপক্ক হইয়া উঠে। যতই সে পরিপক্ক হইতে থাকে ততই বৃক্ষের সহিত তাহার বৃন্তবন্ধন শিথিল হইয়া আসে, অবশেষে তাহার অভ্যন্তরস্থ বীজ সুপরিণত হইয়া উঠিলে বৃক্ষ হইতে সে সহজেই বিচ্ছিন্ন হইয়া বীজকে সার্থক করিয়া তোলে। আমরাও সংসারবৃক্ষ হইতে সেইরূপ

বিচিত্র রস আকর্ষণ করি— মনে হইতে পারে তাহাতে সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই দৃঢ় হইবে— কিন্তু তাহা নহে, আত্মার যথার্থ পরিণতি হইলে বন্ধন আপনি শিথিল হইয়া আসে। ফলের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, আত্মা সচেতন; রস নির্ব্বাচন ও আকর্ষণ বহুল পরিমাণে আমাদের স্বায়ত্ত। আত্মার পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচারপূর্ব্বক সংসার হইতে রস গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে পারিলেই সংসারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং সেই সঙ্গে আত্মার সফলতা সম্পন্ন হইলে সংসারের কল্যাণবন্ধন সহজেই শিথিল হইয়া আসে। অতএব ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন জানিয়া সংসারকে **"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"**, তাঁহার দত্ত সুখসমৃদ্ধির দ্বারা ভোগ করিবে— সংসারকে শেষ পরিণাম বলিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে না। অপর পক্ষে সংসারের বৃন্তবন্ধন বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার মঙ্গলরস হইতে আত্মাকে বঞ্চিত করিবে না। ঈশ্বর এই সংসারবৃক্ষের সহস্র তন্তুর মধ্য দিয়া আমাদের আত্মার কল্যাণরস প্রেরণ করেন; এই জীবধারয়িতা বিপুল বনস্পতি হইতে দম্ভভরে পৃথক্ হইয়া নিজের রস নিজে যোগাইবার ক্ষমতা আমাদের হস্তে নাই।

কোন সত্যকে অস্বীকার করিয়া আমাদের নিস্তার নাই। মত্ততার বিহ্বলতায় মাতাল বিশ্বসংসারকে নগণ্য করিয়া যে অন্ধ আনন্দ উপভোগ করে সে আনন্দের শ্রেয়স্করতা নাই। বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সৎ এবং অসৎ, ব্রহ্ম এবং সংসার— উভয়কেই স্বীকার করিতে হইবে। দুঃখের হাত এড়াইবার জন্য কর্ত্তব্যবন্ধন ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে সংসারকে একেবারেই "না" করিয়া দিয়া একাকী আনন্দ উপভোগে প্রবৃত্ত হওয়া একজাতীয় প্রমত্ততা। সত্যের এক দিককে উপেক্ষা করিলে অপর দিকও অসত্য হইয়া উঠে। ঈশ্বরের আদেশপালনকে যে অস্বীকার করে, সে মুখে যাহাই বলুক, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে না। বরঞ্চ ঈশ্বরকে মুখে অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি মনুষ্যের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করে, সে কঠিন কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়া থাকে।

জ্ঞানে, ভোগে এবং কর্ম্মে ব্রহ্মকে স্বীকার করিলেই তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা হয়। সেইরূপ সর্বাঙ্গীণভাবে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার একমাত্র স্থান এই সংসার, আমাদের এই কর্মক্ষেত্র; ইহাই আমাদের ধর্ম্মক্ষেত্র, ইহাই ব্রহ্মের মন্দির। এখানে জগৎমন্ডলের জ্ঞানে ঈশ্বরের জ্ঞান, জগৎসৌন্দর্য্যের ভোগ ঈশ্বরের ভোগ এবং জগৎসংসারের কর্ম্মে ঈশ্বরের কর্ম জড়িত রহিয়াছে; সংসারের সেই জ্ঞান, সৌন্দর্য্য ও ক্রিয়াকে ব্রহ্মের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া জানিলেই ব্রহ্মকে অন্তরতর করিয়া জানা যায় এবং সংসারযাত্রাও কল্যাণকর হইয়া উঠে। তখন ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য হয়, কাহারও ধনে লোভ থাকে না, অনর্থক বলিয়া জীবনের প্রতি উপেক্ষা জন্মে না, শতবর্ষ আয়ু যাপন করিলেও পরমায়ুর সার্থকতা উপলব্ধি হয়, এবং সেই অবস্থায়—

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যে দেখেন এবং সর্ব ভূতের মধ্যে পরমাত্মাকে দেখেন তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।

গম্যস্থানের পক্ষে পথ যেমন একই কালে পরিহার্য্য এবং অবলম্বনীয়, ব্রহ্মলাভের পক্ষে সংসার সেইরূপ। পথকে যেমন আমরা প্রতিপদে পরিত্যাগ করি এবং আশ্রয় করি, সংসারও সেইরূপ আমাদের প্রতিপদে বর্জ্জনীয় এবং গ্রহণীয়। পথ নাই বলিয়া চক্ষু মুদিয়া পথপ্রান্তে পড়িয়া স্বপ্ন দেখিলে গৃহ লাভ হয় না, এবং পথকেই শেষ লক্ষ্য বলিয়া বসিয়া থাকিলে গৃহ গমন ঘটে না। গম্যস্থানকে যে ভালবাসে পথকেও সে ভালবাসে— পথ গম্যস্থানেরই অঙ্গ, অংশ এবং আরম্ভ বলিয়া গণ্য, ব্রহ্মকে যে চায়, ব্রহ্মের সংসারকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না; সংসারকে সে প্রীতি করে এবং সংসারের কর্মকে ব্রহ্মের কর্ম বলিয়াই জানে।

আর্য্যধর্ম্মের বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা বলিবেন সংসারের সহিত যদি ব্রহ্মের যোগ সাধন করিতে হয়, তবে ব্রহ্মকে সংসারের উপযোগী করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। তাই যদি হইল তবে সত্যের প্রয়োজন কি? সংসার ত আছেই— কাল্পনিক সৃষ্টির দ্বারা সেই সংসারেরই আয়তন বিস্তার করিয়া লাভ কি? আমরা অসৎ সংসারে আছি বলিয়াই আমাদের সত্যের প্রয়োজন— আমরা সংসারী বলিয়াই সেই সংসারাতীত নির্ব্বিকার অক্ষর পুরুষের আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে হইবে— সে আদর্শ বিকৃত হইতে দিলেই তাহা সছিদ্র তরণীর ন্যায় আমাদিগকে বিনাশ হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেয় না। যদি সত্যকে, জ্যোতিকে, অমৃতকে আমরা অসৎ অন্ধকার এবং মৃত্যুর পরিমাপে খর্ব্ব করিয়া আনি, তবে কাহাকে ডাকিয়া কহিব—

অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়॥

সংসারী জীবের পক্ষে একটি মাত্র প্রার্থনা আছে— সে প্রার্থনা, অসৎ হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও— সে প্রার্থনা করিবার স্থান সংসারে নাই, আমাদের কল্পনার মধ্যে নাই— সত্যকে মিথ্যা করিয়া লইয়া তাহার নিকট সত্যের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ চলে না, জ্যোতিকে স্বেচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার নিকট আলোকের জন্য প্রার্থনা বিড়ম্বনা মাত্র, অমৃতকে সহস্তে মৃত্যুধর্ম্মের দ্বারা বিকৃত করিয়া তাহার নিকট অমৃতের প্রত্যাশা মূঢ়তা। **ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ**— যে ব্রহ্ম সমস্ত জগতের সমস্ত পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সংসারী সেই ব্রহ্মকেই সর্বত্র অনুভব করিবেন— উপনিষদের এই অনুশাসন।

দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি বলিবেন, উপদেশ সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহা পালন কঠিন। অরূপ ব্রহ্মের মধ্যে দুঃখ-শোকের নির্বাপণ সহজ নহে। কিন্তু যদি সহজ না হয় তবে দুঃখ-নির্বাপণের, মুক্তিলাভের অন্য যে-কোন উপায় আরও কঠিন— কঠিন কেন, অসাধ্য। স্বতঃপ্রবাহিত অগাধ স্রোতস্বিনীর মধ্যে অবগাহনস্নান যদি কঠিন হয়, তবে স্বহস্তে ক্ষুদ্রতম কূপ খনন করিয়া তাহার মধ্যে অবতরণ আরও কত কঠিন— তাই বা কেন, নিজের ক্ষুদ্র-কলস পরিমিত জল নদী হইতে বহন করিয়া স্নান করা সেও দুরূহতর। যখন ব্রহ্মকে অরূপ অনন্ত অনির্বচনীয় বলিয়া জানি তখনি তাঁহার মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন অতি সহজ নয়, তখনি তাঁহার দ্বারা পরিপূর্ণরূপে পরিবৃত হইয়া আমাদের ভয় দুঃখ শোক সর্বাংশে দূর হইয়া যায়। এই জন্যই উপনিষদে আছে—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া নিবৃত্ত হইয়া আছে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি আর কাহা হইতেও ভয় পান না।

অতএব ব্রহ্মের সেই বাক্যমনের অগোচর অনন্ত পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করিলে তবেই আমাদের ভয় দুঃখ নিঃশেষে নিরস্ত হয়। তাঁহাকে বিশ্বজগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় **বাঙ্মনোগোচর** ক্ষুদ্র করিয়া, খণ্ড করিয়া, দেখিলে আমরা সেই পরম অভয়, সেই ভূমা আনন্দ লাভ করিতে পারি না। আমরা ত সংসারের সংকীর্ণতা দ্বারা প্রতিহত, জটিলতা-দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত, খণ্ডতা-দ্বারা শতধা-বিক্ষিপ্ত হইয়া আছি— আমরা জানি সংসারের **"স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি"**— সংসারের সমুদয় স্রোত ভয়াবহ— সকলেরই মধ্যে ভয়-দুঃখ-ক্লেশ, জরা-মৃত্যু-বিচ্ছেদের কারণ রহিয়াছে— অতএব আমরা যখন শান্তি চাই, অভয় চাই, আনন্দ চাই, অমৃত চাই, তখন সহজেই স্বভাবতই কাহাকে চাই? যাঁহাকে পাইলে **শান্তিমত্যন্তমেতি,** অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। তিনি কে? উপনিষৎ বলেন, **স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্যঃ**— তিনি সংসার কাল এবং আকৃতি অর্থাৎ সাকার পদার্থ হইতে পরঃ, শ্রেষ্ঠ এবং অন্য অর্থাৎ ভিন্ন। যদি তিনি সংসার কাল ও সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন না হইতেন তবে ত সংসারই আমাদের যথেষ্ট ছিল— তবে ত তাঁহাকে অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন ছিল না।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতাকে জানিয়া অত্যন্ত শিব এবং অত্যন্ত শান্তি পাওয়া যায়। অতএব যাঁহারা বলেন আমরা সেই ভূমা-স্বরূপকে আয়ত্ত করিতে পারি না, সেই জন্য তাঁহাতে আমাদের স্থিতি আমাদের শান্তি নাই, তাঁহারা উপনিষৎ-কথিত পরম সত্য হইতে স্খলিত হইতেছেন—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

বাক্য মন যাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না তাঁহাতেই আমাদের পরম আনন্দ, আমাদের অনন্ত অভয়। ঋষিরা কহিতেছেন—

যৎ বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাক্ অভ্যুদ্যতে।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

যিনি বাক্য-দ্বারা উদিত নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা উদিত, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান— এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করা যায় না, যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান— এই যাহা কিছু উপাসনা করা যায় তাহা ব্রহ্ম নহে। যাঁহাকে বলা যায় না, যাঁহাকে ভাবা যায় না, তাঁহাকেই জানিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব নহে— যদি তাঁহাকে সম্পূর্ণ জানা সম্ভব হইত তবে তাঁহাকে জানিয়া আমাদের আনন্দামৃত লাভ হইত না। তাঁহাকে আমরা অন্তরাত্মার মধ্যে এতটুকু জানি যাহাতে বুঝিতে পারি তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না এবং তাহাতেই আমাদের আনন্দের শেষ থাকে না।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।

যো নস্তদ্‌বেদ তদ্‌বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানি এমন আমি মনে করি না, না জানি যে তাহাও নহে, আমাদের মধ্যে যিনি তাঁহাকে জানেন তিনি ইহা জানেন যে— তাঁহাকে জানি এমনও নহে, না জানি এমনও নহে।

শিশু কি তাহার মাতার সম্যক্ পরিচয় জানে? কিন্তু সে অনুভবের দ্বারা এবং এক অপূর্ব্ব সংস্কার-দ্বারা এটুকু ধ্রুব জানিয়াছে যে, তাহার ক্ষুধার শান্তি, তাহার ভয়ের নিবৃত্তি, তাহার সমস্ত আরাম মাতার নিকট। সে তাহার মাতাকে জানে এবং জানেও না। মাতার অপর্য্যাপ্ত স্নেহ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার সাধ্য তাহার নাই, কিন্তু যতটুকুতে তাহার তৃপ্তি ও শান্তি ততটুকু সে আস্বাদন করে এবং আস্বাদন করিয়া ফুরাইতে পারে না। আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মকে এই জগতের মধ্যে এবং আপন অন্তরাত্মার মধ্যে কিছু জানিতে পারি এবং সেইটুকু জানাতেই ইহা জানি যে, তাঁহাকে জানিয়া শেষ করা যায় না; জানি যে, তাঁহা হইতে **বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ;** এবং মাতৃ-অঙ্ক-কামী শিশুর মত ইহাও জানিতে পারি যে, **আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন**—তাঁহার আনন্দ যে পাইয়াছে তাহার আর কাহারও নিকট হইতে কদাচ কোন ভয় নাই।

যাঁহারা উপনিষৎ অবিশ্বাস করিয়া, ঋষিবাক্য অমান্য করিয়া, ব্রহ্মলাভের সহজ উপায়স্বরূপ সাকার পদার্থকে অবলম্বন করেন, তাঁহারা এ কথা বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঐকান্তিক সহজ কঠিন বলিয়া কিছু নাই। সন্তরণ অপেক্ষা পদব্রজে চলা সহজ বলিয়া মানিয়া লইলেও এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে জলের উপর দিয়া পদব্রজে চলা সহজ নহে— সেখানে তদপেক্ষা সন্তরণ সহজ। অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে মনন-দ্বারা জানা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ পদার্থকে চক্ষু দ্বারা দেখা সহজ এ কথা স্বীকার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া অতীন্দ্রিয় পদার্থকে চক্ষু-দ্বারা দেখা সহজ নহে— এমন-কি, তাহা অসাধ্য। তেমনি সাকার মূর্ত্তির রূপ-ধারণা সহজ— সন্দেহ নাই, কিন্তু সাকার মূর্ত্তির সাহায্যে ব্রহ্মের ধারণা একেবারেই অসাধ্য; কারণ, **স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্যঃ**— তিনি সংসার হইতে, কাল হইতে, সাকার পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ভিন্ন— সেই জন্যই তাঁহাতে সংসারাতীত দেশকালাতীত **শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি,** অত্যন্ত মঙ্গল এবং অত্যন্ত শান্তিলাভ হয়— অথচ তাঁহাকে পুনশ্চ আকৃতির মধ্যে বদ্ধ করিয়া ধারণা করিবার চেষ্টা এত কঠিন যে, তাহা অসাধ্য, অসম্ভব, তাহা স্বতোবিরোধী।

কিন্তু সহজ কঠিনের কথা উঠে কেন? আমরা সহজ চাই, না সত্য চাই? সত্য যদি সহজ হয় ত ভাল, যদি না হয় তবু সত্য বৈ গতি নাই। পৃথিবী কূর্ম্মের পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত আছে এ কথা ধারণা করা যদি কাহারও পক্ষে সহজ হয়, তথাপি বিজ্ঞান পিপাসু সত্যের মুখ চাহিয়া তাহাকে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মরুপ্রান্তরের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ ক্ষুধার্ত্ত যখন অন্ন চায়, তখন তাহাকে বালুকাপিণ্ড আনিয়া দেওয়া সহজ; কিন্তু সে বলে— আমি ত সহজ চাই না, আমি অন্নপিণ্ড চাই— সে অন্ন এখানে যদি না পাওয়া যায়, তবে দুরূহ হইলেও তাহাকে অন্যত্র হইতে আহরণ করিতে হইবে, নহিলে আমি বাঁচিব না। তেমনি সংসারমধ্যে আমরা যখন অধ্যাত্মপিপাসা মিটাইতে চাই তখন কল্পনা-মরীচিকায় সে কিছুতেই মিটে না— যত দুর্লভ হউক সেই পিপাসার জল— আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় পরমাত্মাকেই চাই— তিনি নিরাকার নির্বিকার বাক্যমনের অগোচর হইলেও তবু তাঁহাকেই চাই, নহিলে আমাদের মুক্তি নাই। ধর্ম্মপথ ত সহজ নহে, ব্রহ্মলাভ ত সহজ নহে, সে কথা সকলেই বলে— **দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি**— সেই জন্যই মোহনিদ্রাগ্রস্ত সংসারীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ঋষি উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন; **"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"**। না উঠিলে, না জাগিলে এই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম দুরত্যয় পথে চক্ষু মুদিয়া চলা যায় না— আত্মার অভাব আলস্যভরে অনায়াসে মোচন হয় না এবং ব্রহ্ম ক্রীড়াচ্ছলে কল্পনাবাহিত মনোরথের গম্য নহেন। সংসারে যদি বিদ্যালাভ বিত্তলাভ যশোলাভ সহজ না হয়, তবে ধর্মলাভ সত্যলাভ ব্রহ্মলাভ সহজ, এমন আশ্বাস কে দিবে এবং সে আশ্বাসে কে ভুলিবে! কোন্ মূঢ় বিশ্বাস করিবে যে, মন্ত্রোচ্চারণে লোহা সোনা হইয়া যাইবে। খনি-অন্বেষণের প্রয়োজন নাই? **উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত! দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!**

তবে ব্রহ্মলাভের চেষ্টা কি একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে? তবে কি এই কথা বলিয়া মনকে বুঝাইতে হইবে যে, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্য-আশ্রয় গ্রহণ করেন, যাঁহাদের নিকট ভাল-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত অন্তর-বাহিরের ভেদ একেবারে ঘুচিয়া গেছে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদেরই জন্য। তাই যদি হইবে, তবে ব্রহ্মবাদী ঋষি ব্রহ্মচারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্যকে কেন অনুশাসন করিতেছেন, **প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ,** সন্তানসূত্র ছেদন করিবে না, অর্থাৎ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবে। কেন শাস্ত্রকার বিশেষ করিয়া উপদেশ দিতেছেন, **ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ,** গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ, তত্ত্বজ্ঞানী হইবেন, অর্থাৎ যে নিষ্ঠার কথা কহিলেন তাহা যেন অজ্ঞাননিষ্ঠা না হয়, গৃহী যথার্থ জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মে নিরত হইবেন এবং **যদ্‌যদ্ কর্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ,** যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। অতএব শাস্ত্রের অনুশাসন এই যে, গৃহী ব্যক্তিকে কেবল ভক্তিতে নহে, জ্ঞানে— কেবল জ্ঞানে নহে, কর্ম্মে, হৃদয়ে মনে এবং চেষ্টায়, সর্বতোভাবে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে। অতএব সংসারের মধ্যে থাকিয়া আমরা সর্বদা সর্বত্র ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিব, অন্তরাত্মার মধ্যে তাঁহার অধিষ্ঠান অনুভব করিব এবং আমাদের সমুদয় কর্ম তাঁহার সম্মুখে কৃত এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে সমর্পিত হইবে।

কিন্তু সর্বদা সর্বত্র তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিতে হইলে, চতুর্দিকের জড়বস্তুরাশিকে অপসারিত করিয়া ব্রহ্মের মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ আশ্রিত আবৃত নিমগ্ন অনুভব করিতে হইলে, তাঁহাকে সাকাররূপে কল্পনাই করা যায় না। উপনিষদে আছে, **যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং**—এই সমস্ত জগৎ সেই প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়া সেই প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে। অনন্ত প্রাণের মধ্যে সমস্ত বিশ্বচরাচর অহর্নিশি স্পন্দমান রহিয়াছে এই ভাব কি আমরা কোনপ্রকার হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তি-দ্বারা কল্পনা করিতে পারি? অথচ **যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং**

প্রাণ এজতি, এই যাহা কিছু জগৎ-সমস্ত প্রাণের মধ্যে কম্পিত হইতেছে এ কথা মনে উদয় হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তৃণ-গুল্ম-লতা, পুষ্প-পল্লব, পশু-পক্ষী, মনুষ্য, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, জগতের প্রত্যেক কম্পমান অণু-পরমাণু এক মহাপ্রাণের ঐক্যসমুদ্রে হিল্লোলিত দেখিতে পাই— এক মহাপ্রাণের অনন্তকম্পিত বীণাতন্ত্রী হইতে এই বিপুল বিচিত্র বিশ্বসঙ্গীত ঝঙ্কৃত শুনিতে পাই। অনন্তপ্রাণের সেই অনির্দ্দেশ্যতা অনির্ব্বচনীয়তাই আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেই জগদ্‌ব্যাপী জগদতীত প্রাণকে কোন নির্দ্দিষ্ট সংকীর্ণ আকারের মধ্যে কল্পনা করিতে গেলে তখন আর তাঁহাকে আমাদের নিঃশ্বাসের মধ্যে পাই না, আমাদের চক্ষের নিমেষের মধ্যে পাই না, আমাদের রক্তের উত্তপ্ত প্রবাহ, আমাদের সর্বাঙ্গের বিচিত্র স্পর্শ, আমাদের দেহের প্রত্যেক স্পন্দিত কোষ, প্রত্যেক নিঃশ্বসিত রোমকূপের মধ্যে পাই না— আকৃতির কঠিন ব্যবধানে, মূর্ত্তির অলঙ্ঘনীয় অন্তরালে, তিনি আমাদের নিকট হইতে আমাদের অন্তর হইতে দূরে বাহিরে গিয়া পড়েন। আমার অশরীরী অভাবনীয় প্রাণ আমার আদ্যোপান্তে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, আমার পদাঙ্গুলোর কোষাণুর সহিত আমার মস্তিষ্কের কোষাণুকে যোগযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে— আবার আমার এই রহস্যময় প্রাণের মধ্যে সেই পরমপ্রাণ আমার শরীর কোষের প্রত্যেক স্পন্দনের সহিত সুদূরতম নক্ষত্রবর্ত্তী বাষ্পাণুর প্রত্যেক আন্দোলনকে এক অনির্ব্বচনীয় ঐক্যে এক অপূর্ব্ব অপরিমেয় ছন্দোবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন— ইহা অনুভব করিয়া এবং অনুভবের শেষ করিতে না পারিয়া কি আমাদের চিত্ত পুলকিত প্রসারিত হইয়া উঠে না? কোনও মূর্ত্তির কল্পনা কি ইহা অপেক্ষা সহজে আমাদিগকে সর্বপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন, খণ্ডতার কারাপ্রাচীর হইতে মুক্তিদানে সহায়তা করিতে পারে— অনন্তের সহিত আমাদের এমন অন্তরতম ব্যাপকতম যোগ সংনিবদ্ধ করিতে পারে? সাকার মূর্ত্তি আমাদিগকে সহায়তা করে না, ব্রহ্মকে দূরে লইয়া দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেয়।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্ অদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে।

অভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোঽভয়ংগতো ভবতি॥

যখন সাধক সেই অদৃশ্যে, অশরীরে, নির্বিশেষে, নিরাধারে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তখন তিনি অভয় প্রাপ্ত হন।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।

কিন্তু যখন তিনি ইহাতে লেশমাত্র অন্তর অর্থাৎ দূরত্ব স্থাপন করেন তখন তিনি ভয় প্রাপ্ত হন। সেই অদৃশ্যকে দৃশ্য, অশরীরকে শরীরী, নির্বিশেষকে সবিশেষ এবং নিরাধারকে আধারবিশিষ্ট করিলে ব্রহ্মের সহিত দূরত্ব স্থাপন করা হয়, তখন আমাদের আত্মার অভয়প্রতিষ্ঠা চূর্ণ হইয়া যায়।

উপনিষৎ বলিতেছেন—

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।

তিনি আছেন— এই কথা যে বলে সে ছাড়া অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে কি করিয়া উপলব্ধি করিবে? তিনি আছেন— ইহার অধিক আর কি বলিবার আছে? তিনি আছেন— এই কথা যখনি আমরা সর্বান্তঃকরণে সম্পূর্ণভাবে বলিতে পারি তখনই আমাদের মনোনেত্রের সম্মুখে অনন্ত শূন্য ওতপ্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠে— তখনি যথার্থতঃ বুঝিতে পারি যে, আমি আছি; বুঝিতে পারি যে, আমার বিনাশ নাই; আত্ম ও পর, জড় ও চেতন, দেশ ও কাল, নিষ্কল পরমাত্মার দ্বারা এক মুহূর্ত্তেই অখণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তখন আমাদের এই পুরাতন পৃথিবীর দিকে চাহিলে ইহাকে আর ধূলিপিণ্ড বলিয়া বোধ হয় না, নিশীথ নভোমণ্ডলের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে চাহিলে তাহারা শুদ্ধমাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গরূপে প্রতীয়মান হয় না। তখন আমার অন্তরাত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ধূলিকণা, এই ভূমিতল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত একটি শব্দ ধ্বনিহীন গাম্ভীর্য্যে উদগীত হইয়া উঠে— **ওঁ**; একটি বাক্য শুনিতে পাই— **অস্তি**, তিনি আছেন— এবং সেই একটি কথার মধ্যেই সমস্ত জগৎচরাচরের, সমস্ত কার্য্যকারণের সমস্ত অর্থ নিহিত পাওয়া যায়। সেই মহান্ **অস্তি** শব্দকে কোনও আকারের দ্বারা, মূর্তি দ্বারা সহজ করা যায় কি? এমন সহজ কথা কি আর কিছু আছে যে "তিনি আছেন'? "আমি আছি' এ কথা যেমন জগতের সকল কথার অপেক্ষা সহজ, "তিনি আছেন' এ কথা না বলিলে "আমি আছি' এ কথা যে আদ্যোপান্ত নিরর্থক মিথ্যা হইয়া যায়। আমার অস্তিত্ব বলিতেছে, আমার আত্মা বলিতেছে— তিনি আছেন। সাকার মূর্তি কি তদপেক্ষা সহজ সাক্ষ্য আর কিছু দিতে পারে?

ব্রহ্মের সেই বিশুদ্ধ ভাব কিরূপে মনন করিতে হইবে?

নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ॥

কি ঊর্ধ্বদেশ, কি তির্য্যক্, কি মধ্যদেশ, কেহ ইঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না— তাঁহার প্রতিমা নাই, তাঁহার নাম মহদ্‌যশ!

প্রাচীন ভারতে সংসারবাসী জীবাত্মার লক্ষ্যস্থান এই পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিবার মন্ত্র ছিল **ওঁ**

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।

তাঁহার প্রতিমা ছিল না, কোন মূর্ত্তিকল্পনা ছিল না— পূর্ব্বতন পিতামহগণ তাঁহাকে মনন করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটিমাত্র শব্দ আশ্রয় করিয়াছিলেন। সে শব্দ যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি পরিপূর্ণ, কোন বিশেষ অর্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। সেই শব্দ চিত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, কোন বিশেষ আকার দ্বারা বাধা দেয় না; সেই একটি মাত্র **ওঁ** শব্দের মহাসঙ্গীত জগৎসংসারের ব্রহ্মরন্ধ্র

হইতে যেন ধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে।

ব্রহ্মের বিশুদ্ধ আদর্শ রক্ষা করিবার জন্য পিতামহগণ কিরূপ যত্নবান ছিলেন ইহা হইতেই তাহার প্রমাণ হইবে।

চিন্তার যত প্রকার চিহ্ন আছে তন্মধ্যে ভাষাই সর্বাপেক্ষা চিন্তার অনুগামী। কিন্তু ভাষারও সীমা আছে, বিশেষ অর্থের দ্বারা আকারবদ্ধ— সুতরাং ভাষা আশ্রয় করিলে চিন্তাকে ভাষাগত অর্থের চারি প্রান্তের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়।

ওঁ একটি ধ্বনিমাত্র— তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। সেই ওঁ শব্দে ব্রহ্মের ধারণাকে কোন অংশেই সীমাবদ্ধ করে না— সাধনা দ্বারা আমরা ব্রহ্মকে যত দূর জানিয়াছি যেমন করিয়াই পাইয়াছি, এই ওঁ শব্দে তাহা সমস্তই ব্যক্ত করে, এবং ব্যক্ত করিয়াও সেইখানেই রেখা টানিয়া দেয় না। সঙ্গীতের স্বর যেমন গানের কথার মধ্যে একটি অনির্ব্বচনীয়তার সঞ্চার করে তেমনি ওঁ শব্দের পরিপূর্ণ ধ্বনি আমাদের ব্রহ্মধ্যানের মধ্যে একটি অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয়তা অবতারণা করিয়া থাকে। বাহ্য প্রতিমা দ্বারা আমাদের মানস ভাবকে খর্ব্ব ও আবদ্ধ করে— কিন্তু এই **ওঁ** ধ্বনির দ্বারা আমাদের মনের ভাবাকে উন্মুক্ত ও পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়।

সেই জন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন— **ওমিতি ব্রহ্ম**। ওম্ বলিতে ব্রহ্ম বুঝায়। **ওমিতীদং সর্বং**, এই যাহা কিছু সমস্তই ওঁ। ওঁ শব্দ সমস্তকেই সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয়। অর্থবন্ধনহীন কেবল একটি সুগম্ভীর ধ্বনিরূপে ওঁ শব্দ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার ওঁ শব্দের একটি অর্থও আছে— সে অর্থ এত উদার যে তাহা মনকে আশ্রয় দান করে, অথচ কোন সীমায় বদ্ধ করে না।

আধুনিক সমস্ত ভারতবর্ষীয় আর্য্য ভাষায় যেখানে আমরা হাঁ বলিয়া থাকি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সেইখানে ওঁ শব্দের প্রয়োগ। হাঁ শব্দ ওঁ শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়। উপনিষদ্ও বলিতেছেন, **ওমিত্যেতদ্ অনুকৃতির্হস্ম**— ওঁ শব্দ অনুকৃতিবাচক, অর্থাৎ 'ইহা কর' বলিলে, **ওঁ** অর্থাৎ হাঁ বলিয়া সেই আদেশের অনুকরণ করা হইয়া থাকে। ওঁ — স্বীকারোক্তি।

এই স্বীকারোক্তি ওঁ, ব্রহ্ম-নির্দ্দেশক শব্দরূপে গণ্য হইয়াছে। ব্রহ্মধ্যানের কেবল এইটুকুমাত্র অবলম্বন— ওঁ, তিনি হাঁ। ইংরেজ মনীষী কার্লাইলও তাঁহাকে Everlasting Yea অর্থাৎ শাশ্বত ওঁ বলিয়াছেন। এমন প্রবল পরিপূর্ণ কথা আর কিছুই নাই, তিনি হাঁ, ব্রহ্ম ওঁ।

আমরা কে কাহাকে স্বীকার করি সেই বুঝিয়া আত্মার মহত্ত্ব। কেহ জগতের মধ্যে একমাত্র ধনকেই স্বীকার করে, কেহ মানকে, কেহ খ্যাতিকে। আদিম আর্য্যগণ ইন্দ্র চন্দ্র বরুণকে ওঁ বলিয়া স্বীকার করিতেন, সেই দেবতার অস্তিত্ব তাঁহাদের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিভাত হইত। উপনিষদের ঋষিগণ বলিলেন জগতে ও জগতের বাহিরে ব্রহ্মই একমাত্র ওঁ, তিনি চিরন্তন হাঁ, তিনিই Everlasting Yea। আমাদের আত্মার মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ,— বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তিনি ওঁ, তিনিই হাঁ; এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেশকালকে অতিক্রম করিয়া তিনি ওঁ, তিনি হাঁ। এই মহান্ নিত্য এবং সর্বব্যাপী যে হাঁ, ওঁ ধ্বনি ইঁহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মের কোন প্রতিমা ছিল না, কোন চিহ্ন ছিল না— কেবল এই একটিমাত্র ক্ষুদ্র অথচ সুবৃহৎ ধ্বনি ছিল ওঁ। এই ধ্বনির সহায়ে ঋষিগণ উপাসনানিশিত আত্মাকে একাগ্রগামী শরের ন্যায় ব্রহ্মের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিতেন। এই ধ্বনির সহায়ে ব্রহ্মবাদী সংসারীগণ বিশ্বজগতের যাহা কিছু সমস্তকেই ব্রহ্মের দ্বারা সমাবৃত করিয়া দেখিতেন।

ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওঁ বলিয়া সাম সকল গীত হইতে থাকে। ওঁ আনন্দধ্বনি।

ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। ওঁ আদেশবাচক। ওঁ বলিয়া ঋত্বিক্ আজ্ঞা প্রদান করেন। সমস্ত সংসারের উপর, আমাদের সমস্ত কর্ম্মের উপর মহৎ আদেশরূপে নিত্যকাল ওঁ ধ্বনিত হইতেছে। জগতের অভ্যন্তরে এবং জগতকে অতিক্রম করিয়া যিনি সকল সত্যের পরম সত্য— আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তিনি সকল আনন্দের পরমানন্দ, এবং আমাদের কর্মসংসারে তিনি সকল আদেশের পরমাদেশ। তিনি ওঁ।

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোইয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

তিনি যেখানে সেখানে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রতারকার প্রকাশ নাই, বিদ্যুতের প্রকাশ নাই, এই অগ্নির প্রকাশ কোথায়? সেই জ্যোতির্ম্ময়ের প্রকাশেই সমস্ত প্রকাশিত, তাঁহার দীপ্তিতেই সমস্ত দীপ্যমান। তিনিই ওঁ।

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ

প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

এই যে অন্তরতর পরমাত্মা— তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, সকল হইতেই প্রিয়। তিনিই ওঁ।

সত্যান্ন প্রমদিতব্যং। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং।

কুশলান্ন প্রমদিতব্যং। ভূত্যৈ র্ন প্রমদিতব্যং।

সত্য হইতে স্খলিত হইবে না, ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইবে না, কল্যাণ হইতে স্খলিত হইবে না, মহত্ত্ব হইতে স্খলিত হইবে না। ইহা যাঁহার অনুশাসন, তিনিই ওঁ।

অনেকে বলেন, দুর্বল মানব-প্রকৃতির সর্বপ্রকার চরিতার্থতা আমরা ঈশ্বরে পাইতে চাই; আমাদের প্রেম কেবল জ্ঞানে ও ধ্যানে পরিতৃপ্ত হয় না, সেবা করিতে চায়, আমাদের প্রকৃতির সেই স্বাভাবিক আকাঙ্খা চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা ঈশ্বরকে মূর্ত্তিতে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অশন বসন ভূষণ উপহারে পূজা করিয়া থাকি।

এ কথা সত্য যে, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা মানব-প্রকৃতির চরম চরিতার্থতা অন্বেষণ করি; কেবল ভক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা সেই চরিতার্থতা লাভ হইতে পারে না, সেই জন্যই শাস্ত্রে গৃহস্থকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে বলিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে বলিয়াছেন, গৃহী যে যে কর্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মকে সমর্পণ করিবেন। সংসারের সমস্ত কর্তব্যপালনই ব্রহ্মের সেবা। যদি প্রতিমাকে অন্নবস্ত্র পুষ্পচন্দন দান করিয়া আমরা দেবসেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করি তবে তাহাতে আমাদের কর্মের মহত্ত্ব লাভ না হইয়া ঠিক তাহার বিপরীত হয়। ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদিগকে সকল জ্ঞানের চরিতার্থতার দিকে লইয়া যায়, ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি আমাদিগকে পুত্রপ্রীতি ও অন্য সকল প্রীতির পরম

পরিতৃপ্তিতে লইয়া যায়, এবং ব্রহ্মের কর্মও সেইরূপ আমাদের শুভ চেষ্টাকে চরম মহত্ত্ব ও ঔদার্যের অভিমুখে আকর্ষণ করে। আমাদের জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের এইরূপ মহত্ত্ব-সাধনের জন্যই মনু গৃহীকে ব্রহ্মপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছেন। মানব-প্রকৃতির যথার্থ চরিতার্থতা তাহাতেই— ভোগে নহে, খেলায় নহে। প্রতিমাকে স্নান করাইয়া, বস্ত্র পরাইয়া, অন্ন নিবেদন করিয়া, আমাদের কর্মচেষ্টার কোন মহৎ পরিতৃপ্তি হইতেই পারে না; তাহাতে আমাদের কর্তব্যের আদর্শকে তুচ্ছ ও সংকীর্ণ করিয়া আনে। ভক্তি ও প্রীতির উদারতা অনুসারে কর্মেরও উদারতা ঘটিয়া থাকে। পরিবারের প্রতি যাহার যে পরিমাণে প্রীতি সেই পরিবারের জন্য সেই পরিমাণে প্রাণপাত করিয়া থাকে। দেশের প্রতি যাহার ভক্তি, দেশের সর্বপ্রকার দৈন্য ও কলঙ্ক-মোচনের জন্য বিবিধ দুরূহ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সে আপন ভক্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা সাধন করিয়া থাকে। ব্রহ্মের প্রতি যাহার গভীর নিষ্ঠা, সে পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি, সকলের প্রতি মঙ্গল-চেষ্টা নিয়োগ করিয়া ভক্তিবৃত্তিকে সফলতা দান করে। দীনকে বস্ত্রদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান ইহাতেই আমাদের সেবা-চেষ্টার সার্থকতা। প্রতিমার সম্মুখে অন্ন বস্ত্র উপহরণ করা ক্রীড়ামাত্র, তাহা কর্ম নহে; তাহা ভক্তিবৃত্তির মোহাচ্ছন্ন বিলাসমাত্র, তাহা ভক্তিবৃত্তির সচেষ্ট সাধনা নহে। এই খেলায় যদি আমাদের মুগ্ধহৃদয়ের কোন সুখসাধন হয়, তবে সে ত আমাদের আত্মসুখ, আমাদের আত্মসেবা, তাহাতে দেবতার কর্মসাধন হয় না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ইচ্ছাকৃত কর্ম নিজের সুখের জন্য না করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা এবং তাহাতেই সুখানুভব করা দেবসেবার উচ্চ আদর্শ। সেই আদর্শকে রক্ষা করিতে হইলে জড় আদর্শকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সত্যজ্ঞান দুরূহ, প্রকৃত নিষ্ঠা দুরূহ, মহৎ কর্মানুষ্ঠান দুরূহ সন্দেহ নাই, তাই বলিয়া তাহাকে লঘু করিয়া, ব্যর্থ করিয়া, মিথ্যা করিয়া, মনুষ্যত্বের অবমাননা করিয়া আমরা কি ফল লাভ করিয়াছি? কর্তব্যকে খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে, জ্ঞান ভক্তি কর্মকে, মানব-প্রকৃতির সর্বোচ্চ শিখরকে কয়েক খণ্ড মৃৎপিণ্ডে পরিণত করিয়া খেলা করিতে করিতে আমরা কোন্‌খানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি! আমরা নিজেকে অক্ষম অশক্ত নিকৃষ্ট অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়া নিশ্চেষ্ট জড়ত্বকে আনন্দে বরণ করিয়া লইয়াছি। আমরা অকুণ্ঠিত স্বরে নিজেকে আধ্যাত্মিক শিশু বলিয়া প্রচার করি, এবং সর্বপ্রকার মনুষ্যোচিত কঠিন সাধনা ও মহৎপ্রয়াস হইতে নিষ্কৃতি, জ্ঞানীর নিকট হইতে মার্জনা ও ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রশ্রয় প্রত্যাশা-পূর্বক নিদ্রা, ক্রীড়া ও উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার দ্বারা সুখলালিত হইয়া নিস্তেজ নির্বীর্য্য হইতে থাকি; যুক্তিকে পঙ্গু করিয়া, ভক্তিকে অন্ধ করিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে আচ্ছন্ন করিয়া, ব্রহ্মকে চিন্তা ও চেষ্টা হইতে দূরীভূত করিয়া, হৃদয় মন আত্মার মধ্যে আলস্য এবং পরাধীনতার সহস্রবিধ বীজ বপন করিয়া, আমরা জাতীয় দুর্গতির শেষ সোপানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছি। অদ্য আমরা ভয়ে ভীত, দীনতায় অবনত, শোক তাপে জর্জ্জর। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিধ্বস্ত, হীনবল। আমাদের বাহিরে লাঞ্ছনা, অন্তরে গ্লানি, চতুর্দিকেই জীর্ণতা। আমাদের বাহিরে জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যেরূপ বিচ্ছেদ, আমাদের নিজের প্রকৃতির মধ্যে আমাদের **'চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াং'**, মনে বাক্যে ও কর্মে বিরোধ, শিক্ষায় ও আচরণে বিরোধ, ধর্মে এবং কর্মে ঐক্য নাই— সেই কাপুরুষতায় এবং বিচ্ছিন্নতায় আমাদের সমাজ আমাদের গৃহ আমাদের অন্তঃকরণ অসত্যে আদ্যোপান্ত জর্জ্জরীভূত হইয়াছে। আমাদিগকে এক হইতে হইবে, সতেজ হইতে হইবে, ভয়হীন হইতে হইবে। অজ্ঞান এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইব। কে আমাদের বল, কে আমাদের আশ্রয়? সে

কোন্ সর্বব্যাপী সত্য, কোন্ অদ্বিতীয় এক, যিনি আমাদিগকে জাতিতে জাতিতে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মনে, বাক্যে ও কর্মে একতা দান করিবেন? সংসারের মধ্যে আমরা লোকভয়-মৃত্যুভয়-জয়ী পরম নির্ভর পাই নাই; সংসার গুরুভার লৌহশৃঙ্খলে আমাদের অবমানিত মস্তককে আরও অবনত করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের জড় দুর্বল দেহকে আরও গতিশক্তিবিহীন করিয়াছে। এই সকল ভয় এবং ভার এবং ক্ষুদ্রতা হইতে ব্রহ্মই আমাদের একমাত্র মুক্তি। দিনে রাত্রে সুপ্তিতে জাগরণে অন্তরে বাহিরে আমরা তাঁহার মধ্যে আবৃত নিমগ্ন থাকিয়া তাঁহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছি— কোন প্রবল রাজা, কোন পরম শত্রু, কোন প্রচণ্ড উপদ্রবে তাঁহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। অদ্য আমরা সমস্ত ভীত ধিক্কৃত ভারতবর্ষ কি এক হইয়া করজোড়ে ঊর্ধ্বমুখে বলিতে পারি না যে,—

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।

রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং॥

তুমি অজাত, জন্মরহিত, কোন ভীরু তোমার শরণাপন্ন হইতেছে, হে রুদ্র তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর। তিনি রহিয়াছেন— ভয় নাই, ভয় নাই! সম্মুখে যদি অজ্ঞান থাকে তবে দূর কর, অন্যায় থাকে তবে আক্রমণ কর, অন্ধ সংস্কার বাধাস্বরূপ থাকে তবে তাহা সবলে ভগ্ন করিয়া ফেল; কেবল তাঁহার মুখের দিকে চাও এবং তাঁহার কর্ম কর! তাহাতে যদি কেহ অপবাদ দেয় তবে সে অপবাদ ললাটে তিলক করিয়া লও; যদি দুঃখ ঘটে সে দুঃখ মুকুটরূপে শিরোধার্য করিয়া লও; যদি মৃত্যু আসন্ন হয় তবে তাহাকে অমৃত বলিয়া গ্রহণ কর! অক্ষয় আশায়, অক্ষুণ্ন বলে, অনন্ত প্রাণের আশ্বাসে, ব্রহ্ম-সেবার পরম গৌরবে সংসারের সঙ্কট-পথে সরল হৃদয়ে ঋজু দেহে চলিয়া যাও! সুখের সময় বল, **অস্তি**— তিনি আছেন! দুঃখের সময় বল, **অস্তি**— তিনি আছেন! বিপদের সময় বল, **অস্তি**— তিনি আছেন! পরমাত্মার মধ্যে আত্মার অবাধ স্বাধীনতা, অপরিসীম আনন্দ, অপরাজিত অভয় লাভ করিয়া সমস্ত অপমান দৈন্য গ্লানি নিঃশেষে প্রক্ষালিত করিয়া ফেল! বল, যে মহান্ অজ আত্মা হইতে বাক্য মন নিবৃত্ত হইয়া আসে আমি সেইখান হইতে আনন্দ লাভ করিয়াছি, আমি কদাচ ভয় করি না, আমি কাহা হইতেও ভয় পাই না— আমার **ন জরা, ন মৃত্যু শোকঃ**। বল—

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো

বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি। সর্বং ব্রহ্মৌপনিষদং।

মাঽহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ

অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু।

তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ

তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

উপনিষৎ-কথিত সর্বান্তর্য্যামী ব্রহ্ম আমার বাক্য প্রাণ চক্ষু শ্রোত্র বল ইন্দ্রিয়, আমার সমুদয় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন! ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি, তিনি অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্তৃক অপরিত্যক্ত থাকুন। সেই পরমাত্মায় নিরত আমাতে উপনিষদের যে সকল ধর্ম তাহাই হৌক্, আমাতে তাহাই হৌক্!

মুক্তি

স্বামী বিদ্যানন্দ সরস্বতী

মনুষ্যের পুরুষার্থের উদ্দেশ্য হচ্ছে— সকল দুঃখ থেকে পূর্ণরূপে মুক্তি তথা মোক্ষলাভ করা। মোক্ষের অর্থ শুধু দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া নয়, বরং দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে সুখ লাভ করা। সমস্ত দুঃখের কারণ আমাদের এই শরীর। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সকল দুঃখ শরীরের কারণেই হয়। যদি কেবল দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়াকেই মোক্ষ বলে মনে করা হয়, তাহলে "কারণাভাবাৎকার্য্যাভাব" শরীর থেকে মুক্ত হওয়াকেই 'মোক্ষ' বলতে হবে। গভীর নিদ্রায় কোনো দুঃখের অনুভূতি থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তিতে কেবল দুঃখের তিরোভাব হয়, অত্যন্ত-অভাব হয় না। সেই অবস্থায় না দুঃখের বোধ হয়, আর না সুখের। কিন্তু মোক্ষ কেবল দুঃখের অভাব নয়, বরং পরম সুখের ভাবের নাম। কিন্তু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ব্যতীত এই আনন্দের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। অতএব, মোক্ষের প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে, সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়ে আনন্দের প্রাপ্তি। এইপ্রকার যেখানে এই শরীর দুঃখের কারণ, সেখানে তা সুখ তথা আনন্দ প্রাপ্তির সাধনও বটে। মানব-দেহ লাভ করার পরই জীব ওইসব সাধনের অনুষ্ঠান করতে সমর্থ হয়, যার ফলস্বরূপ আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। সাংসারিক সাধন দ্বারাও দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু তা দীর্ঘকালের জন্য হয় না। আর না তার মধ্যে নিরন্তরতা থাকে, কারণ— "একস্য দুঃখস্য ন য়াবদন্তং গচ্ছাম্যহং পারমিবার্ণবস্য। তাবদ্ দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে ছিদ্রেষনর্থা বহুলী ভবন্তি॥ (পঞ্চতন্ত্র)" অর্থাৎ যতক্ষণের জন্য কোনো দুঃখ দূর হয়ে যায়, তার অন্তরালে আরেকটি দুঃখ এসে উপস্থিত হয়। অতএব, মোক্ষের অবস্থা সেটিকেই মানতে হবে, যার মধ্যে ত্রিতাপ (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক— ত্রিবিধ দুঃখ) সর্বাধিক সময়ের জন্য নিবৃত্তি হয় এবং এতে নিরন্তরতার অবস্থা বজায় থাকে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, জীব তো মুক্তি লাভের জন্য প্রযত্নশীল; কিন্তু জীব স্বভাবতই মুক্ত না কি বদ্ধ? এর উত্তর হচ্ছে— না, জীব স্বভাবত মুক্ত অথবা বদ্ধ নয়। কারণ বস্তুর স্বভাব হচ্ছে তার নিজের স্বরূপ। স্বভাবের অনুপস্থিতিতে বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অগ্নির স্বভাব তাপ; যদি তাপ না থাকে, তাহলে ব্যবহারে অগ্নির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। অতএব বস্তুর স্বভাব দূর করা যায় না। যদি জীবকে স্বভাবত বদ্ধ বলে মনে করা হয়, তাহলে জীব কখনোই মুক্ত হবে না এবং যদি জীবকে স্বভাবত মুক্ত মনে করা হয়, তবে জীব কখনো বদ্ধ হবে না। মুক্তির আগে বন্ধন থাকা আবশ্যক, কারণ যদি কেউ বদ্ধ না হয়, তাহলে সে কীভাবে মুক্ত হবে? একইভাবে বন্ধনে আসার আগে মুক্তি প্রয়োজন। কারণ যে মুক্ত নয়, তাকে বন্ধনে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। এভাবে মুক্তি ও বন্ধন শব্দ দুটির ব্যবহার থেকে এটি স্পষ্ট যে, জীব স্বভাবত না তো বদ্ধ, আর না মুক্ত। অতএব জীবাত্মা স্বতঃশুদ্ধ;

কিন্তু তিনি অল্পজ্ঞ এবং কর্মে স্বতন্ত্র। এই কারণে তিনি কখনো প্রকৃতির এবং কখনো ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হন। যখন জীব ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির দিকে অগ্রসর (প্রবৃত্ত) হন, তখন তিনি বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং যখন তিনি ব্রহ্মের প্রতি উন্মুখ হন, তখন তিনি মোক্ষলাভ করেন। যেরূপ একটি বস্ত্র ধুলি কাদার সংস্পর্শে অপরিষ্কার হয়ে যায় এবং জল দিয়ে ধৌত করলে পরিষ্কার হয়ে যায়, তদ্রূপ মোহ-মিথ্যাত্ব ইত্যাদির প্রতি আসক্তির কারণে জীব বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং জ্ঞান, বিবেক ও শুদ্ধাচরণ দ্বারা মুক্ত হয়।

এখন জানা প্রয়োজন যে, জীবের দুঃখের কারণ কী? এর উত্তর হচ্ছে, 'মিথ্যা-জ্ঞান' বা 'অবিবেক'। কেননা জীবের দুঃখের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির কারণ দোষ এবং দোষের কারণ মিথ্যা-জ্ঞান। যখন কারণের নাশ হয়, তখন কার্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাশ হয়ে যায়। অতএব, বিপরীত ক্রম থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মিথ্যা-জ্ঞানের নাশ দ্বারা দোষের নাশ, দোষের নাশ দ্বারা প্রবৃত্তির নাশ, প্রবৃত্তির নাশ দ্বারা জন্মের নাশ এবং জন্মের নাশ দ্বারা দুঃখের নাশ হয়ে যায়। মিথ্যা-জ্ঞানের নাশ দ্বারা যখন রাগ, দ্বেষ আদি দোষের নাশ হয়ে যায়, তখন দোষের নাশ দ্বারা প্রবৃত্তির নাশ হয়ে যায়। প্রবৃত্তি নাশের ফলে মানসিক ও বাচিক শুভাশুভ কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। কর্ম না থাকার কারণে প্রারব্ধের নির্মাণ বন্ধ হয়ে যায়। প্রারব্ধ কর্মের অভাবে তার ফল ভোগ করার জন্য আর জন্মের প্রয়োজন থাকে না। শরীরের সাথে সম্পর্কের কারণেই আত্মা দুঃখ অনুভব করে। অতএব জন্ম না হলে শরীরের অনুপস্থিতিতে দুঃখের সম্পূর্ণ অভাব নিশ্চিত। মিথ্যা-জ্ঞান থেকে দুঃখ পর্যন্ত পরিস্থিতির নিরন্তর চলতে থাকার নাম সংসার, আর সংসার হলো বন্ধনের আরেক নাম। যখন সকল মিথ্যা-জ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়, তখন দোষসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাপ্ত হয়ে যায়। এই ক্রমান্বয়ে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে (দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুঃখ থেকে মুক্তিকে) বলা হয় মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স। অজ্ঞান, অবিদ্যা, বিপর্যয়, অবিবেক, প্রকৃতিযোগ ইত্যাদি মিথ্যা-জ্ঞানের পর্যায়বাচী। এই 'অবিদ্যা' নাশের মধ্যেই নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) নিহিত আছে।

এখন মুক্তি অবস্থায় আত্মা কীরূপ স্থিতিতে অবস্থান করে, তা জানা প্রয়োজন। যোগদর্শনে (১।৩) বলা হয়েছে— "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্॥" অর্থাৎ সেই অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার স্বরূপে থাকে। এই সূত্রে 'দ্রষ্টু' শব্দটি পরমাত্মারও বাচক। এটি সত্য যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই দ্রষ্টা। কিন্তু "মুখ্যামুখ্যয়োর্মুখ্যে কার্যসম্প্রত্যয়" এই নীতি অনুযায়ী মুখ্য দ্রষ্টা হলেন পরমেশ্বর। জীবাত্মা আনন্দের আকাঙ্ক্ষী। একমাত্র পরমেশ্বরই আনন্দের উৎস— "রসো বৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। (তৈত্তি০ উপ০ ২।৭।২)"। ঋগ্বেদে (৭।১১।১) বর্ণিত হয়েছে— "ন ঋতে ত্বদমৃতা মাদয়ন্তে" = হে পরমেশ্বর! তোমাকে ছাড়া মুক্ত আত্মাগণ আনন্দিত হয় না। এমন অবস্থায় মুক্তাত্মা সেই আনন্দদাতা প্রভুর পরম-আনন্দ অনুভব করেন। এটিই পরমাত্মার স্বরূপে অবস্থিত হওয়ার অর্থ। পরমাত্মাতে অবস্থান করার পরও জীবের স্বাধীন অস্তিত্ব থাকে। কারণ মুক্তিতে জীবাত্মা ব্রহ্মে লয় (বিলীন) হয় না। অবিদ্যা নাশ হওয়ার পর এবং কর্মের বন্ধন অর্থাৎ সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার পর জীবাত্মা সর্বব্যাপী পরমাত্মাতে এমনভাবে অবস্থান করেন, ঠিক যেভাবে সমস্ত পদার্থ আকাশে স্থিত থাকে। শুদ্ধ সামর্থ্যযুক্ত জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মোক্ষাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। সেই অবস্থায় স্থূল-শরীর, মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের (সূক্ষ্ম-শরীরের) অভাব হয়ে যায়, কিন্তু বিশুদ্ধ সংকল্পময় শরীর, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের শুদ্ধ শক্তির সহিত জীবের সত্তা বিদ্যমান থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে— "পরংজ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন

রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে (ছান্দো০ উপ০ ৮।৩।৪)" অর্থাৎ জীবাত্মা সেই পরম-জ্যোতিকে প্রাপ্ত হয়ে নিজের শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত হন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।২) মোক্ষাবস্থায় জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্তার প্রতিপাদন করে বলা হয়েছে— "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। য়ো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥" অর্থাৎ যিনি হৃদয়াকাশরূপ গুহাতে স্থিত অবিনশ্বর, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহচর হন এবং সমস্ত কামনাসমূহ বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সাথে ভোগ করেন।

মুণ্ডকোপনিষদের (৩।২।৮) শ্রুতিবাক্যে বলা হয়েছে— "য়থা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥" অর্থাৎ যেরূপ নদীসকল প্রবাহিত হয়ে স্বীয় নাম ও রূপকে ত্যাগ করে সমুদ্রে মিলিত হয়, তদ্রূপ বিদ্বান পুরুষ নাম ও রূপ থেকে মুক্ত হয়ে পরাৎপর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। এখন অনেকে ভাবতে পারেন, সমুদ্রের সাথে নদীর মিলন থেকে বোঝা যায় যে, পরমাত্মার প্রাপ্তিতে জীবাত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। প্রতিটি বস্তুর দুটি রূপ আছে, একটি হলো সেই বস্তুর বাহ্যিক রূপ— তার আকৃতি, ধরন ও রঙ, রূপ প্রভৃতি এবং অন্যটি হলো তার অভ্যন্তরীণ রূপ, যাকে বলা হয় বস্তুতত্ত্ব। নাম রূপ শরীরের, আত্মার নয়। শরীরের নাম রূপই হলো আত্মার বাহ্যিক রূপ। সেগুলো ত্যাগের কথা এখানে বলা হয়েছে। উপনিষদের এই শ্রুতির তাৎপর্য হচ্ছে, সমুদ্রের সাথে মিলিত হওয়ার পর যেমন একটি নদী তার গঙ্গা-যমুনা আদি নাম ও রূপ ত্যাগ করে, তদ্রূপ মুক্ত আত্মা তাঁর বাহ্যিক রূপ (দেহ) এবং যজ্ঞদত্ত, দেবদত্ত ইত্যাদি নাম ত্যাগ করে সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। যদিও নদীসমূহের নাম ও রূপ অবশিষ্ট নেই, তবুও সমুদ্রে মিলিত হওয়ার পরও তাদের নিজস্ব বস্তুতত্ত্ব— 'জল' নাশ হয় না। এটি সমুদ্রে মিশে তার জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। জলের অস্তিত্ব নাশপ্রাপ্ত হলে এমন হতো না। এইপ্রকার মুক্তিতে কারো নাম-রূপ হারানোর পরেও তাঁর বস্তুতত্ত্ব (আত্মার স্বীয় অস্তিত্ব) বিনষ্ট হয় না। মোক্ষাবস্থায় তিনি (মুক্তাত্মা) পরমেশ্বরের সহচররূপে উপস্থিত থাকেন। এর পরের শ্রুতিতে বলা হয়েছে, "য়ো হ বৈ তৎপরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" = যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মভাবই প্রাপ্ত হন। একইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৪।৪।৬) "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" = ব্রহ্মে স্থিত হয়েই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। এভাবে উপনিষদ্-সমূহে প্রায়শই ঔপচারিক বর্ণনা আছে। 'এব' শব্দের ব্যবহার এটি স্পষ্ট করে দেয় যে, এখানে উৎপ্রেক্ষালংকার আছে।

তাহলে ব্রহ্ম কী? "রসো বৈ সঃ"— সেই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। যখন নদী সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়, তখন এটি সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হয়। একইভাবে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সংস্পর্শে এসেই জীবাত্মা আনন্দে বিভোর হয়ে যায়। অভেদ ছাড়াই ব্রহ্মের সান্নিধ্যে থাকার অর্থ হলো— ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ এবং জীব সেই ব্রহ্মানন্দের ভাগীদার অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায় জীব ব্রহ্মের সামীপ্য দ্বারা আনন্দ উপভোগ করে, কিন্তু নিজের অস্তিত্ব ত্যাগ করে না।

প্রেম ও ভক্তির চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে, যখন প্রেমী তার আত্মার প্রেমে ডুবে থাকে। এতটাই মগ্ন হয়ে থাকে যে, সে তার ইন্দ্রিয়জ্ঞান তথা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলে এবং বলতে শুরু করে যে 'যেদিকেই দেখি সেদিকেই শুধু তুমি আর তুমি'। যোগের অষ্টম ধাপ সমাধিতে পৌঁছানোর পর, যোগী নিজের ধ্যেয় ব্রহ্মকেই সর্বত্র দর্শন করেন। ওই

অবস্থায় তিনি না কেবল নিজেকে বরং তিনি সবকিছু তাঁর রূপেই দেখতে থাকেন। এই অবস্থার বর্ণনা করে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—

য়দগ্নে স্যামহং ত্বং ত্বং বা ঘা স্যা অহম্।

স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ॥ (ঋ০ ৮।৪৪।২৩)

অর্থাৎ হে জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা! যদি আমি তুমি হয়ে যাই এবং তুমি আমি হয়ে যাও, তাহলে এ সংসারে তোমার সব আশীর্বাদ সত্য (সার্থক) হয়ে যায়।

ঔপচারিকভাবে বলা হয়েছে— "য়ত্র নান্যৎ পশ্যতি" (ছান্দো০ উ০ ৭।২৪।১), "ন তু তদ্ দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং য়ৎ পশ্যেৎ" (বৃহদা০ ৪।৩।২৩) এবং "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃহদা০ ৪।৪।৬) ইত্যাদি বাক্যের এটিই তাৎপর্য। এগুলো আনন্দানুভূতির আধিক্যেই অতিশয় শব্দে বলা বচনমাত্র। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।৬।১) বলা হয়েছে, "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" অর্থাৎ আনন্দই ব্রহ্ম, এরূপ জানবে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।

শুধু তাই নয়, জীব মুক্তিতে ব্রহ্মের সাথে লয় হয়ে যায় না, আর না জীব ব্রহ্মের সমরূপ হতে পারে। যেহেতু ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ (আনন্দো ব্রহ্ম; তৈত্তি০ উ০) এবং তাঁকে লাভ করে জীবও আনন্দিত হন (রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি; তৈত্তি০ উ০ ২।৭।২), তাহলে তো উভয়ই এক হয়ে গেল! এটি বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ শুধুমাত্র একটি গুণ বা কিছু গুণের মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণে দুটি পদার্থ এক হয়ে যায় না। চিনি ও লবণ সাদা রঙের হওয়ায় এ দুটি পদার্থ কখনো এক হতে পারে না। শুধু পদার্থ হওয়ায় জল ও দুধকে এক হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। তত্ত্বজ্ঞান তখনই অর্জিত হয়, যখন সাধর্ম্যের পাশাপাশি বৈধর্ম্যের জ্ঞানও থাকে। ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হলো— "ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥" (যোগ০ ১।২৪) অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় থেকে অসম্পৃক্ত (সম্বন্ধহীন) চেতন-তত্ত্ব বিশেষকে ঈশ্বর বলা হয়। অন্যদিকে "ইচ্ছাদ্বেষপ্রয়ত্নসুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গম্ ॥"(ন্যায়০ ১।১।১০) = ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রচেষ্টা, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান আত্মার লিঙ্গ (চিহ্ন)। ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই নিজস্ব গুণ রয়েছে। গুণসমূহ গুণীর সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ গুণ তার গুণী থেকে আলাদা হতে পারে না। ঈশ্বরের গুণাবলি ঈশ্বরের মধ্যে এবং জীবের গুণাবলি জীবের মধ্যে সর্বদাই থাকবে। অতএব স্বীয় স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হয়ে ঈশ্বর জীবের মতো এবং জীব ঈশ্বরের মতো হতে পারে না। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১২।৩) বলা হয়েছে যে, জীবাত্মা কখনো নিজের স্বরূপ ত্যাগ করেন না। অতএব, তিনি যা করেন, তা "স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" স্বীয় স্বরূপে স্থিত হয়ে করেন। মুক্তি অবস্থায় জীবাত্মা যদি দর্শন, শ্রবণ, চিন্তন করতে চান, তাহলে সংকল্প দ্বারা তিনি তা করতে পারেন। মুণ্ডক উপনিষদের (৩।১।৩) শ্রুতির আধারে বলা যায়— "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" = তখন ব্রহ্মজ্ঞানী পুণ্য-পাপকে দূর করে নির্মল হয়ে পরম সমতা লাভ করেন।

প্রথমত, রাগ, দ্বেষাদি দোষযুক্ত হওয়ার পর কালান্তরে তা থেকে মুক্ত হয়ে জীব কীভাবে সেই নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব পরমেশ্বরের সমান (অনুরূপ) হবে? মুক্ত হওয়ার পরেও জীব অল্পজ্ঞ ও পরিমিত গুণ-কর্ম-স্বভাব সম্পন্ন হয়েই থাকবে। তিনি কখনোই সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ ও অনন্ত সামর্থ্যযুক্ত হতে পারবেন না। দ্বিতীয় 'সাম্যমুপৈতি'-তে 'উপৈতি' ক্রিয়াপদের সামঞ্জস্য তখনই থাকবে, যখন উভয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার করা হবে। 'সাম্য' সর্বদা ভেদ-ঘটিত থাকে।

যদি মুক্তি অবস্থায় ব্রহ্মে আত্মার লয় মেনে নেওয়া হয়, তাহলে আপত্তি কীসের? এর উত্তর হচ্ছে— লয় হওয়ার অর্থ বিনাশ-প্রাপ্ত হওয়া। অতএব পরব্রহ্মে বিলীন হওয়ার অর্থ হচ্ছে সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করা। যদি মুক্তির অর্থ মৃত্যু হয়, তাহলে কেন এর জন্য প্রচেষ্টা করা? যদি মোক্ষাবস্থায় দুঃখের সাথে সাথে আত্মারও নাশ হয়ে যায়, তাহলে এর দ্বারা লাভ কী? এটি তো এমন কথা হলো, "না তো রোগ আছে, আর না রইলো রোগী"। যে জীব মুক্তিকামী সে-ই যদি না থাকে, তবে মোক্ষ কার জন্য? এই ধরনের মোক্ষকে দুঃখের উচ্ছেদ বা এর নিবৃত্তি না বলে জীবাত্মার উচ্ছেদ (অস্তিত্বের বিনাশ) অথবা আত্মহত্যার চেষ্টা বলা অধিক উপযুক্ত হবে। এটি হবে অভাবাত্মক মোক্ষ। কিন্তু জীবাত্মা নিত্য হওয়ার কারণে তাঁর লয় হতে পারে না। জীব স্বরূপত অবিনাশী। ঈশ্বরের মতো জীবও অনাদি তত্ত্ব। অনাদি হওয়ায় জীবও অক্ষয়, অবিনাশী। যখন বস্তুর লয় বা বিনাশ হয়, তখন তা শেষ হয়ে যাবে। যদি জীবের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়, তাহলে সে নিত্য হবে না। যদি সে নিত্য না হয়, তাহলে অবশ্যই সে কারো দ্বারা নির্মিত হয়েছে। যখন সে (জীব) নির্মিত হবে, তার একটি অবয়ব থাকবে এবং তার কোনো উপাদানও থাকতে হবে। এভাবে জীবের সম্পূর্ণ স্বরূপ ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর "নাভাবো বিদ্যতে সৎ" নীতি অনুসারে, জীবাত্মার বিনাশ অর্থাৎ ব্রহ্মের মধ্যে জীবের লয় হওয়া সম্ভব নয়। যিনি নিত্য, তার অভাব (অস্তিত্বের নাশ) হতে পারে না। দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপে স্থিত হয়ে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করার নামই 'মোক্ষ'। যদি মুক্তিতে জীবের লয় (অস্তিত্ব বিলীন) হয়ে যায়, তাহলে মুক্তির আনন্দ কে ভোগ করবে? "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো য়াতি পরাং গতিম্" (গীতা ৬।৪৫) = অনেক জন্মের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে; যদি মোক্ষ লাভকারী জীবাত্মাই না থাকে, তাহলে এই প্রচেষ্টার ফল কে ভোগ করবে? ব্রহ্মের সাথে মুক্ত আত্মার যে সমতা বলা হয়েছে, তা কেবল মুক্তি অবস্থাতে জীবাত্মার দ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগের আধারে বলা হয়েছে (ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ॥ ব্র০ সূ০ ৪।৪।২১)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১) বলা হয়েছে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। য়ো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ। ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি॥" = যিনি হৃদয়াকাশরূপ গুহাতে স্থিত সত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্মকে জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহচর হন এবং সমস্ত কামনাসমূহ বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সাথে ভোগ করেন, পূর্ণকাম হয়ে যান। মুক্তি অবস্থায় সেই জীবাত্মার অব্যাহতগতি হয়। মোক্ষাবস্থায় তিনি এই জগতের যেখানে যেতে চান, সেখানেই আনন্দপূর্বক বিচরণ করেন।

জীবাত্মা যেমন বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর মোক্ষলাভ করে, ঠিক তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের পর আবার বন্ধনে ফিরে আসে। কারণ বন্ধন অথবা মুক্তির কখনো উচ্ছেদ হয় না। যেভাবে এক দেহ ত্যাগ করার পর অন্য দেহ ধারণের প্রক্রিয়া নিরন্তর চলতে থাকে, তদ্রূপ বন্ধনের পর মোক্ষ এবং মোক্ষের পর বন্ধনের প্রক্রিয়াও অবিরাম চলতে থাকে। দুইবার মুক্তির মাঝে বন্ধনের এবং দুইবার বন্ধনের মাঝে মুক্তির এই ধারাবাহিকতা অনাদিকাল

থেকে চলে আসছে। এই সন্দর্ভে দুটির মধ্যে একটি স্থিতি থাকা আবশ্যক, হয় আত্মা অনাদিকাল থেকে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আছে, অথবা এই চক্রটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়েছে। যদি এই চক্রকে অনাদি বলে মনে করা হয়, তাহলে 'বন্ধন' আত্মার একটি স্বাভাবিক গুণ হয়ে ওঠবে এবং সেই অবস্থায় এটি কখনোই শেষ হবে না অর্থাৎ মোক্ষলাভ করাও সম্ভব হবে না, কারণ যে ভাবরূপ পদার্থের কোনো আদি নেই, তার কোনো অন্তও নেই। অতএব, মোক্ষলাভের জন্য অবশ্যই এটি বিশ্বাস করতে হবে যে, জন্ম ও মৃত্যুর ক্রম একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হয়েছিল। জন্ম-মৃত্যুর চক্র একটি নির্দিষ্ট সময়ে শুরু হওয়া অর্থাৎ বন্ধনে আসার আগে নিশ্চয়ই আত্মার মুক্ত হওয়া আবশ্যক। কারণ যদি তখন মুক্ত না হয়, তাহলে কীভাবে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন ওঠতে পারে? এভাবে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, আত্মা এই সময়ে বন্ধনে আছে এবং ভবিষ্যতে কোনো সময় মুক্তি পাবে, আর আত্মা জন্ম-মৃত্যুর বর্তমান ক্রম শুরুর আগে মুক্তি অবস্থায় ছিল। এই ভিত্তিতে, দুইবার মুক্তির ব্যবধানে বর্তমান বন্ধনের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। যদি বর্তমান বন্ধনের আগে মুক্তাবস্থার পর আত্মা বন্ধনে পড়ে যেতে পারে, তাহলে বর্তমান বন্ধনের পর প্রাপ্তব্য মুক্তি লাভ করার পর সে কেন বন্ধনে আসবে না? এর কোনো কারণ নেই। যিনি নিচে পড়ে ওপরে ওঠতে পারেন, তিনি ওপরে ওঠার পর নিচেও পড়তে পারেন। এটি কখনো হতে পারে না যে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে যেতে পারে, কিন্তু মুক্তি থেকে বন্ধনে আসবে না। এভাবে দুইবার মুক্তির মাঝে বন্ধন এবং দুইবার বন্ধনের মাঝে মুক্তির এই ক্রমের না কখনো শুরু ছিল এবং না শেষ হবে। না সর্বদা কোনো বন্ধন থাকবে, আর না মুক্তি থাকবে।

সান্ত (সসীম) কর্মের ফল কখনো অনন্ত (অসীম) হতে পারে না। কর্মতত্ত্ব অনুসারে 'মুক্তি' জীবের অত্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ তার বিশেষ (নিষ্কাম) কর্মের ফলস্বরূপ মুক্তি লাভ হয়। একটি নির্দিষ্ট শরীর এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে অল্প-সামর্থ্যবান জীব কিছু সীমিত কর্মই সম্পাদন করতে পারে। এ ধরনের কর্মের ফল অসীম হতে পারে না। যদি পরমেশ্বর নিয়ত কর্মের চিরন্তন বা অনন্ত ফল (অনন্তকালের জন্য দুঃখ থেকে পরিত্রাণের সুখ) প্রদান করেন, তাহলে তা ন্যায্য হবে না। জল প্রভৃতির প্রয়োগে বস্ত্র পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু কালান্তরে ময়লা লেগে যাওয়ার পর তা পুনরায় মলিন হয়ে যায়। জীবের সামর্থ্য, দেহ, পদার্থ ও সাধন অস্থায়ী বা অনিত্য। এই অস্থায়ী সাধন দ্বারা প্রাপ্ত নৈমিত্তিক মুক্তি চিরস্থায়ী হতে পারে না। অগ্নির কারণে জলে উষ্ণতা আসে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত অগ্নির সংস্পর্শ থাকবে, ততক্ষণ জলে উষ্ণতা থাকবে। জল থেকে অগ্নির সংস্পর্শ সরানো হলেই জলের উষ্ণতা ধীরে ধীরে সমাপ্ত হয়ে যায় এবং এটি তার পূর্বের অবস্থা ফিরে পায়। জীব স্বভাবতই অল্পজ্ঞ; সে যতই চেষ্টা করুক না কেন, সে ব্রহ্মের মতো সর্বজ্ঞ হতে পারে না। এটি সত্য যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা জীবের মুক্তির উপলব্ধি হয়। কিন্তু মুক্তির সময় সে কেবল আনন্দ উপভোগ করে। তখন সে জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হয় না। এর ফলে কালান্তরে তার অর্জিত তত্ত্বজ্ঞান ক্ষীণ হয়ে যায়। যখন মুক্তির নিমিত্তস্বরূপ 'জ্ঞান' (জ্ঞানান্মুক্তিঃ॥ সাংখ্য০ ৩।২৩) হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন সে পুনরায় বন্ধনে চলে আসে। স্বভাবত অল্পজ্ঞ হওয়ার কারণে জীবের বহুজ্ঞতা নিত্য (চিরস্থায়ী) হতে পারে না। এটিই বিশ্বাস করা যৌক্তিক যে, জীবের বন্ধন ও মুক্তির প্রবাহ অনাদি। আর জীবাত্মার মধ্যে অনন্ত আনন্দ উপভোগ করার অসীম সামর্থ্য নেই। যিনি যতটুকু ভার ওঠাতে সক্ষম, তার ওপর ততটুকু ভার দেওয়া উচিত। এক মণ ভার বহন করতে সক্ষম ব্যক্তির মাথায় দশ মণ ভার চাপানো, অথবা চারটি রুটি খেতে পারে

এমন ব্যক্তিকে দশটি রুটি খেতে বাধ্য করা অন্যায় ও অত্যাচার হবে। এভাবে সীমিত সামর্থ্যযুক্ত জীবের দ্বারা অসীম আনন্দ উপভোগ করার আশা করা যায় না। জীবের কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য যেমন সীমিত, তেমনি তার কর্মফল ভোগ করার যোগ্যতাও সীমিত। মোক্ষাবস্থায় জীব পরমেশ্বরের সহচর-রূপে আনন্দ উপভোগ করেন। কিন্তু যেখানে পরমেশ্বর সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে সর্বদা আনন্দস্বরূপ থাকতে সক্ষম, সেখানে জীবাত্মা স্বভাবত অল্পজ্ঞ ও অল্প-শক্তিমান হওয়ার কারণে তার আনন্দও পরিসীমিত। জীব ব্রহ্মের ন্যায় অনন্তকাল পর্যন্ত আনন্দযুক্ত থাকতে পারে না।

বন্ধন ও মোক্ষ পর্যায়ক্রমে আসে। সংসারে বন্ধনের পরে মুক্তি এবং মুক্তির পরে বন্ধন দেখা যায়। সংসারের কাজ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হয়ে প্রত্যেক মনুষ্য গভীর নিদ্রায় চলে যায়। সেই অবস্থায় বাহ্য-পদার্থ থেকে অসম্পৃক্ত হওয়ার কারণে তার দুঃখের অভাব (তিরোভাব) হয়। এই আধারে সুষুপ্তির অবস্থাকে মোক্ষাবস্থার সদৃশ মানা হয়ে থাকে (সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা॥ (সাংখ্য০ ৫।১১৬)। প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে সে আবার সাংসারিক ব্যবহাররূপ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এইপ্রকার বন্ধনের পর মুক্তি এবং মুক্তির পর বন্ধন প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান। যেমন সুষুপ্তির পরে জাগরণ, জাগরণের পরে সুষুপ্তি এবং দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আসা অবশ্যম্ভাবী। একইভাবে মুক্তির পরে বন্ধন এবং বন্ধনের পরে প্রযত্নপূর্বক মুক্তি আসা অনিবার্য। জীবের স্বভাব এমন যে, সে সদা একই অবস্থায় থাকতে চায় না। নিরন্তর সুখের মধ্যে সেই রস অবশিষ্ট থাকে না, যা তার প্রারম্ভিক অবস্থায় হয়ে থাকে। সময়ের সাথে সাথে এর হ্রাস হতে থাকে। যদি অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যও নিত্যদিন ভক্ষণ করা হয়, তাহলে তাতে অরুচি হতে থাকে। এমনকি মধুর সংগীতও দীর্ঘসময় শ্রবণের পর পূর্ববৎ আকর্ষণীয় মনে হয় না। আসলে জীবনের মহত্ত্ব মৃত্যু থেকে এবং সুখের মহত্ত্ব দুঃখ থেকে হয়। একইভাবে, যদি বন্ধনের পরে মুক্তি না থাকে এবং মুক্তির পরে যদি বন্ধন না থাকে, তাহলে নিজের মুক্তিও ভারস্বরূপ (বোঝা) মনে হবে। এইপ্রকার সুখ-দুঃখের মতো বন্ধন ও মুক্তি পর্যায়ক্রমে চলতে থাকলেই মোক্ষানন্দের তীব্র অনুভূতি হওয়া সম্ভব।

অনেক পণ্ডিত কিছু শব্দ-প্রমাণ দেখিয়ে বলেন যে, "মুক্ত আত্মার পুনরায় বন্ধনের যোগ হয় না। জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তিকে 'মোক্ষ' বলে। অতএব, মুক্ত আত্মার আবারো জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ফেঁসে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। উপনিষদাদি গ্রন্থে এ ধরনের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে মুক্তি থেকে পুনরাবৃত্তির স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। যথা—

১. স খল্বেবং বর্তয়ন্ য়াবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসংপদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে।

(ছান্দো০ উ০ ৮।১৫।১)

২. এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্তং নাবর্তন্তে। (ছান্দো০ উ০ ৪।১৫।৫)

৩. তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ। (বৃহদা০ উ০ ৬।২।১৫)

৪. তস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত। (প্রশ্ন০ উ০ ১।১০)

৫. য়স্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে। (কঠ০ উ০ ১।৩।৮)

৬. য়দ্গত্বা ন নিবর্তন্তে। (গীতা ১৫।৬)

৭. অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ॥ (ব্র০ সূ০ ৪।৪।২২) ইত্যাদি।"

এখন এই বাক্যগুলোর দ্বারা উৎপন্ন শঙ্কার সমাধান করা প্রয়োজন। প্রথমত মুক্তির আদি (শুরু) থাকায় এটি নিত্য হতে পারে না। যার আদি আছে, তার অন্ত অনিবার্য। যেমন একটি নদীকে একটি তীরে কল্পনা করা যায় না, তেমনি এমন একটি মুক্তিও হতে পারে না যার শুরু তো আছে, কিন্তু কখনো শেষ হবে না। প্রকৃতপক্ষে, পূর্বোদ্ধৃত বাক্যসমূহ থেকে মুক্তির পুনরাবৃত্তির সিদ্ধান্তের লেশমাত্র বিরোধ নেই। প্রাচীন ঋষিদের বচন-শৈলী না বুঝে, অর্থের অনর্থ (ভুল ব্যাখ্যা) করা হয়। মীমাংসার একটি নীতি আছে "ন হি নিন্দা নিন্দিতু প্রবর্ততেঽপিতু বিধেয় স্তোতুম্"। তদনুসারে "অপশবোবাঽন্যে গো অশ্বেভ্য" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য গোরু ঘোড়া থেকে ভিন্ন অন্য পশুর পশুত্বভাবের ঘোষণা করা নয়, বরং এটি অন্যান্য পশুর চেয়ে গোরু ঘোড়ার প্রশংসা করাই অভীষ্ট। একইভাবে "ন চ পুনরাবর্ততে" এর তাৎপর্য মুক্তি থেকে পুনরাবৃত্তির নিষেধের নয়, বরং মুক্তির পূর্ণকাল পর্যন্ত জীবাত্মা মুক্তিতে থাকে অর্থাৎ মুক্তিকালের মধ্যে জীব আর ফিরে আসে না— এটিই তাৎপর্য। উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা ইত্যাদি শাস্ত্রে যেখানেই এ ধরনের বাক্য পাওয়া যায়, সেখানে এগুলোর এই অভিপ্রায় বুঝতে হবে। মীমাংসা-দর্শনের "সর্বত্বমাধিকারিকম্॥" (১।২।১৬) সূত্র অনুসারে, এটিকে অন্যভাবেও বোঝা যায়। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন হচ্ছে— "পূর্ণাহুত্যা সর্বান্ লোকান্ অবাপ্নোতি, সর্বান্ লোকান্ জয়তি" এর ওপর বিবেচনা করে "সর্বত্বমাধিকারিকম্" সূত্রের মাধ্যমে সমাধান করে বলা হয়েছে যে, পূর্ণাহুতি থেকে যতটা ফল পাওয়া যায়, তারই সর্বত্ব এখানে বিবক্ষিত। মীমাংসার এই অধিকরণ অনুসারে, উপরের বাক্যগুলোর অর্থ নিম্নরূপ জানা উচিত— "উক্ত বচনসমূহে পুনরাবর্তনের যে নিষেধ করা হয়েছে, তা চিরকালীন নিষেধ নয়, বরং প্রকৃত মুক্তির বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ মুক্তির জন্য যে সময় নির্ধারিত, সেই সময়সীমার মধ্যে এ সংসারে মুক্ত জীবের পুনরাবর্তন হয় না।" শব্দ-প্রমাণের দৃষ্টি থেকে বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য সর্বোপরি। ঋগ্বেদে মুক্তি থেকে পুনরাগমনের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়—

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।

কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ॥

অগ্নের্বয়ং প্রথমস্যামৃতানাং মনামহে চারু দেবস্য নাম।

স নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ॥ (ঋগ্বেদ ১।২৪।১-২)

প্রশ্ন:— আমরা কার নাম পবিত্র বলে জানবো? অবিনাশী পদার্থসমূহের মধ্যে বিদ্যমান, সদা প্রকাশস্বরূপ কোন দেব আমাদের সকলকে মুক্তির সুখ ভোগ করিয়ে, পুনরায় এই সংসারে জন্মদান করেন এবং মাতা-পিতার দর্শন করান?

উত্তর:— আমরা এই স্বপ্রকাশস্বরূপ, অনাদি ও সদামুক্ত পরমাত্মার নাম পবিত্র বলে জানবো, যিনি আমাদের সকলকে মুক্তির আনন্দ ভোগ করিয়ে পৃথিবীতে পুনরায় মাতা-পিতার সংযোগে জন্মদান করিয়ে তাঁদের দর্শন করান।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সৃষ্টির রচনা জীবাত্মার কর্মফল ভোগের জন্য করা হয়। মুক্ত আত্মার কোনো কর্ম অবশিষ্ট থাকে না। তাহলে তাদের জন্মদান করার প্রয়োজন কী? এর উত্তর হচ্ছে, পুনরায় মুক্তির রসাস্বাদন করার জন্য। 'মুক্তি' জীবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থা নয়। নিমিত্ত দ্বারা প্রাপ্ত মুক্তি 'নিত্য' না হওয়ার কারণে একদিন না একদিন তা নিশ্চিতরূপে শেষ হয়ে যাবে। এটি জীবাত্মার নিয়ন্ত্রণে নেই। তার উপার্জিত ধন (কর্মফল) ব্যয় হয়ে গেছে। এখন এর জন্য তাকে আবার নতুন করে প্রয়াস করতে হবে। নৈমিত্তিক তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষের সিদ্ধি হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ প্রাপ্ত আনন্দ সে উপভোগ করছিল। মুক্তিকালে ভবিষ্যতের জন্য অতিরিক্ত সংগ্রহ করার সুযোগ ছিল না। পূর্বপ্রাপ্ত জ্ঞানের ক্রমান্বয়ে হ্রাস হতে হতে সে আবার বন্ধনের স্থিতিতে আসে। মুক্তির অভিলাষী জীবের পুনরায় তত্ত্বজ্ঞানের সাধনের প্রয়োজন হলো। "ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্"— মুক্তি লাভে সহায়ক এই সাধন এতদর্থ নির্মিত এই সৃষ্টিতেই উপলব্ধ হয়। অতএব মুক্ত আত্মাকে এই সৃষ্টিতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হবে। তিনি যে সংসার থেকে যা, কালান্তরে সেখানেই ফিরে আসেন এবং অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য যথাপূর্ব প্রচেষ্টা করার সুযোগ লাভ করেন। যদি মুক্ত আত্মা ফিরে না আসে তাহলে ক্ষতি কী? এর উত্তর হচ্ছে, পুনরাবৃত্তি না হলে, সংসারের উচ্ছেদ হয়ে যাবে, জীবগণ অবশিষ্ট না থাকার কারণে। যদি জীবগণের চিরতরে মুক্তি হতে থাকে এবং তাদের মধ্য থেকে কেউই আর ফিরে না আসে, তাহলে একদিন সংসারের উচ্ছেদ হয়ে যাবে। কেননা, যতই বড় ধনকোষ থাকুক না কেন, নিরন্তর ব্যয়ের কারণে তা কোনো এক সময় সমাপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত চিরতরে এই সংসারের উচ্ছেদ হয়নি। "সূর্য়াচন্দ্রমসৌ ধাতা য়থাপূর্বমকল্পয়ৎ। (ঋ০ ১০।১৯০।৩)" প্রবাহ দ্বারা অনাদি এ সৃষ্টির রচনা প্রত্যেক কল্পেই পূর্ববৎ সংঘটিত হয়। এই ক্রম অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ধরে চলতেই থাকে। "ন হি প্রয়োজনমনভিসন্ধায় প্রেক্ষাবন্ত প্রবর্তন্তে"— বিনা প্রয়োজনে প্রবৃত্তি হয় না। প্রয়োজনের লক্ষণ হলো "য়মর্থমধিকৃত্য প্রবর্ততে তৎপ্রয়োজনম্", অর্থাৎ যেই অর্থকে লক্ষ্য করে কেউ প্রবৃত্ত হয়, সেই অর্থকে প্রয়োজন বলা হয়। একইভাবে, পরমেশ্বর কর্তৃক বার-বার সৃষ্টি রচনার পেছনেও কোনো না কোনো প্রয়োজন অবশ্যই আছে। সেই প্রয়োজন "ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ (যোগ০ ২।১৮)" এই সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে। ভোগ ও অপবর্গের এই নির্দেশ 'অকাম' ও 'নিত্যমুক্ত' পরমেশ্বরের জন্য হতে পারে না। এতে স্পষ্ট হয় যে, জীবের উদ্দেশ্যেই বার-বার সৃষ্টির রচনা করা হয়। তখন, যদি সৃষ্টি প্রবাহ দ্বারা অনাদি হয়, তাহলে জীবাত্মার মুক্তিও প্রবাহ দ্বারা অনাদি বলে স্বীকার করতে হবে। জীবগণের মোক্ষে গমন করে আবর্তনের মাধ্যমেই এটি হওয়া সম্ভব।

অনেকে বলতে পারেন— "মুক্তি থেকে ফিরে না আসলেও সংসারের উচ্ছেদ ঘটবে না। কারণ আবশ্যকতা-অনুসারে নতুন জীবাত্মাগণের উৎপত্তি হতে থাকবে।" কিন্তু তা কখনো হতে পারে না। কারণ তখন জীবাত্মা অনিত্য হয়ে পড়বে। পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান হওয়ার অর্থ এই নয় যে তিনি যা চান, তা-ই করতে পারেন। সর্বশক্তিমানের তাৎপর্য এটুকুই যে, পরমেশ্বরকে তাঁর নিজ কার্য সম্পাদনে অন্য কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। জীবগণের ভোগ ও অপবর্গের ব্যবস্থা করা পরমেশ্বরের কাজ, জীবাত্মাদের সৃষ্টি করা নয়। যদি 'দুর্জনতোষন্যায়' দ্বারাও পরমেশ্বর কর্তৃক জীবগণের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়, তাহলে এই জীবগণের অনিত্য হওয়া স্বতসিদ্ধ। কারণ যার উৎপত্তি হয়, তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আর যখন জীবাত্মাই থাকলো না, তাহলে তার মুক্তি নিত্য হবে কীভাবে? তখন জীবগণের উৎপত্তির কারণ কী হবে? জীবের না থাকার ফলে কেবল দুটি পদার্থ অবশিষ্ট রয়েছে— ঈশ্বর ও প্রকৃতি। সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং নিত্যমুক্ত পরমেশ্বর থেকে একদেশী, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিমান এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ জীবের উৎপত্তির কল্পনা কীভাবে করা সম্ভব? একইভাবে জড় প্রকৃতি থেকে চেতন তত্ত্ব জীবের উৎপত্তিও অসম্ভব। অতএব, অবিনাশী জীবাত্মার উৎপত্তি সম্ভব নয়। মুক্তি থেকে পুনরাবৃত্তিতেই এসব সমস্যার সমাধান নিহিত আছে।

অনেকে আক্ষেপ করে বলতে পারেন, "জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় আবর্তনশীল হওয়ায় এ ধরনের মুক্তি কাম্য হতে পারে না। আজ যা আছে, কাল তা নেই— এমন ক্ষণস্থায়ী মুক্তির কামনা করা এবং তা প্রাপ্তির জন্য প্রয়াস করা বৃথা। "অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো য়াতি পরাং গতিম্। (গীতা ৬।৪৫)" জন্ম-জন্মান্তরের অবিরত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ প্রাপ্ত মুক্তি থেকেও কিছু সময়ের পর যদি আবারো এই সংসারে ফিরে আসতেই হয়, তাহলে মুক্তি অবস্থায় গমন করে কী লাভ?" এর উত্তর হচ্ছে, "মৃত্যোরপরিহার্যত্বেঽপি জিজীবিষেব" = মৃত্যুর অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও জীবনের ইচ্ছা থাকার মতো। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ (গীতা ২।২৭)"— যে জন্ম নিয়েছে, তার মৃত্যু নিশ্চিত; এ কথা জেনেও মানুষ জীবিত থাকতে চায় এবং জীবনের সাধন সংগ্রহ করে। ভোজনের কিছু সময় পর অবশ্যই ক্ষুধা লাগবে, এ কথা জেনেও মনুষ্য বার-বার ভোজন করে। তাহলে মুক্তির মধ্যে এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করা কী ছোট বিষয় যে এরূপ মুক্তির জন্য কোনো প্রচেষ্টা করা নিরর্থক হবে? মুক্তির সময়কাল হচ্ছে, ছত্রিশ হাজার বার এই জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয়ের সময়ের সমান। এক বার সৃষ্টির উৎপত্তি ও প্রলয়ে ৮ অরব (বিলিয়ন) ৬৪ কোটি বছর সময় লাগে। এভাবে ছত্রিশ হাজার বার সৃষ্টির উৎপত্তি এবং প্রলয় হতে সময় লাগবে ৩১ নীল ১০ খরব ৪০ অরব বছর (৩১১ ট্রিলিয়ন ৪০ বিলিয়ন বছর)। এটি অন্যভাবেও বুঝা যেতে পারে, যথা— ৪৩ লক্ষ ২০ হাজার বছরের এক চতুর্যুগী, এরূপ ২ হাজার চতুর্যুগীর এক (ব্রাহ্ম) অহোরাত্র, এই ধরনের ৩০টি অহোরাত্রের এক মাস, এরকম ১২ মাসের এক বছর এবং এরকম ১০০ বছরের এক পরান্তকাল (মহাকল্প) হয়। এই দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করে কেবল আনন্দেই অবস্থান করা কোনো সাধারণ কথা নয়। একে কীভাবে জন্ম-মৃত্যুর সদৃশ বলা যেতে পারে?

এখন জানা প্রয়োজন যে, মুক্তিতে আত্মা কীরূপ অবস্থায় থাকে। "ন মুক্তস্য স্থূলশরীরম্" অর্থাৎ মুক্তাত্মার স্থূল-শরীর থাকে না। ত্রিবিধ দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়াকে মোক্ষ বলা হয়। কিন্তু শরীর থাকাকালীন তা সম্ভব নয়। যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদে (৮।১২।১) বলা হয়েছে— "আত্তঃ বৈ সশরীরঃ প্রিয়াপ্রিয়াভ্যাং" = ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত শরীরের

প্রিয়-অপ্রিয় অর্থাৎ সাংসারিক সুখ-দুঃখ দ্বারা আবদ্ধ থাকা অনিবার্য। মোক্ষাবস্থায় এসব দুঃখের পূর্ণরূপে বিলুপ্তি ঘটে। এর ফলে সেই অবস্থায় স্থূল-শরীর থাকা সম্ভব নয়। এজন্যই ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮।১২।১) বর্ণিত হয়েছে— "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"— মোক্ষ অবস্থায় অশরীর জীবাত্মাকে প্রিয়-অপ্রিয় (সাংসারিক সুখ-দুঃখ) স্পর্শ করে না। সেখানে আত্মার সাথে প্রাকৃত শরীর, ইন্দ্রিয়াদির কোনো প্রকারের সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু মননাত্মক শুদ্ধ সংকল্পময় শরীর, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের শুদ্ধ শক্তি বিদ্যমান থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৮।১২।৫) অনুসারে, মুক্ত আত্মা মন দ্বারা অর্থাৎ মননাত্মক শক্তির দ্বারাই সমস্ত কামনাসমূহ উপভোগ করার মাধ্যমে আনন্দে মগ্ন থাকেন। যদি সেখানে শরীর ইন্দ্রিয়াদির অস্তিত্ব থাকত, তাহলে মননাত্মক শক্তির কথা বলা নিরর্থক। জীবাত্মা নিজের (স্বাভাবিক) সামর্থ্যের দ্বারা সংকল্পময় শরীর দ্বারা সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করেন। আনন্দের অনুভূতিই মুক্ত আত্মার ঐশ্বর্য ভোগ। তাঁর এই ঐশ্বর্য ভোগ অথবা ঐশ্বর্যের অনুভব সংকল্পমাত্রই হয়। আত্মার এই সংকল্প স্বসামর্থ্যরূপ, যার অভিব্যক্তি ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার (উপলব্ধি) হওয়ার পরে হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৮।২।১০) বলা হয়েছে "য়ং য়মন্তমভিকামো ভবতি য়ং কামং কাময়তে, সোঽস্য সংকল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি। তেন সম্পন্নো মহীয়তে॥" অর্থাৎ "মুক্তাত্মা যে যে প্রদেশ ও কামনাসমূহের আকাঙ্ক্ষা করেন, তা তাঁর সংকল্পমাত্রই উদ্ভূত হয়ে যায়। তিনি ওইসব প্রাপ্ত হয়ে মহিমান্বিত (আনন্দিত) হন।" এর ব্যাখ্যা করতে শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।৪।২।১৭) বলা আছে— "প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্ বাক্, পশ্যংশ্চক্ষুঃ, শৃণ্বঞ্ছ্রোত্রং, মন্বানো মনস্, তান্যস্যৈতানি কর্মনামানি" অর্থাৎ মুক্তিতে ভৌতিক শরীর ও ইন্দ্রিয়গোলক জীবাত্মার সাথে না থাকার কারণে তিনি সংকল্পমাত্র যখন শুনতে চান তখন শ্রোত্র, স্পর্শ করতে চান তখন ত্বক্, দর্শনের জন্য চক্ষু, আস্বাদনের জন্য রসনা, বিবেচনা করার জন্য বুদ্ধি এবং স্মরণ করার জন্য চিত্ত হয়ে যায়। এর তাৎপর্য এই নয় যে, মোক্ষাবস্থায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের আবির্ভাব ঘটে। এর তাৎপর্য কেবল এই যে, মুক্তাত্মা নিজের শক্তিরূপ সংকল্প দ্বারা ভাবনা-অনুসারে এরূপ অনুভব করতে থাকে। বেদান্তদর্শনে (৪।৪।৮) বলা হয়েছে— "সংকল্পাদেব তু তচ্ছ্রুতেঃ॥" অর্থাৎ শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত যে, মুক্ত আত্মার কামনা সংকল্পমাত্র সিদ্ধ (পূর্ণ) হয়। শ্রুতিতেও (ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৯) বলা হয়— "য়ত্রানুকামং চরণং..... তত্র মামমৃতং কৃধি..... ॥" অর্থাৎ যেখানে মুক্তাত্মা কামনানুসারে বিচরণ করে, সেখানে আমাকেও অমর (মুক্ত) করে দাও। এখন যেসব সামর্থ্যের দ্বারা জীবাত্মা স্থূল-শরীর ব্যতীত মুক্তির আনন্দ উপভোগ করেন, সেগুলো জানা উচিত। বল, পরাক্রম, আকর্ষণ, প্রেরণা, গতি,ভাষণ, বিবেচন, ক্রিয়া, উৎসাহ, স্মরণ, নিশ্চয়, ইচ্ছা, প্রেম, দ্বেষ, সংযোগ, বিয়োগ, সংযোজক, বিভাজক, শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, স্বাদন, গন্ধগ্রহণ এবং জ্ঞান— এই চব্বিশ প্রকার সামর্থ্যের অধিকারী মুক্ত জীব।

মুক্তি জীবনকালে প্রাপ্ত হয়, না কি মৃত্যুর পর? এর উত্তর হচ্ছে, মানুষ গুণাতীত হয়ে সশরীর জীবন্মুক্ত হয়ে যান। মুক্তির অর্থ এখন আগামীতে আর জন্ম-গ্রহণ না করা। অতএব, যদি জীবদ্দশায় মুক্তি না প্রাপ্ত হলে, তাহলে মৃত্যুর পরে তো মুক্তি প্রাপ্তির সাধন না থাকার কারণে মুক্তির জন্য কোনো প্রচেষ্টা সম্ভব হবে না। সাংখ্য-দর্শনে (৫।১১৬) বলা হয়েছে যে, "সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা॥" অর্থাৎ সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষ অবস্থায় ব্রহ্মরূপতা— ত্রিবিধ দুঃখ থেকে নিবৃত্তি হয়ে আনন্দের অনুভূতি হয়। সমাধি ও সুষুপ্তির অবস্থায়, মোক্ষের সদৃশ দুঃখের অভাব এবং আনন্দের আবির্ভাবের কারণ হচ্ছে, সেই অবস্থায় বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বন্ধ হওয়ার কারণে

প্রাকৃত জগতের সাথে জীবাত্মার কোনো সম্বন্ধ না থাকা। যখন আত্মজ্ঞান এবং নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা মনুষ্য জাগ্রত-অবস্থায় ওইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত করে, তখন সে জীবন্মুক্ত হয়ে যায়। কঠোপনিষদে (২।৩।১০) এই অবস্থার বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

য়দা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥১০॥

যখন মন ও ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ-নিজ কার্য বন্ধ করে স্থির হয়ে যায় এবং বুদ্ধিও জ্ঞান বিরূদ্ধ বিবিধ প্রচেষ্টা করে না, তখন তাকে পরমগতি = মোক্ষ = জীবন্মুক্ত অবস্থা বলা হয়। গীতাতেও (১৪।২৩) বলা হয়েছে—

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্য়ো ন বিচাল্যতে।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং য়োঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥

যে মনুষ্য সত্ত্বাদি গুণসমূহ দ্বারা বিচলিত না হয়ে স্থির থাকেন এবং গুণসমূহের অধীনে থেকে কার্যে প্রবৃত্ত হন না, এভাবে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে যে জয় করেছে, তাঁর অবস্থাকে বলা হয় গুণাতীত বা জীবন্মুক্ত অবস্থা। এই অধ্যায়ের ২৪-২৫ তম শ্লোকে বর্ণিত গুণাতীতের সমস্ত লক্ষণ দেহধারী ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য হবে।

জীবন্মুক্ত আত্মা যোগাভ্যাসের মাধ্যমে শুদ্ধ হওয়া অন্তকরণের দ্বারা আনন্দ অনুভূতির সাথে অনেক দৈহিক ব্যাপার করতে সমর্থ হন। জীবন্মুক্ত অবস্থায় যদিও আনন্দ অনুভূতির জন্য শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহের কোনো উপযোগিতা নেই, তবুও জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানী ওঠা-বসা, আহার-বিহার, গমনাগমন ইত্যাদি সাধারণ দৈহিক ব্যাপার করার সময়ও আনন্দের অনুভূতিতে লীন থাকেন। কিন্তু এর পরবর্তী অবস্থার নাম হচ্ছে, 'বিদেহ মুক্তি'। বিদেহ মুক্তি প্রাপ্তির জন্য পূর্বোক্ত অবস্থা (জীবন্মুক্ত অবস্থা) সাধনস্বরূপ। সাধ্য-সাধনে অভেদোপচার দ্বারা একে মুক্তি বলা হয়ে থাকে। বস্তুত 'জীবন্মুক্ত' শব্দের অভিপ্রায় হচ্ছে, পরম মোক্ষ-সুখের পূর্ণ অধিকারী, যার মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য এখন আর কিছুই করার বাকি থাকে না। সুষুপ্তিতে আনন্দের অনুভূতি শরীর-সহিত কিন্তু জ্ঞান-রহিত হয়, সমাধি ও জীবনমুক্ত অবস্থায় আনন্দের অনুভূতি শরীর-সহিত এবং জ্ঞান-সহিত হয়, মৃত্যুর পরে বিদেহ মুক্তিতে আনন্দের অনুভূতি শরীর-রহিত এবং জ্ঞান-সহিত হয়। বিদেহ মুক্তি তখনই প্রাপ্ত হয়, যখন কেউ প্রথমে সমাধি ও জীবন্মুক্তের অবস্থা লাভ করতে পারে।

মোক্ষের যোগ্য অধিকারী সেই ব্যক্তিই হতে পারে, যার নিকট মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন রয়েছে। মোক্ষপ্রাপ্তির সাধন চারটি; যথা— (১) বিবেক, (২) বৈরাগ্য, (৩) ষট্ক সম্পত্তি ও (৪) মুমুক্ষুত্ব।

(১) বিবেক— পদার্থসমূহের গুণ-কর্ম-স্বভাব সম্পর্কে জেনে সেগুলোর যথাবৎ উপযোগ হলো 'বিবেক'। যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি সম্ভব নয়। অতএব, মোক্ষপথের অনুগামীর জন্য পৃথিবী থেকে পরমেশ্বর পর্যন্ত প্রত্যেক পদার্থের গুণ-কর্ম-স্বভাবকে জানা অত্যাবশ্যক। পদার্থের গুণসমূহকে না জেনে সেগুলোর উপযোগ করা যায় না।

অনিত্যকে নিত্য, অপবিত্রকে পবিত্র, দুঃখকে সুখ এবং অনাত্ম (জড়) শরীরাদি বস্তুকে আত্মা (চেতন) মনে করা অর্থাৎ যে বস্তু যেরূপ তাকে ওইরূপ না বুঝে তার বিপরীত মান্য করাই হলো 'অবিদ্যা' যা সকল দুঃখের মূল। বিবেক হয়ে যাওয়ার পর এর প্রতিকার হয়। এই বিবেক জ্ঞান সর্বপ্রথম শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন এবং আপ্ত পুরুষদের সদুপদেশ থেকে হয়। অতঃপর যুক্তিপূর্বক মনন দ্বারা পুষ্ট এবং দৃঢ় হয়। যখন আত্মা জানতে পারেন যে, এই শরীর, ইন্দ্রিয়, ভৌতিক পদার্থ ইত্যাদি প্রাকৃতিক রচনা, এই কারণে জড় ও পরিণামী পদার্থ এবং শরীরাদি থেকে ভিন্ন আত্মতত্ত্ব চেতন ও অপরিণামী, তখন তিনি এগুলোর যথার্থ উপযোগ করে প্রকৃতি থেকে অসম্পৃক্ত শুদ্ধ রূপের সাক্ষাৎকার করেন।

(২) বৈরাগ্য— সত্যাচরণের অনুষ্ঠান এবং অসত্যাচরণের ত্যাগকে 'বৈরাগ্য' বলা হয়। যখন মনুষ্য বিবেক দ্বারা সত্যাসত্য = পদার্থসমূহের সৎ-অসৎস্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞাত হয় অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের পার্থক্যকে ভালোভাবে বুঝতে পারে, তখন নিত্য পদার্থসমূহের প্রতি প্রবৃত্ত এবং অনিত্য পদার্থসমূহের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে যায়। এটিই বৈরাগ্যের স্বরূপ।

(৩) ষট্ক সম্পত্তি— শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান— এই ছয়টিকে 'ষট্ক সম্পত্তি' বলা হয়।

(ক) আত্মা এবং অন্তঃকরণকে অধর্ম থেকে সরিয়ে ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত রাখাকে 'শম' বলে।

(খ) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ এবং শরীরকে ব্যভিচারাদি দুষ্কর্ম থেকে সরিয়ে শুভ কর্মে প্রবৃত্ত করাকে 'দম' বলে।

(গ) দুষ্কর্মকারীদের সংসর্গ থেকে সর্বদা দূরে থাকার নাম 'উপরতি'।

(ঘ) যতই নিন্দা-স্তুতি, হানি-লাভ হোক না কেন, তখন হর্ষ ও শোককে ত্যাগ করে মোক্ষ প্রাপ্তির সাধনে প্রবৃত্ত থাকার নাম 'তিতিক্ষা'।

(ঙ) বেদাদি শাস্ত্র এবং এগুলোর জ্ঞাতা আপ্ত পুরুষদের বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস এবং সেগুলোর অনুকূল আচরণকে 'শ্রদ্ধা' বলে।

(চ) চিত্তের একাগ্রতাকে 'সমাধান' বলা হয়।

(৪) মুমুক্ষুত্ব— মুক্তিতে পরম অনুরাগ (প্রীতি) হচ্ছে 'মুমুক্ষুত্ব'। ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তের যেরূপ অন্ন-জল ব্যতীত অন্য কিছুই ভালো লাগে না, তদ্রূপ মুক্তির সাধন ও মুক্তি ব্যতীত কোনো কিছুতেই প্রীতি না রাখাকে 'মুমুক্ষুত্ব' বলে।

এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব নয়, অধিকন্তু জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনার সমন্বয়েই মোক্ষলাভ হয়। আত্মার স্বাভাবিক গুণ জ্ঞান এবং কর্ম (প্রযত্ন)। মানব শরীরের গঠনও এই দুই গুণের সাক্ষী দেয়। শরীরে দুই প্রকারের ইন্দ্রিয় আছে, যথা— জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় আত্মার 'কর্ম'-রূপ গুণকে স্বার্থক করার জন্য এবং কর্মেন্দ্রিয় আত্মার 'জ্ঞান'-রূপ গুণকে সফল করার জন্য রয়েছে। বস্তুত জ্ঞাত

হওয়া কেবলমাত্র জ্ঞাত হওয়ার জন্য নয়, কর্ম করার জন্য। কর্মের দিশা-নির্দেশ জ্ঞান দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম অন্ধ এবং কর্ম ব্যতীত জ্ঞান পঙ্গু। এদের সংযোগ অথবা সহযোগ দ্বারাই জীবন যাত্রা সম্ভব। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম মিলিত হয়ে আত্মাকে কোথায় নিয়ে যাবে? যদি জ্ঞান ও কর্মের কোনো লক্ষ্য না থাকে, তবে বন্ধন থেকে মুক্ত করার স্থানে তাকে আরো দৃঢ় করবে। অতএব, দুটিরই সমান উদ্দেশ্য যে, আত্মাকে পরমেশ্বরের নিকট পৌঁছানো। জ্ঞান এবং কর্ম দুটোর ভেতর সামঞ্জস্য স্থাপিত করে যজুর্বেদে (৪০।১৪) বলা হয়েছে— "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥" অর্থাৎ বিদ্বান জীব কর্মের দ্বারা মৃত্যুর ভয়কে অতিক্রম করে, জ্ঞান দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত করেন। এই অমরত্ব পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে প্রাপ্ত হয়। "য়স্য চ্ছায়াঽমৃতম্ (যজু০ ২৫।১৩)" = যাঁর ছায়ায় (আশ্রয়ে) মোক্ষলাভ হয়— বেদমন্ত্রে এই ভাব নিহিত রয়েছে। যেরূপ তাপ-গুণযুক্ত অগ্নির সামীপ্য দ্বারা উষ্ণতা প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা (নিকটে উপবেশন) দ্বারা ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হয়। অতএব, জ্ঞানপূর্বক কর্ম সম্পাদন করে পরমেশ্বরের দিকে অগ্রসর হওয়াই মোক্ষাভিলাষী সকল মনুষ্যের কর্তব্য।

কিন্তু মোক্ষের সদৃশ এরূপ মহান্ উপলব্ধি একদিনে হয় না, বরং অনেক জন্মের প্রযত্নের ফলস্বরূপ মোক্ষলাভ হয়। মুক্তির জন্য অপেক্ষিত সাধনের অভ্যাস দীর্ঘকাল পর্যন্ত করতে হয়। শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত এই অভ্যাস বহু জন্ম পর্যন্ত করতে হয়। তবেই কখনো মুক্তি লাভ হয়।

(সংক্ষেপিত)

সন্দর্ভ গ্রন্থ— অনাদি তত্ত্ব দর্শন

প্রসঙ্গ–সামবেদ

সামবেদের নামকরণ

'সাম' শব্দটিকে অথর্ববেদে 'সা' এবং 'অম' এর সংযোগে নিষ্পন্ন হিসেবে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। সেখানে চতুর্দশ কাণ্ডে বিবাহ সূক্তে বর কর্তৃক বধূকে লক্ষ্য করে নিম্নের মন্ত্রটি পাঠের বিধি রয়েছে–

অমোঽহমস্মি সা ত্বং সামাহমস্ম্যৃক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্।

তাবিহ সং ভবাব প্রজামা জনয়াবহৈ॥

(অথর্ব০ ১৪।২।৭১ তথা ঐত০ ব্রা০ ৮।২৭, বৃহ০ উপ০ ৬।৪।২০)

এই মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হচ্ছে, তুমি 'সা', আমি 'অম'। এভাবে আমাদের যুগল 'সাম'।

এখানে 'সা' দ্বারা বাণী এবং 'অম' দ্বারা প্রাণবল বোঝানো হচ্ছে– "প্রাণো বাবামো বাক্ সা তৎসা" (জৈ০ উ০ ব্রা০ ৪।২৩।৩)। যেভাবে বাণী এবং প্রাণের মিলনে সাম-সংগীত উৎপন্ন হয় সেভাবেই বধূ-বরের মিলনে গৃহস্থ-সংগীত উৎপন্ন হয়ে থাকে– "সা চ অমশ্চেতি তৎ সান্নঃ সামত্বম্" (বৃহ০ উপ০ ১।৩।২২)।

শতপথ ব্রাহ্মণ, কাঠক সংহিতা তথা জৈমিনীয় উপনিষদ ব্রাহ্মণেও 'সা' এবং 'অম' যোগে 'সাম' শব্দটি নিষ্পন্ন বলা হয়েছে বলে মত দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে, সামবিধান ব্রাহ্মণে 'সাম' শব্দটি 'সম' থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, ঋগ্বেদের ছন্দ এবং সামবেদের ছন্দ সমান। এই সম ছন্দযুক্ত হওয়ার কারণেই এই বেদের নাম হচ্ছে 'সাম'।

ব্যাকরণের দৃষ্টিতে সাম শব্দটি কয়েকভাবে নিষ্পন্ন হতে পারে। প্রথমত সম্ উপসর্গ-পূর্বক মানার্থক মাঙ্ ধাতু থেকে। ঋকের সমান পরিমাণযুক্ত হওয়ার কারণে 'সাম' বলা হয়। অর্থাৎ ঋক সমূহ যেভাবে ছন্দোবদ্ধ থাকে, সেভাবেই 'সাম' ও হয়ে থাকে (সম্মা সাম)। "য়া ঋক্ তৎ সাম" (ছা০ উপ০ ১।৩।৪)

দ্বিতীয়ত 'সাম' শব্দটি 'ষো অন্তকর্মণি' ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন হয়েছে। 'সামযোনিমন্ত্র'কে বা সামগানকে 'সাম' এই জন্য বলা হয়, কেননা তা মানসিক অশান্তি, দুঃখাদি বিনষ্ট করে। সাম প্রাণশক্তির সঞ্চার করে। এই বিষয়ে শাস্ত্রে বলা হচ্ছে– "সাম প্রাণং প্র পদ্যে" (যজু০ ৩৬।১), "সাম। প্রাণো বৈ সাম। প্রাণে হীমানি সর্বাণি ভূতানি সম্যঞ্চি হাস্মিন্ৎসর্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যায় কল্পন্তে সান্নঃ সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তি য় এবং বেদ।" (শত০ ১৪।৮।১৪।৩)

তৃতীয়ত 'সাম' শব্দটি নৈদানসমূহের নাম থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। যা অনুযায়ী 'সম'-পূর্বক 'মন জ্ঞানে' বা 'মনু অববোধনে' ধাতু থেকে 'সাম' শব্দ নিষ্পন্ন। ঋকের সমতূল্য মানার কারণে একে 'সামযোনিমন্ত্র' বা 'সাম' বলা হয়। "স এষ সর্বৈর্লোকৈস্সমঃ তদ্যদেষ সর্বৈর্লোকৈস্সমস্তস্মাদেষ এব সাম স হ বৈ সামবিৎস সাম বেদ য় এবং বেদ" (জৈ০ উ০ ব্রা০ ১।১২।৫)

নামকরণের পর আরেকটু ছোট বিষয় নিয়ে আলোচনা আবশ্যক। সর্বপ্রথম আদিত্য ঋষি সামবেদ প্রাপ্ত করেছিলেন। এই আদিত্য কি জড় সূর্য? এর উত্তর হলো– এই আদিত্য নাম দ্বারা কোনো জড় জ্যোতিষ্ককে বা সূর্যকে বোঝায় না বরং একজন ঋষিকে বোঝায়। মহর্ষি স্বামী শ্রীমদ্দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা গ্রন্থে বলেছেন–

তে তু জ্ঞানরহিতা জড়াঃ সন্তি? মৈবং বাচ্যং, সৃষ্ট্যাদৌ মনুষ্যদেহধারিণস্তে হ্যাসন্। কুতঃ জড়ে জ্ঞানকার্য্যাসম্ভবাৎ। যত্রার্থাসম্ভবোঽস্তি তত্র লক্ষণা ভবতি। তদ্যথা কশ্চিদাপ্তঃ কঞ্চিৎপ্রতি বদতি মঞ্চা ক্রোশন্তীতি। অত্র মঞ্চস্থা মনুষ্যাঃ ক্রোশন্তীতি বিজ্ঞায়তে। তথৈবাত্রাপি বিজ্ঞায়তাম্। বিদ্যাপ্রকাশসংভবো মনুষ্যেষ্বেব ভবিতুমর্হতীতি। অত্র প্রমাণম্—

তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বেদা অজায়ন্তাগ্নেঋগ্বেদো বায়োর্যজুর্বেদঃ সূর্যাৎসামবেদঃ। (শত০ ১১।৫।২।৩) এষাং জ্ঞানমধ্যে প্রেরয়িৎবা তদ্দ্বারা বেদাঃ প্রকাশিতাঃ।

অর্থাৎ *প্রঃ তাঁরাও তো জ্ঞান রহিত জড় পদার্থ ছিলেন?*

উঃ না না এরূপ বাক্য বলবেন না। এঁরা সৃষ্টির আদি সময়ে শরীরধারী মনুষ্য ছিলেন। যেহেতু জড় পদার্থে জ্ঞানের কার্য বা প্রকাশ অসম্ভব এবং যে যে স্থানে অর্থ অসম্ভব হয়, সেখানে লক্ষণা হয়ে থাকে, অর্থাৎ যে লক্ষণ ধরলে, ঐ কার্য বা অর্থ সম্ভব, সেখানে সেই অনুসারে অর্থ করতে হবে। যেমন– কোনো সত্যবাদী ধর্মাত্মা বিদ্বান আপ্ত পুরুষ যদি বলেন যে, 'মাঠের মধ্যে মঞ্চ শব্দ করছে' তবে এস্থলে লক্ষণ দ্বারা এরূপ বুঝতে হবে যে, মঞ্চের স্বয়ং শব্দ করা অসম্ভব, অতএব মঞ্চস্থ কোনো ব্যক্তি শব্দ করছে। তেমনি এটিও জ্ঞাত হবেন যে, মনুষ্যেই বিদ্যার প্রকাশ হওয়া সম্ভব, অন্যত্র নয়। এবিষয়ে (তেভ্যঃ) ইত্যাদি শতপথ ব্রাহ্মণের প্রমাণ লিখিত আছে যে, (অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অঙ্গিরা) এই চার ঋষিগণের জ্ঞান মধ্যে পরমেশ্বর (বেদ) প্রেরণা দিয়ে ছিলেন, পরে ঐ চার ঋষি ব্রহ্মাদি ঋষিগণের মধ্যে চার বেদ প্রকাশ করে ছিলেন।

পৌরাণিক বিদ্বান শ্রীসায়ণাচার্যও উক্ত মতের পরিপোষক। তিনি ঋগ্বেদভাষ্যের ভূমিকায় বলেছেন–

'জীববিশেষৈরগ্নিবায়্বাদিত্যৈর্বৈদানামুৎপাদিতত্বাৎ। ঋগ্বেদ এবাগ্নেরজায়ত যজুর্বেদো বায়োঃ সামবেদ আদিত্যাৎ (ঐত০ ব্রা০ ৫।৩২) ইতি।'

অর্থাৎ *অগ্নি, বায়ু, আদিত্য জীব বিশেষ।*

সামবেদ কি ঋগ্বেদেরই অংশ বা সংকলন ?

কিছু ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বিদ্বানগণের ধারণা হলো সামবেদের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা বা মৌলিকত্ব নেই, বরং এটি গানের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত ঋকের সংকলনমাত্র। এটি মূলত তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা। কারণ–

(১) সামবেদ যদি শুধু গানের জন্যই ঋগ্বেদ থেকে সংকলন করা হত, তবে এতে কেবল সামগানের জন্য প্রয়োজনীয় মন্ত্রগুলোই থাকত। অথচ সামবেদে এমনটি দেখা যায় না। সামবেদে ৪৫০টি এমন মন্ত্র আছে, যেগুলোর উপর সামগান আরোপিত হয় না। শুধু গানের জন্য সামবেদ সংকলিত হলে সামবেদে এমন মন্ত্রের সংগ্রহ থাকত না।

(২) সামবেদে প্রাপ্ত অধিকাংশ ঋগ্বেদীয় ঋকগুলোর মধ্যে আংশিক সাম্যতা আছে। কিছু ঋকে পাঠভেদ আছে, কিছু কিছু ঋকে পাদ-ব্যত্যয় আছে, কিছু ঋক আবার অপূর্ণ। যদি ঋগ্বেদ থেকে এই ঋকসমূহ নেয়া হত তাহলে এতে পাঠভেদ থাকত না এবং ঋকসমূহ আংশিক ভাবে না নিয়ে পূর্ণরূপেই নেয়া হত। যেমন– ঋগ্বেদে "অপো মহি ব্যয়তি" (ঋ০ ৭।৮১।১) পাঠ আছে, কিন্তু সামবেদে "অপো মহী বৃণুতে" (সাম০ ৩০৩) পাঠ রয়েছে। ঋগ্বেদে "অরং বহন্তি মন্যবে" (ঋ০ ৬।১৬।৪৩) এবং সামবেদে "অরং বহন্ত্যাশবঃ" (সাম০ ২৫) পাঠ রয়েছে। একই

ভাবে শব্দের বানানেও ঋগ্বেদে ও সামবেদে পার্থক্য আছে। যেমন– ঋগ্বেদে "ইদং বিষ্ণুঃ...পাংসুরে" (ঋ০ ১।২২।১৭) মন্ত্রে 'পাংসুরে' পাঠ থাকলেও সামবেদে 'পাংসুলে' (সাম০ ১৬৬৯) পাঠ আছে। আবার ঋগ্বেদের "পরি ত্যং হর্য়তং হরিম্" (ঋ০ ৯।৯৮।৭) মন্ত্রের শুধু একটি পাদই সামবেদে "পরি ত্যং হর্য়তং হরিম্" (সাম০ ১৬৮১) রূপে রয়েছে, শেষ তিনটি পাদ এখানে নেই। এগুলো আংশিক সাম্য। এরকম উদাহরণ অনেক রয়েছে। আমাদের সামবেদ ভাষ্যের টিপ্পনীতে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পাঠভেদ বা শব্দভেদগুলো কোনো বিকৃতি বা কোন অপপাঠ নয়, বরং সামবেদেরই স্বতন্ত্র সত্তা, মৌলিকত্ব ও গভীর তাৎপর্য নির্দেশ করে।

(৩) সামবেদের মন্ত্রগুলো যদি ঋগ্বেদ থেকে সংকলন করা হত তবে সামবেদের এই মন্ত্রগুলোর ঋষি ও দেবতাও ঋগ্বেদের ঋষি ও দেবতার সাথে অভিন্ন হত। কিন্তু সামবেদের অনেক মন্ত্রের ঋষি ও দেবতার সাথে ঋগ্বেদের ঋষি ও দেবতার ভিন্নতা দেখা যায়। এই ভিন্নতাগুলো আমাদের বেদভাষ্যের টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

(৪) যদি সামবেদের মন্ত্র ঋগ্বেদ থেকেই নেয়া হত তাহলে সামবেদের মন্ত্রগুলো সাজানোর ক্ষেত্রে সার্বিক দিক দিয়ে বা অংশত ঋগ্বেদের ক্রমকেই অনুসার করা হত। কিন্তু সামে এমনটি হয়নি।

(৫) ঋগ্বেদ ও সামবেদের স্বরাঙ্কন পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। ঋগ্বেদে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের জন্য পৃথক চিহ্ন রয়েছে। অপর দিকে, 'নারদীয় শিক্ষা' অনুসারে সামবেদে ১, ২, ৩ অংকগুলো দ্বারা যথাক্রমে মধ্যম (ম), গান্ধার (গ) ও ঋষভ (রে) স্বর বোঝানো হয়। এছাড়াও ঋগ্বেদ ও সামবেদের মন্ত্রের উচ্চারণেও পূর্ণ ভিন্নতা আছে। ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রুতগতিতে পাঠ করা হয়, অথচ সামবেদের মন্ত্র ধীরগতিতে পাঠ করা হয়।

(৬) ঋগ্বেদে স্বয়ং সামবেদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত শব্দ ৩৭ বার এসেছে। যেমন– 'সাম' শব্দটি ১৩ বার, 'সামান্যঃ সামভিঃ' ও 'সামানি' শব্দগুলো ৪ বার, 'সামন্' শব্দটি ৩ বার, 'সাম্নে' শব্দটি ২ বার এবং 'সামগা ইব', 'সামগাম্', 'সাম্নাম্', 'সামনৌ', 'সাম্নঃ', 'সাম্না' প্রভৃতি শব্দগুলো ১ বার করে ঋগ্বেদে উল্লেখিত হয়েছে। এই 'সাম' (ঋ০ ১।৬২।২, ২।৪৩।২), 'সামগাঃ' (ঋ০ ২।৪৩।১২), 'সামভিঃ' (ঋ০ ১।১০৭।২), 'সামানি' (ঋ০ ৫।৪৪।১৪, ১৫), 'সাম্নঃ' (ঋ০ ২।২৩।১৬), 'সাম্না' (ঋ০ ৮।৯৫।৭), 'সাম্নে' (ঋ০ ৮।৪।১৭) শব্দগুলো ঋগ্বেদের এসব সন্দর্ভে উল্লেখ থাকায় এটি সিদ্ধ হয় যে সামবেদ ঋগ্বেদ থেকে অর্বাচীন ও ঋগ্বেদ থেকে সংকলিত নয় বরং সামবেদ একটি মৌলিক বেদ।

(৭) ঋগ্বেদের "ঋচাং ত্বঃ" (ঋ০ ১০।৭১।১১) মন্ত্রে শক্করী ছন্দে গানের বর্ণনা আছে, যা মূলত সামবেদের ঋত্বিক 'উদ্গাথা' এর কর্মকাণ্ডকে নির্দেশ করে। এছাড়া বৃহৎ সাম, রথন্তর সাম ইত্যাদির উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। ফলে ঋগ্বেদের মাধ্যমে সামবেদের মৌলিক সত্তা জ্ঞাত হওয়া যায়।

(৮) স্বয়ং ঋগ্বেদে "তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ....ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে" (ঋ০ ১০।৯০।৯) মন্ত্রে পরমাত্মা হতে একসাথে ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব–এই চার বেদের উৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে স্বতঃপ্রমাণ বেদ বচনের মাধ্যমেই সামবেদের মৌলিকত্ব ও পৃথকত্ব প্রমাণ হয়।

(৯) মধ্যকালীন সায়ণ, উব্বট প্রমুখ বেদভাষ্যকারগণ সামবেদের স্বতন্ত্র সত্তা মানতেন। যেমন– সায়ণাচার্য ঋগ্বেদের পর সামবেদের উপর ভাষ্য লিখেছিলেন।

(১০) যে ৭৫টি মন্ত্রকে বিপক্ষগণ সামবেদের মৌলিক মন্ত্র দাবি করেন, সেগুলোই যদি শুধুমাত্র সামবেদের মৌলিক মন্ত্র হত তবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য কিংবা পুঁথিতে কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই এগুলোকে সামবেদের মৌলিক মন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা থাকত। অথবা শুধুমাত্র এই ৭৫টি মন্ত্রের সমন্বয়ে সামবেদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যেত। কিন্তু তা পাওয়া না যাওয়ায় সিদ্ধ হয় শুধু এই ৭৫টি নয়, বরং সামবেদের পুরো ১৮৭৫টি মন্ত্রই মৌলিক মন্ত্র। এজন্য রাণায়নী বা কৌথুমীয় কোনো শাখাতেই এই মন্ত্র সংখ্যার কোনো ভেদ নেই।

(১১) সামবেদের মধ্যে ঋগ্বেদ থেকে মৌলিক পার্থক্য আছে। দুইয়ের বিভাজন পদ্ধতি আলাদা। ঋগ্বেদ মণ্ডল, সূক্ত ও ঋকে বিভক্ত। অপরদিক্র সামবেদে কাণ্ড, অধ্যায়, দশাতি ইত্যাদিতে বিভক্ত। দুইয়ের বিষয়বস্তু আলাদা । দুইয়ের কার্য আলাদা। ঋগ্বেদ পরমাত্মা স্তুতি, জাগতিক ও পারমার্থিক জ্ঞান ও সামবেদ সেই পরমাত্মারই সঙ্গীতময় উপাসনা তথা মোক্ষ লাভের পথ নির্দেশক। উক্ত বিবরণ হতে জানা যায়, সামবেদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে । এটি ঋগ্বেদের উপর আশ্রিত নয়, বরং স্বতন্ত্র ।

সামবেদ কি পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট?

পূর্বের অনুচ্ছেদে আমরা দেখলাম, সামবেদ একটি মৌলিক বেদ এবং বেদের প্রতিটি মন্ত্রই মৌলিক। কোনো বেদের কোনো মন্ত্র অপর বেদ থেকে সংগৃহীত বা পুনরুক্তি হয়নি। কিন্তু দেখা যায়, সামবেদে কিছু মন্ত্র রয়েছে যেগুলো হুবহু অন্য বেদেও পাওয়া যায়। এ থেকে মনে শঙ্কা আসতে পারে সামবেদ কি পুনরুক্ত দোষে দুষ্ট ? এই শঙ্কার সমাধান করার জন্য আমাদের প্রথমে পুনরুক্তের পরিভাষা জানতে হবে। পুনরুক্তের পরিভাষা নির্দেশ করার সময় ন্যায়দর্শন ২।১।৬১ সূত্রের ভাষ্যে ঋষি বাৎস্যায়ন বলেছেন– "অনর্থকোঽভ্যাসঃ পুনরুক্তম্" অর্থাৎ অনর্থক অভ্যাসকে পুনরুক্ত বলা হয়। "শব্দার্থয়োঃ পুনর্বচনং পুনরুক্তমন্যত্রানুবাদাৎ।" (ন্যা০ দ০ ৫।২।১৪) অর্থাৎ অনুবাদ ব্যতীত শব্দ ও অর্থের পুনর্বচন হল পুনরুক্ত।

বেদ পরমেশ্বর প্রদত্ত। বেদমন্ত্র মাত্রই সার্থক। তাই বেদে পুনরাবৃত্ত মন্ত্র বা মন্ত্র চরণ আদিকে পুনরুক্ত বলা হয় না। বরং এগুলোকে অনুবাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কেননা–

"অনুবাদোপপত্তেঃ চ।" (ন্যা০ দ০ ২।১।৬১) অর্থাৎ সার্থক আবৃত্তি হলো অনুবাদ। ঋষি বাৎস্যায়ন এই সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন–'অর্থবানভ্যাসোঽনুবাদঃ' অর্থাৎ অর্থবান অভ্যাসকে অনুবাদ বলা হয়। অনুবাদ কিসের হয় তা নির্ণয়ে ঋষি গৌতম বলেছেন– "বিধিবিহিতস্য অনুবচনং অনুবাদঃ।" (ন্যা০ দ০ ২।১।৬৬) অর্থাৎ কর্মের বিধির যে বিধান করা হয়েছে তার যে অনুবচন = পরবর্তী বচন তাকে অনুবাদ বলা হয়।

এই অনুবচন ও অনুবাদ দুই প্রকারের। এই বিষয়ে ন্যায়দর্শন ২।১।৬৮ ভাষ্যে ঋষি বাৎস্যায়ন বলেছেন– "বিধ্যনুবচনং চানুবাদো বিহিতানুবচনং চ" অর্থাৎ অনুবাদ মূলত বিধি অনুবচন (শব্দানুবাদ) ও বিহিত অনুবচন (অর্থানুবাদ) এই দুই প্রকার।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, এই অনুবাদের প্রয়োজন কি? অনুবাদের প্রয়োজন স্পষ্ট করার জন্য ঋষি গৌতম বলেছেন– "শীঘ্রতরগমনোপদেশবতভ্যাসাত্ন অবিশেষঃ।" (ন্যা০ দ০ ২।১।৬৮) অর্থাৎ অতি শীঘ্র গমনের উপদেশের ন্যায় আবৃত্তি হওয়াতে অনুবাদে ও পুনরুক্তে ভেদ রয়েছে। "অনুবাদেত্ব পুনরুক্তমর্থবিশেষোপপত্তেঃ।" (ন্যা০ দ০ ৫।২।১৫) অর্থাৎ অনুবাদে নিশ্চিত রূপে বিশেষ অর্থ পাওয়া যাওয়াতে তা পুনরুক্ত হয় না।

সহজভাবে বললে, বারংবার আবৃত্তিতে যদি কোনো অর্থ পাওয়া না যায় তবে তাকে পুনরুক্ত বলে। আর যদি অর্থ পাওয়া যায় তবে সেটিকে অনুবাদ বলা হয়। বেদের প্রতিটি মন্ত্র সার্থক। ফলে একই মন্ত্রের কয়েকবার আবৃত্তি হলেও সেটিকে পুনরুক্ত নয়, বরং অনুবাদ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এই অনুবাদের মাধ্যমে মূলত কর্মের বিধির বিধান প্রদান করা হয়। পূর্বের অনুরূপ মন্ত্রে যে বিধি প্রদান করা হয়নি তা এই মন্ত্রের আবৃত্তিতে প্রদান করায় এই অনুবাদ সার্থক। আর মূল কথা হলো অনুবাদে বিশেষ অর্থ পাওয়া যায়। যার ফলে বেদার্থের পরিধি বৃদ্ধি পায় ও বেদজ্ঞান বিস্তৃত হয়।

এক্ষেত্রে যজুর্বেদের একটি মন্ত্রের মাধ্যমে উদাহরণ দিয়ে বিষয়ে সহজে বোঝানো যাবে।

উরু বিষ্ণো বি ক্রমস্বোরু ক্ষয়ায় নস্কৃধি ।

ঘৃতং ঘৃতয়োনে পিব প্রপ্র য়জ্ঞপতিং তির স্বাহা ॥

এই মন্ত্রটি যজুর্বেদের ৫ম অধ্যায়ের ৩৮ ও ৪১ সংখ্যক মন্ত্র। এখানে যজু ৫।৩৮ মন্ত্রটির তাৎপর্য হলো– ব্যাপক পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে, তিনি সর্বব্যাপক হয়ে যেন আমাদের নিবাসের জন্য সামর্থ্য দান করেন ও শিক্ষিত বিদ্বানগণ যেন নিজেকে বারংবার প্রদীপ্ত করেন। যেভাবে ঋত্বিক যজমানের দুঃখ দূর করেন, সেভাবেই স্বাহা শব্দ কথনের মাধ্যমে অধ্যাত্ম আদি ত্রিবিধ যজ্ঞকে পূর্ণ করেন।

আবার এই মন্ত্রটিকেই যজু ৫।৪১ মন্ত্রে আবৃত্তি করে যজ্ঞীয় কর্মে সংলগ্ন হওয়ার জন্য প্রেরিত করা হয়েছে। যেভাবে লোকসমাজে প্রেরণা দানের জন্য 'পচতু পচতু ভবান্' = পক্ক করো পক্ক করো - এই অনুবাদ=অভ্যাসপূর্বক প্রেরণা দেওয়া হয়। এই অনুবাদ প্রেরণার ৩ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে -

ক্ষিপ্রং পচ্যতাম্ = শীঘ্র পক্ক করো

অঙ্গ পচ্যতাম্ = প্রিয় পক্ক করো

পচ্যতামেব = অবশ্যই পক্ক করো

এর সাথে তুলনা করে আমরা প্রথমবার মন্ত্রের মধ্যে অনুবাদের ৩টি প্রয়োজন পেয়ে থাকি -

১. কর্মে শীঘ্রতা

২. কর্মের প্রক্রিয়ায় সংলগ্নতা

৩. কর্মের অনিবার্যতা

একেই যজু০ ৫।৪১ এ আবার পুনরাবৃত্তি করে নিম্নলিখিত প্রয়োজন সাধিত হয়েছে -

১. শিক্ষায় শীঘ্রতা

২. পরোপকার ক্রিয়ায় সংলগ্নতা

৩. যজ্ঞীয় কর্মসমূহের অনিবার্যতা

তাই, সামবেদ তথা সম্পূর্ণ বেদ পুনরুক্তি দোষ মুক্ত।

বেদ কি সব বিদ্যার উৎস স্বরূপ ?

বেদ হলো সকল জ্ঞান ও বিদ্যার উৎস। এজন্য ঋষি মনু বলেছেন– 'সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ' (মনু০ ২।৭) অর্থাৎ বেদ সর্বজ্ঞানময়। কিন্তু মধ্যযুগের সায়ণ, উব্বটাদি বেদভাষ্যকারগণ তাঁদের নিজেদের সীমাবদ্ধতার জন্য বেদের যাজ্ঞিক অর্থ ব্যতীত অন্যাদি অর্থ করতে প্রায়শই অসমর্থ ছিলেন। সায়ণাচার্য ক্ষেত্র বিশেষে আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থ করলেও তা সম্পূর্ণ বৈদিক বাঙ্ময়ে অত্যন্ত নগণ্য। তার উপর সায়ণাচার্যের ভাষ্যও অরূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগের অন্ধানুকরণ এবং উদ্ভট ঐতিহাসিক কাহিনীতে পরিপূর্ণ, যার অধিকাংশই কিনা ভিত্তিহীন ও মূল বেদার্থ বিরুদ্ধ।

সায়ণাদি মধ্যযুগের বিদ্বানদের এই একপাক্ষিক বেদার্থের ফলে বর্তমান জনমানসে এমন একটি সংস্কার বদ্ধমূল হয়েছে যে, তাদের কাছে বেদ শুধুই যাজ্ঞিক ক্রিয়াকাণ্ডের পুস্তক। কিন্তু আমরা যদি আমাদের প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থসমূহে অধ্যয়ন করি তবে সেখানে বেদে সর্বপ্রকার বিদ্যা নিহিত থাকার বিষয়ে মান্যতা স্পষ্টত দেখতে পারবো। যেমন–

১. বেদে ব্রহ্মজ্ঞান–

বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো য়ত্র তত্রাশ্রমে বসন্।

ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।

(মনুস্মৃতি ১২।১০২)

বেদশাস্ত্রের জ্ঞাতা বিদ্বান যে কোন আশ্রমের মধ্যে অবস্থান করে এই বর্তমান জন্মের মধ্যেই ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য অধিকাধিক সমর্থ হন।

২. বেদে বর্ণ, আশ্রম, লোক, কাল প্রভৃতির জ্ঞান–

চাতুর্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক।

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যং চ সর্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি।।

(মনুস্মৃতি ১২।৯৭)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণ এবং এদের ব্যবস্থা, পৃথিবী, আকাশ এবং দ্যুলোক অর্থাৎ সমস্ত ভূমণ্ডল, গ্রহাদি, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের পৃথক পৃথক বিধান এবং ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান এবং কালের বিদ্যা– এই সব বেদ দ্বারা প্রসিদ্ধ, প্রকাশিত এবং জ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ এই সব ব্যবস্থা এবং বিদ্যার জ্ঞান বেদ দ্বারাই হয়।

৩. বেদে পঞ্চভূত আদি সূক্ষ্ম শক্তির জ্ঞান–

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপং চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।

বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতিগুণকর্মতঃ।।

(মনুস্মৃতি ১২।৯৮)

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং পঞ্চম গন্ধ, এদের উৎপত্তি, গুণ এবং কর্মের জ্ঞানরূপ বেদ দ্বারা প্রসিদ্ধ তথা বিজ্ঞাত হয়। অর্থাৎ এই তত্ত্বশক্তিসমূহের উৎপত্তি জ্ঞান, এদের গুণের জ্ঞান, এদের উপযোগিতার জ্ঞান এবং উৎপন্ন সমস্ত জড় চেতন সংসারের জ্ঞান বিজ্ঞান বেদ দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

৪. বেদে সর্বপ্রাণীর সুখ প্রাপ্তির জ্ঞান–

বিভর্তি সর্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।

তস্মাদেতৎ পরং মন্যে য়জ্জন্তোরস্য সাধনম্।।

(মনুস্মৃতি ১২।৯৯)

এই যে সনাতন বেদশাস্ত্র রয়েছে, তা সর্ব বিদ্যার দান দ্বারা সম্পূর্ণ প্রাণীদের ধারণ এবং সর্ব সুখ প্রাপ্ত করায়। এই কারণে [মনু আদি] আমরা সবাই তাকে উত্তমরূপে মান্য করি এবং এভাবে মান্য করাই উচিত। কেননা এটিই সকল জীবের সুখের সাধন।

৫. বেদে দণ্ডনীতি, ন্যায়বিদ্যা ও আত্মবিদ্যার জ্ঞান–

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাৎ দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্ ।

আন্বীক্ষিকীং চ আত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ ।।

(মনুস্মৃতি ৭।৪৩)

একজন ব্যক্তি তখনই রাজা ও রাজসভার সভাসদ হতে পারবেন, যখন তিনি চতুর্বেদে বর্ণিত কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞানরূপ বিদ্যার জ্ঞাতা অর্থাৎ, বেদজ্ঞ বিদ্বানের নিকট ত্রয়ীবিদ্যা, সনাতন দণ্ডনীতি, ন্যায়বিদ্যা, আত্মবিদ্যা অর্থাৎ পরমাত্মার গুণ-কর্ম-স্বভাবকে যথার্থরূপে জেনে ব্রহ্মবিদ্যা এবং মানুষের সাথে বার্তারম্ভ (প্রশ্নোত্তর করা) শিখতে পারবেন।

৬. বেদে রাজ্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান–

সৈনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বং এব চ ।

সর্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি।।

(মনুস্মৃতি ১২।১০০)

সকল সেনা ও সেনাপতির উপর আধিপত্য, রাজ্যাধিকার, দণ্ডবিধি সংক্রান্ত সকল কার্যের আধিপত্য এবং সর্বোপরি বর্তমান সর্বাধীশ রাজ্যাধিকার— এই চতুর্বিধ অধিকারে বেদশাস্ত্রজ্ঞ, পূর্ণবিদ্যাযুক্ত, ধর্মাত্মা, জিতেন্দ্রিয় এবং সুশীল ব্যক্তিদিগের নিযুক্ত করা কর্তব্য।

৭. বেদে ধর্ম, অভ্যুত্থান, নিঃশ্রেয়স ও পদার্থ জ্ঞান–

অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। য়তোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ। তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্। ধর্মবিশেষ প্রসূতাৎ দ্রব্যগুণকর্মসামান্য বিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।

(বৈশেষিক দর্শন ১।১।১–৪)

এখন এই কারণে ধর্ম ব্যাখ্যা করবো। যার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়, সেটি ধর্ম। তার বচন দ্বারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত। ধর্ম বিশেষ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় নামক পদার্থসমূহের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের সাথে অথবা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়সের প্রাপ্তি হয়।

৮. বেদে পদার্থবিদ্যার প্রামাণ্য জ্ঞান–

বেদলিঙ্গাচ্চ। বৈদিকং চ।

(বৈশেষিক দর্শন ৪।২।১১, ৫।২।১০)

[পদার্থ বিদ্যার জ্ঞান সম্পর্কে] বেদে প্রমাণ রয়েছে এবং তা বেদোক্ত।

৯। বেদে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান–

মন্ত্রায়ুর্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ।

(ন্যায় দর্শন ২।১।৬৭)

মন্ত্র ও মন্ত্রোক্ত আয়ুর্বেদ প্রামাণ্য, তা শব্দের প্রামাণ্য আপ্ত প্রমাণ হওয়ায়।

উপরের সন্দর্ভগুলো হতে দেখা যায়, এভাবে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রই বেদের সর্বজ্ঞানময় প্রকাশকে দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, নীতি, নৈতিকতা, আচরণ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র, পদার্থ, রসায়ণ আদি ভৌত বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা, শিল্প, রাজনীতি, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সমরশাস্ত্র, নাট্য-সংগীত কলা, কর্ম, জ্ঞান, উপাসনা বিবিধ বিষয়ের প্রতিপাদন বেদে করা হয়েছে।

এক মন্ত্রের একাধিক অর্থ কিভাবে সম্ভব ?

পূর্বের অনুচ্ছেদে আমরা দেখলাম, বেদমন্ত্র হলো সমস্ত বিদ্যা ও জ্ঞানের আকর। বেদের মাধ্যমেই সকল বিদ্যা ও জ্ঞান লাভ করা যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১০।১১।৩) বলা হয়েছে– "অনন্তা বৈ বেদাঃ" অর্থাৎ বেদজ্ঞান হলো অনন্ত। কিন্তু প্রশ্ন আসে, চতুর্বেদে সর্বমোট মাত্র ২০৩৭৯টি মন্ত্র রয়েছে। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক মন্ত্রের মাধ্যমে অনন্ত জ্ঞান প্রদান করা কিভাবে সম্ভব? এর উত্তর হলো, একই মন্ত্রের একাধিক অর্থের মাধ্যমে অনন্ত বেদজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব।

বেদে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দই সার্থক এবং প্রতিটি শব্দের ভেতরেই জ্ঞানরাশি লুকিয়ে থাকে। বেদাঙ্গাদির জ্ঞানের সাহায্যে বেদের এই রহস্যময় অনন্তজ্ঞান উন্মোচিত করতে হয়। আমাদের বেদ অনুবাদে এজন্য নিঘণ্টু, নিরুক্ত ও অষ্টাধ্যায়ী প্রভৃতি বেদাঙ্গ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের সাহায্য নিয়ে আর্ষ পদ্ধতিতে প্রত্যেক বেদ মন্ত্রের জ্ঞান যথাসম্ভব

প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এজন্য অধিকাংশ মন্ত্রে প্রয়োজন বোধে একাধিক পক্ষ যোগ করা হয়েছে। এই সমস্ত জ্ঞানময় শব্দের অর্থকে আমরা মূলত তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। সেই অনুসারে বেদের প্রধানত ত্রিবিধ প্রকার ভাষ্য দৃষ্ট হয়। এই ত্রিবিধ ভাষ্যের বিষয়ে শাস্ত্রে (মনু০ ৬।৮৩) বলা হয়েছে–

অধিয়জ্ঞং ব্রহ্ম জপেদাধিদৈবিকং এব চ।

আধ্যাত্মিকং চ সততং বেদান্তাভিহিতং চ য়ৎ।।

এই আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকের আবার ৫টি অধিকরণ রয়েছে–

অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামঃ। পঞ্চস্বধিকরণেষু। অধিলোকমধিজ্যৌতিষমধিবিদ্যমধিপ্রজমধ্যাত্মম্।

(তৈ০ উপ০ ১।৩।১)

অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ অর্থের পাশাপাশি অধিলোক, অধিজ্যোতিষ বা অধিবিদ্যা আদি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চ অধিকরণ ত্রিবিধ ভাষ্যেরই অন্তর্গত বিস্তৃত রূপ। স্বাধ্যায়ীগণ সামবেদ অনুশীলনের সময় উক্ত অর্থসমূহ সম্পর্কে যথাস্থানে অবগত হবেন।

সার্বিকভাবে আমরা যদি সহজে একটি মন্ত্রের কোন শব্দ বা পদের কি কি অর্থ ত্রিবিধভাবে মুখ্যত হতে পারে তা দেখে নেই–

পক্ষ/শব্দ	আধিভৌতিক	আধিদৈবিক	আধ্যাত্মিক
ইন্দ্র	ঐশ্বর্যবান রাজা, বিদ্বান ইত্যাদি	সূর্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি	ঐশ্বর্যবান পরমেশ্বর, জীবাত্মা
বিষ্ণু	যজ্ঞ	সূর্য	সর্বব্যাপক পরমেশ্বর
অগ্নি	তেজস্বী রাজা, জ্ঞানপ্রকাশযুক্ত বিদ্বান ইত্যাদি	ভৌতিক অগ্নি, শিল্পাগ্নি, সূর্যাগ্নি, বিদ্যুৎরূপ অগ্নি ইত্যাদি	অগ্রণী, অগ্রনায়ক, জ্ঞানস্বরূপ, তমোগুণ বা প্রবৃত্তি বিনাশক পরমেশ্বর

অগ্নিবীর দ্বারা প্রস্তুত সামবেদ ও অন্যাদি বেদভাষ্যানুবাদের পদার্থে এই অর্থসমূহের পক্ষে সর্বপ্রকার প্রমাণ উদ্ধৃত করা হয়েছে। পাঠকগণ উক্ত মন্ত্রে প্রমাণসমূহ দেখতে পাবেন। তাই অর্থসমূহ যে শাস্ত্রসম্মত তা প্রমাণিত।

অতঃপর, সামবেদের পাঠ করে শব্দব্রহ্ম বেদরূপ গাভী হতে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ দুগ্ধ পান করে তা জীবনযজ্ঞে প্রয়োগ করে স্বাধ্যায়ী ভক্ত পাঠকগণ মোক্ষাশ্বৈর্য প্রাপ্তির দিকে ধাবিত হবেন এমন নিবেদনই করি পরমাত্মার কাছে।

বেদ মন্ত্রে ঈশ্বর উপাসনার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

সত্যভাব দ্বারা বেদবাণীর মাধ্যমে পরমাত্মার স্তুতি

॥ ঋষিঃ ভরদ্বাজ ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড়্জ ॥

ঐহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।

এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥

এহ্যূ ষু ব্রবাণি তেঽগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ।

এভির্বর্ধাস ইন্দুভিঃ ॥[১]

সামবেদ ৭

পদার্থঃ হে **(অগ্নে)** পরমাত্মা ! তুমি **(আ ইহি উ)** আমার হৃদয়-প্রদেশে এসো **['ইকঃ সুঞি' অষ্টা০ ৬।৩।১৩৪]**। আমি **(তে)** তোমার জন্য **(ইত্থা)** সত্য ভাব দ্বারা **['ইত্থেতি সত্যনাম' নিঘ০ ৩।১০] (ইতরাঃ**[২]**)** সামান্য-বিলক্ষণ[৩] **(গিরঃ)** বেদবাণীর মাধ্যমে **(সু)** উত্তম প্রকারে পূর্ণ মনযোগের সাথে **['সুঞঃ' অষ্টা০ ৮।৩।১০৭] (ব্রবাণি)** বলছি অর্থাৎ তোমার স্তুতি করছি। তুমি **(এভিঃ)** আমার দ্বারা সমর্পিত এই **(ইন্দুভিঃ)** ভাবপূর্ণ ভক্তিরস-রূপ সোমরসের মাধ্যমে **['সোমো বা ইন্দুঃ' শত০ ২।২।৩।২৩] (বর্ধাসে)** হৃদয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও **['লেটোঽডাটৌ' অষ্টা০ ৩।৪।৯৪]** ॥৭॥

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! তুমি আমার হৃদয় প্রদেশে এসো। আমি তোমার জন্য সত্য ভাব দ্বারা সামান্য-বিলক্ষণ অর্থাৎ অসাধারণ বেদবাণীর মাধ্যমে উত্তম প্রকারে পূর্ণ মনযোগের সাথে বলছি অর্থাৎ তোমার স্তুতি করছি। তুমি আমার দ্বারা সমর্পিত এই ভাবপূর্ণ ভক্তিরস-রূপ সোমরসের মাধ্যমে আমার হৃদয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও ॥৭॥

এই মন্ত্রে ইন্দু শব্দের অর্থ চন্দ্র[৪] বাচকও হয়। চাঁদের আকর্ষণের প্রভাবে জলাশয় স্ফীত হয় অর্থাৎ জোয়ার ভাটা হয় এবং চন্দ্রের আলোর প্রভাবে বনস্পতি পুষ্ট হয়। তাই এখানে ইন্দু উপমা হিসেবে তা ব্যবহৃত হচ্ছে ॥৭॥

ভাবার্থঃ মানব সৃষ্ট বাণীসমূহ সামান্য হয়ে থাকে কিন্তু বেদ বাণীসমূহ পরমেশ্বরকৃত হওয়ার কারণে তা অসাধারণ হয়। বেদবাণীর প্রত্যেক পদ বিবিধ অর্থের প্রকাশক। উপাসকেরা যদি সেই বেদ বাণী দ্বারা পরমাত্মার স্তুতি করে এবং তাঁর প্রতি নিজের ভক্তিরস-রূপ সোমরস প্রবাহিত করে; তাহলে চাঁদের প্রভাবে যেমন জলাশয়, বনস্পতি প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, তেমনি সেই ভক্তিরসে তৃপ্ত হয়ে পরমাত্মা সেই উপাসকের হৃদয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে উপাসককে কৃতার্থ করেন ॥৭॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৬।১৬।১৬। য়জু০ ২৬।১৩। সাম০ ৭০৫। দয়ানন্দর্ষিণা মন্ত্রোঽয়ম্ ঋগ্বেদভাষ্যে য়জুর্ভাষ্যে চ বিদ্বৎপক্ষে ব্যাখ্যাতঃ।

২. 'ইত্থা সত্যা ইত্যর্থঃ। ইতরা অন্যা অসত্যাঃ' ইতি বি০। 'ইত্থা ইতি নিপাতঃ অমুত্রেত্যর্থে চ বর্ততে। অত্র তু দূরস্য লক্ষণা। দূরে সন্তিতি শেষঃ। ইতরা গিরঃ শত্রূণাং সম্বন্ধিন্যঃ দুষ্কৃতা ইত্যর্থঃ। 'অসূর্য়ো হ বা ইতরা গিরঃ' (ঐত০ ব্রা০ ৩।৪৯) ইতি হ্যৈতরেয়কম্' ইতি ভ০। 'ইত্থা ইত্থম্ অনেন প্রকারেণ সুষ্ঠু ব্রবাণি ইত্যাশাস্যতে। তাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিত্যর্থঃ। উ ইত্যেতাঃ ইতরাঃ অসুরৈঃ কৃতাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিতি শেষঃ' ইতি সা০।

৩. Other; different, that is, more excellent—Griffith.

৪. ইন্দু: the moon; (avas), m. pl. the moons, i.e. the periodic changes of the moon—Monier Williams.

পরমাত্মার গুণ উল্লেখপূর্বক তাঁর স্তুতি

॥ ঋষিঃ বামদেব ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড়্জ ॥

দূ॒তং॑ বো॒ বি॒শ্ব॒বে॒দস॑ꣳ হব্য॒বা॒হ॒মম॑র্ত্যম্।

য়॑জি॒ষ্ঠ॒মৃ॒ঞ্জ॒সে গি॒রা ॥২॥

দূতং বো বিশ্ববেদসং হব্যবাহমমর্ত্যম্।

য়জিষ্ঠমৃঞ্জসে গিরা ॥২॥[১]

সামবেদ ১২

পদার্থঃ হে পরমাত্মা ! **(দূতম্)** দূত অর্থাৎ সদ্গুণসমূহ আমাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য দূতের মতো আচরণকারী, **(বিশ্ববেদসম্)** আমাদের পূর্বজন্ম তথা এই জন্মে কৃত সকল কর্মের জ্ঞাতা, **(হব্যবাহম্)** কৃতকর্মের ফলদাতা, **(অমর্ত্যম্)** অমর, **(য়জিষ্ঠম্)** সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা অর্থাৎ মহান সৃষ্টিচক্র প্রবর্তনরূপ যজ্ঞের সঞ্চালক **(বঃ)** তোমাকে[২] , **['তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' অষ্টা০ ৬।৪।১৫৪] (গিরা)** বেদবাণীর মাধ্যমে আমি **(ঋঞ্জসে)** উত্তমরূপে সাধনা[৩] করছি **['ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্মা' নিরু০ ৬।২১, 'সিব্বহুলং লেটি' অষ্টা০ ৩।১।১৪]** ॥২॥

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! দূত অর্থাৎ সদ্গুণসমূহ আমাদের কাছে নিয়ে আসার জন্য দূতের মতো আচরণকারী, আমাদের পূর্বজন্ম তথা এই জন্মে কৃত সব কর্মের জ্ঞাতা, কৃতকর্মের ফলদাতা, অমর, সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্তা অর্থাৎ মহান সৃষ্টিচক্র প্রবর্তনরূপ যজ্ঞের সঞ্চালক তোমাকে, বেদবাণীর মাধ্যমে আমি উত্তমরূপে সাধনা করছি ॥২॥

ভাবার্থঃ মানুষ শুভ অথবা অশুভ যে কর্মই করে থাকে, পরমেশ্বর তৎক্ষণাৎ তা জেনে যান এবং যথা সময়ে তার ফল অবশ্যই দিয়ে দেন। বার্ধক্য এবং মৃত্যু রহিত, সৃষ্টি-রূপ যজ্ঞের পরম যাজ্ঞিক পরমেশ্বরকে আমাদের শ্রদ্ধার সাথে বেদমন্ত্রের উচ্চারণপূর্বক সর্বদা সাধনা করা উচিত ॥২॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৪।৮।১। ঋগ্বেদভাষ্যে দয়ানন্দর্ষির্মন্ত্রমিমং বিদ্যুদগ্নিবিষয়ে ব্যাখ্যাতবান্।

২. ছন্দস্যেকবচনেঽপি য়ুষ্মদো বসাদেশো দৃশ্যতে।

৩. Peterson suggests-rt. ঋঞ্জ् means (1) when *Instrans.*-to shine, to beam, to be beautified; (2) when *trans.*-to make bright, to decorate, to honour, to show respect, to pay homage to, here, in the above verse, we are concerned with this latter sense. 'I seek'-Griffith.

চারবেদ দিয়ে উপাসনা ও জীবন নির্বাহ

॥ ঋষিঃ ভর্গঃ ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ বৃহতী ॥ স্বরঃ মধ্যমঃ ॥

পাঁহিঁ নোঁ অগ্নঁ একঁয়া পাঁহ্যূঁ৩তঁ দ্বিঁতীঁয়য়া।

পাঁহিঁ গীঁভিঁস্তিঁসৃঁভিঁরূর্জাঁ পতে পাঁহিঁ চঁতঁসৃঁভির্বসো ॥২॥

পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যূ৩ত দ্বিতীয়য়া।

পাহি গীর্ভিস্তিসৃভিরূর্জাং পতে পাহি চতসৃভির্বসো ॥২॥[১]

সামবেদ ৩৬

পদার্থঃ প্রথম— পরমাত্মা পক্ষে।

হে **(ঊর্জাং পতে)** অন্ন, রস, **['ঊর্জম্ অন্নং রসং চ' নিরু০ ৯।৪১]** বল এবং প্রাণের অধিপতি, **(বসো)** সর্বত্র অবস্থানকারী, সকলের অন্তর্যামী তথা সকলকে নিবাস প্রদানকারী **(অগ্নে)** পরমাত্মা ! তুমি **(নঃ)** আমাদের **(একয়া)** ঋগ্বেদরূপ এক বাণী দ্বারা **(রক্ষ)** রক্ষা করো **(উত)** এবং **(দ্বিতীয়য়া)** দ্বিতীয় যজুর্বেদরূপ বাণী দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করো, **(তিসৃভিঃ)** সামবেদরূপ তৃতীয় **(গীর্ভিঃ)** বাণী দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করো, **(চতসৃভিঃ)** অথর্ববেদরূপ চতুর্থ বাণী দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা[২] করো ॥২॥

সরলার্থঃ হে অন্ন, রস, বল এবং প্রাণের অধিপতি, সর্বত্র অবস্থানকারী, সকলের অন্তর্যামী তথা সকলকে নিবাস প্রদানকারী পরমাত্মা ! তুমি আমাদের ঋগ্বেদরূপ এক বাণী দ্বারা রক্ষা করো এবং দ্বিতীয় যজুঃরূপ বাণী দ্বারা রক্ষা করো, সামবেদরূপ তৃতীয় বাণী দ্বারা রক্ষা করো, অথর্ববেদরূপ চতুর্থ বাণী দ্বারা রক্ষা করো ॥২॥

পদার্থঃ দ্বিতীয়—বিদ্বান পক্ষে।

হে **(ঊর্জাং পতে)** বলের পালক, **(বসো)** উত্তম নিবাসদাতা, **(অগ্নে)** অগ্নির তুল্য বিদ্যা-প্রকাশ যুক্ত বিদ্বান ! আপনি **(একয়া)** এক উত্তম শিক্ষা দ্বারা **(নঃ)** আমাদের **(পাহি)** রক্ষা করুন **(উত)** এবং **(দ্বিতীয়য়া)** দ্বিতীয় অধ্যাপনা ক্রিয়া দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করুন, **(তিসৃভিঃ)** কর্ম-কাণ্ড, উপাসনা-কাণ্ড এবং জ্ঞান-কাণ্ডের উদ্ভবকারী তিন **(গীর্ভিঃ)** বাণী সমূহ দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করুন, **(চতসৃভিঃ)** ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ – এদের জ্ঞান প্রদানকারী চার প্রকারের বাণী সমূহ দ্বারা **(পাহি)** রক্ষা করুন ॥২॥[৩]

সরলার্থঃ হে বলের পালক, উত্তম নিবাসদাতা, অগ্নির তুল্য বিদ্যা-প্রকাশ যুক্ত বিদ্বান ! আপনি এক উত্তম শিক্ষা দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন এবং দ্বিতীয় অধ্যাপনা ক্রিয়া দ্বারা রক্ষা করুন, কর্ম-কাণ্ড, উপাসনা-কাণ্ড এবং জ্ঞান-কাণ্ডের উদ্ভবকারী তিন বাণী সমূহ দ্বারা রক্ষা করুন, ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ – এদের জ্ঞান প্রদানকারী চার প্রকারের বাণী সমূহ দ্বারা রক্ষা করুন ॥২॥[৪]

এখানে চার বার 'পাহি' এর প্রয়োগের মাধ্যমে পরমেশ্বর কর্তৃক প্রাপ্ত রক্ষার নিরন্তরতা সূচিত হয় ॥২॥

ভাবার্থঃ চার বেদের বাণী সমূহ পরমেশ্বর আমাদের উপকারের জন্য প্রদান করেছেন। যদি আমরা বেদবর্ণিত জ্ঞান, কর্ম, উপাসনা এবং বিজ্ঞান বিষয়কে অধ্যয়ন করে কর্তব্য কর্মের আচরণ করি, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবো। বিদ্বানগণের উচিত তাঁরা যেন বেদ অধ্যয়ন করে বেদবিহিত ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের উপদেশ দিয়ে আমাদের রক্ষা করেন ॥২॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৮।৬০।৯, য়জু০ ২৭।৪৩, সাম০ ১৫৪৪।

২. 'গিরা একয়া ঋগ্লক্ষণয়া। দ্বিতীয়য়া গিরা য়জুর্লক্ষণয়া। তিসৃভির্গীর্ভিঃ ঋগ্যজুঃসামলক্ষণাভিঃ। চতসৃভিঃ ঋগ্যজুঃসামনিগদ- লক্ষণাভিঃ'—ইতি বি০।

৩. অয়ং বিদ্বৎপরোঽর্থঃ য়জু০ ২৭।৪৩ ইত্যস্য দয়ানন্দভাষ্যমনুসরতি।

৪. দয়ানন্দর্ষিণা মন্ত্রোঽয়ম্ য়জুর্ভাষ্যে ২৭।৪৩ বিদ্বৎপক্ষে ব্যাখ্যাতঃ।

বেদমন্ত্রে মানব কর্তৃক পরমাত্মার স্তুতি করার কারণ

॥ ঋষিঃ সুদীতিপুরূমীঢ়ৌ ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ বৃহতী ॥ স্বরঃ মধ্যম ॥

অঁগ্নিঁমীঁডিঁষ্বাঁবঁসেঁ গাঁথাঁভিঃ শীঁরঁশোঁচিষম্।

অঁগ্নিঁꣳ রাঁয়েঁ পুঁরুমীঢ শ্রুঁতঁং নরোঁঽগ্নিঃ সুঁদীঁতঁয়েঁ ছঁর্দিঃঁ ॥৫॥

অগ্নিমীডিষ্বাবসে গাথাভিঃ শীরশোচিষম্।

অগ্নিং রায়ে পুরুমীঢ শ্রুতং নরোঽগ্নিঃ সুদীতয়ে ছর্দিঃ ॥৫॥[১]

সামবেদ ৪৯

পদার্থঃ হে **(পুরুমীঢ)** বিবিধ গুণে সিক্ত স্তোতা[২] **['পুরু বহুনাম' নিঘ০ ৩।১]** ! তুমি **(অবসে)** রক্ষণ, প্রগতি, সর্বজনপ্রীতি এবং তৃপ্তিলাভের জন্য **(শীরশোচিষম্[৩])** সর্বত্র ব্যাপক জ্যোর্তিময় **['শীরম্ অনুশায়িনমিতি বাঽঽশিনমিতি বা' নিরু০ ৪।১৪, 'স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চি০' উণা০ ২।১৩] (অগ্নিম্)** তেজস্বী পরমাত্মাকে **(গাথাভিঃ)** মন্ত্রবাণী দ্বারা **['গাথা বাঙ্নাম' নিঘ০ ১।১১] (ঈডিষ্ব)** স্তুতি এবং আরাধনা করো। **(শ্রুতম্)** মহিমা বর্ণনকারী বেদাদি শাস্ত্র থেকে শ্রুত **(অগ্নিম্)** সেই পরমাত্মাকে তুমি **(রায়ে)** ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক সকল প্রকারের ধন প্রাপ্তির জন্য **(ঈডিষ্ব)** স্তুতি এবং আরাধনা করো। হে **(নরঃ)** মানুষ ! **(অগ্নিঃ)** জগতের অগ্রনায়ক পরমাত্মা **(সুদীতয়ে[৪])** উত্তম কর্মকারী পুরুষার্থী জনের জন্য **['দীয়তিঃ গতিকর্মা' নিঘ০ ২।১৪, 'নঞসুভ্যাম্' অষ্টা০ ৬।৩।১৭২] (ছর্দিঃ)** আশ্রয়স্বরূপ হয়ে থাকেন **['ছর্দিঃ গৃহনাম' নিঘ০ ৩।৪]** ॥৫॥

সরলার্থঃ হে বিবিধ গুণে সিক্ত স্তোতা ! তুমি রক্ষা, প্রগতি, সর্বজনপ্রীতি এবং তৃপ্তিলাভের জন্য সর্বত্র ব্যাপক জ্যোর্তিময় তেজস্বী পরমাত্মাকে মন্ত্রবাণী দ্বারা স্তুতি এবং আরাধনা করো। মহিমা বর্ণনকারী বেদাদি শাস্ত্র থেকে

শ্রুত সেই পরমাত্মাকে তুমি ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক, সকল প্রকারের ধন প্রাপ্তির জন্য স্তুতি এবং আরাধনা করো। হে মানুষ ! জগতের অগ্রনায়ক পরমাত্মা উত্তম কর্মকারী পুরুষার্থী জনের জন্য আশ্রয়স্বরূপ হয়ে থাকেন ॥৫॥

ভাবার্থঃ ধন প্রভৃতি সমস্ত কল্যাণের অভিলাষী মানবজাতির উচিত পুরুষার্থী হয়ে সর্বত্র ব্যাপ্ত তেজোময় পরমগুরু পরমাত্মার স্তুতি করা ॥৫॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৮।৭১।১৪, অথর্ব০ ২০।১০৩।১। উভয়ত্র 'নরোঽগ্নিং' ইতি পাঠঃ।

২. এষ পদার্থঃ ঋক০ ১।১৫১।২ ইত্যস্য দয়ানন্দভাষ্যাদ্ গৃহীতঃ।

৩. শীরং ব্যাপি শোচির্দীপ্তিঃ। ব্যাপিনী দীপ্তির্যস্যাসৌ শীরশোচিঃ, তং শীরশোচিষম্, ব্যাপিদীপ্তিমিত্যর্থঃ। অথবা জঠরাত্মনা আশ্রয়ণীয়া দীপ্তির্যস্য—ইতি বি০। শ্রয়তেঃ শীরম্, শোচিঃ দীপ্তিঃ। প্রবৃদ্ধ- শোচিষম্—ইতি ভ০। শয়নস্বভাবরোচিষম্—ইতি সা০।

৪. সুদীতয়ে শোভনস্য দানস্যার্থায়—ইতি বি০। এতন্মতে কেবলং পুরুমীঢস্যার্ষং, ন সুদীতেরপি, অতস্তেন যৌগিকার্থো নিরূপিতঃ 'অন্তরাত্মনঃ প্রৈষঃ, হে মদীয় অন্তরাত্মন্ ! অগ্নিম্ ঈডিষ্ব স্তুহীত্যর্থঃ' ইতি পুরুমীঢো ব্রূতে, ইতি তদীয়ঃ আশয়ঃ। অন্যেষাং মতে সুদীতিপুরুমীঢয়োরুভয়োরার্ষম্, অতস্তৈঃ সুদীতয়ে এতৎসংজ্ঞায় ঋষয়ে ইতি ব্যাখ্যাতম্। বস্তুতস্তু মন্ত্রাগতৌ সুদীতিপুরুমীঢৌ যৌগিকার্থমেব সূচয়তঃ।

বেদমন্ত্রের মাধ্যমে পরমাত্মার কীর্তিগান

॥ ঋষিঃ ইরিম্বিঠিঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

প্র॒ স॒ম্রাজ॑ং চর্ষণী॒নামি॒ন্দ্রꣳ॑ স্তোতা॑ নব্যং॒ গী॒র্ভিঃ॒।

নর॑ং নৃষা॒হং॒ মꣳ॑হিষ্ঠম্ ॥১০॥

প্র সম্রাজং চর্ষণীনামিন্দ্রং স্তোতা নব্যং গীর্ভিঃ।

নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠম্ ॥১০॥[১]

সামবেদ ১৪৪

পদার্থঃ হে ভ্রাতাগণ ! তোমরা **(চর্ষণীনাম্)** মানবজাতির **['চর্ষণয় ইতি মনুষ্যনামসু পঠিতম্' নিঘ০ ২।৩] (সম্রাজম্)** সম্রাট, **(নব্যম্)** নবীন বা স্তবযোগ্য, **['নবসূরমর্তয়বিষ্ঠেভ্যো য়ৎ' অষ্টা০ ৫।৪।২৫, 'নব্যম্ ইতি নবনাম' নিঘ০ ৩।২৮, 'য়তোঽনাবঃ' অষ্টা০ ৬।১।২১৩] (নরম্)** পথপ্রদর্শক **(নৃষাহম্)** দুষ্টজনকে পরাজিতকারী, **['ছন্দসি সহঃ' অষ্টা০ ৩।২।৬৩] (মংহিষ্ঠম্)** অতিশয় দাতা **['মংহতে দানকর্মা' নিঘ০ ৩।২০, 'তুশ্ছন্দসি' অষ্টা০ ৫।৩।৫৯, 'তুরিষ্ঠেমেয়স্সু' অষ্টা০ ৬।৪।১৫৪] (ইন্দ্রম্)** বীর পরমাত্মার **(গীর্ভিঃ)** বেদবাণী দ্বারা **(প্র স্তোত)** প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিগান করো **['তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' অষ্টা০ ৭।১।৪৫]** ॥১০॥

সরলার্থঃ হে ভ্রাতাগণ ! তোমরা মানবজাতির সম্রাট, নবীন বা স্তবযোগ্য, পথপ্রদর্শক, দুষ্টজনকে পরাজিতকারী, অতিশয় দাতা, বীর পরমাত্মাকে বেদবাণী দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে কীর্তিগান করো ॥১০॥

এই মন্ত্রে অর্থশ্লেষ অলঙ্কার আছে ॥১০॥

ভাবার্থঃ মানবজাতির পরমাত্মার উত্তম মহতী কীর্তির গান করা এবং তাঁর গুণকে নিজের জীবনে ধারণ করা উচিত ॥১০॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৮।১৬।১, অথর্ব০ ২০।৪৪।১

বেদবাণী বিষয়ে বর্ণনা

॥ ঋষিঃ মধুচ্ছন্দাঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

পাঁবকাঁ নঁঃ সঁরঁস্বতীঁ বাঁজেঁভির্বাঁজিনীঁবতী।

য়ঁজ্ঞঁং বঁষ্টু ধিঁয়াঁবঁসুঃ ॥৫॥

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।

য়জ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ ॥৫॥[১]

সামবেদ ১৮৯

পদার্থঃ হে পরমাত্মা ! তোমার **(বাজিনীবতী[২])** ক্রিয়াময়ী অথবা কর্মের উপদেশদাতা **(সরস্বতী)** জ্ঞানময়ী বেদবাণী **(বাজেভিঃ)** বিজ্ঞানরূপ বলসমূহ দ্বারা **['বাজঃ-বলম্' নিঘ০ ২।৯] (নঃ)** আমাদের **(পাবকা[৩])** পবিত্রতা দানকারী হয়ে থাকে **['পাবকাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানম্' অষ্টা০ ৭।৩।৪৫, 'প্রত্যয়স্থাৎ কাৎ০' অষ্টা০ ৭।৩।৪৪]**। **(ধিয়াবসুঃ[৪])** জ্ঞান এবং কর্মের উপদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই বাণী **['ধীঃ ইতি কর্মনাম প্রজ্ঞানাম চ' নিঘ০ ২।১, ৩।৯, 'বাগ্ বৈ ধিয়াবসুঃ' ঐত০ আ০ ১।১।৪, 'সাবেকাচঃ' অষ্টা০ ৬।১।১৬৮, 'তৎপুরুষে তুল্যার্থতৃতীয়া' অষ্টা০ ৬।২।২] (য়জ্ঞম্)** আমাদের জীবন যজ্ঞকে **(বষ্টু)** উত্তম প্রকারে চালনা করুক, সংস্কৃত করুক **['য়জ্ঞং বষ্টু' ঐত০ আ০ ১।১।৪]** ॥৫॥

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! তোমার ক্রিয়াময়ী অথবা কর্মের উপদেশদাতা জ্ঞানময়ী বেদবাণী বিজ্ঞানরূপ বলসমূহ দ্বারা আমাদের পবিত্রতা দানকারী হয়ে থাকে। জ্ঞান এবং কর্মের উপদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সেই বাণী আমাদের জীবন যজ্ঞকে উত্তম প্রকারে চালনা করুক, সংস্কৃত করুক ॥৫॥

এই মন্ত্রে শ্লেষালঙ্কার হয়েছে ॥৫॥

য়াস্কাচার্য়ো মন্ত্রমিমমেবং ব্যাচষ্টে— "পাবকা নঃ সরস্বতী অন্নৈরন্নবতী য়জ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ কর্মবসুঃ। " নিরুক্ত ১১।২৬ ॥৫॥

ভাবার্থঃ পরমেশ্বরের বেদবাণী শ্রোতাদের কল্যাণ সাধন করেন ॥৫॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ১।৩।১০, য়জু০ ২০।৮৪, উভয়ত্র দেবতা সরস্বতী।

২. বাজেভিঃ মদীয়ৈঃ রত্নৈঃ হবির্লক্ষণৈর্বা অন্নৈঃ বাজিনীবতী অন্নবতী ইত্যর্থঃ। অথবা—বাজঃ বলং বেগো বা, তদ্ য়স্যাং বিদ্যতে সা বাজিনী সেনা তদ্বতী—ইতি বি০। বাজসমূহঃ বাজিনী তদ্বতী—ইতি ভ০। বাজোঽন্নমাস্বিতি বাজিন্যঃ ক্রিয়াঃ। 'অত ইনিঠনৌ।' অষ্টা০ ৫।২।১১৫ ইতি ইনিপ্রত্যয়ঃ তাঃ ক্রিয়া য়স্যাঃ সন্তি সা সরস্বতী বাজিনীবতী—ইতি ঋক০ ১।৩।১০ ভাষ্যে সা০। বাজিনীবতী সর্ববিদ্যাসিদ্ধক্রিয়ায়ুক্তা। বাজিনঃ ক্রিয়াপ্রাপ্তিহেতবো ব্যবহারাস্তদ্বতী। বাজিন ইতি পদনামসু পঠিতম্। নিঘ০ ৫।৬। অনেন বাজিনীতি গমনার্থা প্রাপ্ত্যর্থা চ ক্রিয়া গৃহ্যতে কৃতি তত্রৈব ঋগভাষ্যে দ০।

৩. তুলনীয়ম্—স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্। অথর্ব০ ১৯।৭১।১ ইতি।

৪. ধীঃ বসুভূতা য়স্যাং সা ধিয়াবসুঃ কর্মধনা প্রজ্ঞাধনা বা। অথবা বসুরিত্যেতদ্ বস আচ্ছাদনে ইত্যেতস্যেদং রূপম্। প্রজ্ঞয়া আচ্ছাদয়িত্রী সর্বস্য জগতঃ—ইতি বি০। (ধিয়াবসুঃ) শুদ্ধকর্মণা সহ বাসপ্রাপিকা। তৎপুরুষে কৃতি বহুলম্। অষ্টা০ ৬।৩।১৪ অনেন তৃতীয়াতৎপুরুষে বিভক্ত্যলুক্—ইতি ঋক০ ১।৩।১০ ভাষ্যে দ০।

সকলের দ্বারা বেদমন্ত্রে পরমেশ্বরের স্তুতি বর্ণনা

॥ ঋষিঃ মধুচ্ছন্দাঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥৫॥

ইন্দ্রমিদ্গাথিনো বৃহদিন্দ্রমর্কেভিরর্কিণঃ।

ইন্দ্রং বাণীরনূষত ॥৫॥[১]

সামবেদ ১৯৮

পদার্থঃ (ইন্দ্রম্) মহান পরমেশ্বরকে **(ইৎ)** -ই **(গাথিনঃ)** সামগানকারী উদ্গাতাগণ **['ঊষিকুষিগার্তিভ্যস্থন্' উণা০ ২।৪], (ইন্দ্রম্)** সেই মহান পরমেশ্বরকে **(অর্কেভিঃ**[২]**)** বেদমন্ত্র দ্বারা **['অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদেনেন অর্চন্তি' নিরু০ ৫।৪, 'বহুলং ছন্দসি' অষ্টা০ ৭।১।১০] (অর্কিণঃ)** মন্ত্রপাঠী হোতাগণ স্তুতি করেন এবং **(বাণীঃ**[৩]**)** অন্যদের বাণীসমূহও **(ইন্দ্রম্)** সেই মহান পরমেশ্বরকে **(বৃহৎ**[৪]**)** অধিকতরভাবে **(অনূষত)** বন্দনা করে ॥৫॥[৫]

সরলার্থঃ মহান পরমেশ্বরকেই সামগানকারী উদ্গাতাগণ, সেই মহান পরমেশ্বরকে মন্ত্রপাঠী হোতাগণ বেদমন্ত্র দ্বারা স্তুতি করেন এবং অন্যদের বাণীসমূহও সেই মহান পরমেশ্বরকে অধিকতরভাবে বন্দনা করে ॥৫॥

ভাবার্থঃ পরমৈশ্বর্যবান, দুঃখ-দারিদ্র্য দূরকারী, সুখ-সম্পত্তির প্রদাতা, ধর্মাত্মাদের প্রশংসাকারী, কুকর্ম-কারীদের ধ্বংসকারী, সমস্ত গুণীদের সম্পদ, সদ্গুণের আধার পরমাত্মাই সকল মানব দ্বারা বন্দনার যোগ্য। সামগান দ্বারা এবং বেদ-মন্ত্র পাঠ দ্বারা তাঁর স্তুতি করা উচিত ॥৫॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ১।৭।১, অথর্ব০ ২০।৩৮।৪, ২০।৪৭।৪, ২০।৭০।৭, সাম০ ৭৯৬।

২. (অর্কেভিঃ) অর্চনসাধকৈঃ সত্যভাষণাদিভিঃ শিল্পবিদ্যাসাধকৈঃ কর্মভিঃ মন্ত্রৈশ্চ—ইতি ঋক০ ১।৭।১ ভাষ্যে দ০।

৩. বাণীভিঃ য়জ্ঞলক্ষণাভির্বাগ্ভিঃ—ইতি বি০। বাণ্যঃ সর্বাঃ—ইতি ভ০। য়ে ত্ববশিষ্টা অধ্যর্য়বঃ তে বাণীঃ বাগ্ভির্য়জূরূপাভিঃ—ইতি সা০। বাণীঃ বেদচতুষ্টয়ীঃ—ইতি ঋক০ ১।৭।১। ভাষ্যে দ০।

৪. বৃহন্নাম্না মহতা বা—ইতি বি০। বৃহন্তমিতি বা বৃহতা সাম্না ইতি বা—ইতি ভ০। 'ত্বামিদ্ধি হবামহে' ইত্যস্যামৃচ্যুৎপন্নেন বৃহন্নামকেন সাম্না—ইতি সা০। বৃহৎ মহান্তম্। অত্র 'সুপাং সুলুক্' ইত্যমো লুক্ ইতি ঋগ্ভাষ্যে দ০।

৫. ঋগভাষ্যে দয়ানন্দর্ষিণাঽস্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানে প্রথমেন ইন্দ্রশব্দেন পরমেশ্বরঃ, দ্বিতীয়েন সূর্যঃ, তৃতীয়েন চ মহাবলবান্ বায়ুর্গৃহীতঃ।

পরমাত্মার প্রতি স্তোতাদের বেদমন্ত্রে কামনা

॥ ঋষিঃ ভরদ্বাজঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

ইমাঁ উঁ ত্বা সুঁতেঁসুঁতেঁ নঁক্ষঁন্তে গির্বণোঁ গিঁরঁঃ।

গাঁবোঁ বঁৎসঁং ন ধেঁনঁবঁঃ ॥৮॥

ইমা উ ত্বা সুতেসুতে নক্ষন্তে গির্বণো গিরঃ।

গাবো বৎসং ন ধেনবঃ ॥৮॥[১]

সামবেদ ২০১

পদার্থঃ হে **(গির্বণঃ**[২]**)** স্তুতিবাণী দ্বারা যাচনীয় পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা ! **(ইমাঃ উ)** আমাদের দ্বারা উচ্চারিত **(গিরঃ)** বেদ বাণী অথবা স্তুতিবাণী **(সুতেসুতে**[৩]**)** প্রত্যেক জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা যজ্ঞে সার্থক ব্যবহারের দ্বারা **(ত্বা)** তোমাকে **(নক্ষন্তে)** প্রাপ্ত হয় **['নক্ষতিঃ গতিকর্মা ব্যাপ্তিকর্মা চ' নিঘ০ ২।১৪, ২।১৮]; (ধেনবঃ)** নিজের দুগ্ধদানকারী বা নিজের দুগ্ধে তৃপ্তকারী **['ধেনুঃ ধয়তের্বা ধিনোতের্বা' নিরু০ ১১।৪৩] (গাবঃ)** গাভী **(বৎসং ন)** যেমন বাছুরকে প্রাপ্ত হয় ॥৮॥[৪]

সরলার্থঃ হে স্তুতিবাণী দ্বারা যাচনীয় পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা ! নিজের দুগ্ধদানকারী বা নিজের দুগ্ধে তৃপ্তকারী গাভী যেমন বাছুরকে প্রাপ্ত হয়; তেমন ভাবে আমাদের দ্বারা উচ্চারিত বেদ বাণী অথবা স্তুতিবাণী প্রত্যেক জ্ঞান, কর্ম ও উপাসনা যজ্ঞে সার্থক ব্যবহারের দ্বারা তোমাকে প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

এই মন্ত্রে উপমালঙ্কার রয়েছে ॥৮॥

ভাবার্থঃ যেমন দুগ্ধবতী গাভী নিজের দুধ পান করানোর জন্য শীঘ্রই নিজের বাছুরের কাছে আগমন করে; তেমনিভাবে প্রত্যেক জ্ঞানযজ্ঞে, প্রত্যেক কর্মযজ্ঞে এবং প্রত্যেক উপাসনাযজ্ঞে আমাদের রসপূর্ণ, অর্থপূর্ণ স্তুতিবাণী পরমাত্মার কাছে পৌঁছে যায় ॥৮॥[৫]

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৬।৪৫।২৮, ঋষিঃ শংয়ুঃ বার্হস্পত্যঃ। 'বৎসং গাবো ন ধেনবঃ' ইতি তৃতীয়ঃ পাদঃ।

২. দ্রষ্টব্যম্ ১৬৫ সংখ্যকমন্ত্রস্য ভাষ্যম্।

৩. (সুতম্) কর্মোপাসনাজ্ঞানরূপং ব্যবহারম্ ইতি ঋক০ ১।৩।৮ ভাষ্যে দ০।

৪. ঋগ্ভাষ্যে দয়ানন্দর্ষির্মন্ত্রমিমং 'শুদ্ধাচারান্ প্রত্যস্মাকং বাচঃ প্রয়ান্তু' ইতি বিষয়ে ব্যাখ্যাতবান্।

৫. য়থা অচিরপ্রসূতা গাবঃ স্নেহার্দ্রেণ মনসা বৎসং ব্যাপ্নুবন্তি তদ্বৎ ত্বাং হে ইন্দ্র অস্মদীয়াঃ স্তুতয়ঃ ব্যাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ— ইতি বি০।

বেদমন্ত্রে পরমাত্মার স্তুতির বিষয়

॥ ঋষিঃ মধুচ্ছন্দাঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

অꣳসৃꣳগ্রমিন্দ্র তেꣳ গিꣳরꣳঃ প্রꣳতিꣳ ত্বাꣳমুꣳদꣳহাসত।

সꣳজোꣳষাꣳ বৃষꣳভꣳং পতিꣳম্ ॥২॥

অসৃগ্রমিন্দ্র তে গিরঃ প্রতি ত্বামুদহাসত।

সজোষা বৃষভং পতিম্ ॥২॥[১]

সামবেদ ২০৫

পদার্থঃ হে **(ইন্দ্র)** পূজনীয় জগদীশ্বর ! আমি **(তে)** তোমার জন্য, তোমার স্তুতির জন্য **(গিরঃ)** বেদ বাণীসমূহ **(অসৃগ্রম্)** উচ্চারণ করছি **['বহুলং ছন্দসি' অষ্টা০ ৭।১।৮]**। **(সজোষাঃ**[২]**)** প্রীতিপূর্বক উচ্চারিত এই বেদবাণীসমূহ **['ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ' অষ্টা০ ৩।১।১৩৫, 'বোপসর্জনস্য' অষ্টা০ ৬।৩।৮২] (বৃষভম্)** সমস্ত অভীষ্টের বর্ষণকারী **(পতিম্)** পালনকর্তা **(ত্বাং প্রতি)** তোমাকে লক্ষ্য করে **(উদ্ অহাসত)** ঊর্ধ্বে ধাবিত হচ্ছে, উৎকণ্ঠা পূর্বক তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছে ॥২॥[৩]

সরলার্থঃ হে পূজনীয় জগদীশ্বর ! আমি তোমার জন্য, তোমার স্তুতির জন্য বেদ বাণীসমূহ উচ্চারণ করছি। প্রীতিপূর্বক উচ্চারিত এই বেদবাণীসমূহ সমস্ত অভীষ্টের বর্ষণকারী পালনকর্তা তোমাকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বে ধাবিত হচ্ছে, উৎকণ্ঠা পূর্বক তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করছে ॥২॥

প্রীতিময়ী স্ত্রী যেমন সুখ বর্ষক অধিপতিকে পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে যায়, সেই উপমা এখানে শব্দ শক্তি দ্বারা ধ্বনিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে উপাসকদের প্রেমের অতিশয় প্রতিফলিত হচ্ছে ॥২॥

ভাবার্থঃ যদি বেদবাণীসমূহ দ্বারা প্রীতিপূর্বক পরমাত্মার স্তুতি করা হয়, তাহলে তিনি অবশ্যই প্রসন্ন হন এবং স্তোতাদের জন্য যথাযোগ্য অভীষ্ট ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের বর্ষণ করেন ॥২॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ১।৯।৪, অথর্ব০ ২০।৭১।১০, উভয়ত্র 'অজোষা' ইতি পাঠঃ।

২. বেদেষু 'সজোষস্' ইত্যসুন্প্রত্যযান্তং সকারান্তমেব বাহুল্যেন প্রযুজ্যতে। প্রথমাবহুবচনে তত্র 'সজোষসঃ' ইতি রূপং ভবতি। অত্র তু কপ্রত্যয়ান্তস্য সজোষশব্দস্য স্ত্রিয়াং টাপি প্রথমাবহুবচনান্তং জ্ঞেয়ম্।

৩. দয়ানন্দর্ষির্মন্ত্রমিমম্ ঋগভাষ্যে বেদবাক্পরমেব ব্যাখ্যাতবান্।

উপাসনায় পরমাত্মাকে বেদমন্ত্রে স্বাগত জানানো

॥ ঋষিঃ বিশ্বামিত্রঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

ধা॒না॑বন্তং কর॒म्भि॑ণমপূ॒প॑বন্তমু॒क्थि॑নম্।

ই॒न्द्र॒ प्रा॒तर्जु॑षस्व नः ॥৭॥

ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্তমুক্থিনম্।

ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্ব নঃ ॥৭॥[১]

সামবেদ ২১০

পদার্থঃ হে **(ইন্দ্র)** পরমাত্মা ! তুমি **(প্রাতঃ)** প্রাতঃকালে **(নঃ)** আমাদের **(ধানাবন্তম্)** ধারণা, ধ্যান, সমাধি যুক্ত অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ড যুক্ত, **(করম্ভিণম্)** প্রাণায়াম প্রভৃতি কর্মকাণ্ড যুক্ত, **['প্রাণো বাব কঃ' জৈ০ উপ০ ব্রা০ ৪।১১।২] (অপূপবন্তম্)** জ্ঞানকাণ্ড যুক্ত এবং **(উক্থিনম্)** স্তুতি যুক্ত উপাসনা যজ্ঞকে **(জুষস্ব)** প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করো ॥৭॥[২]

সরলার্থঃ হে পরমাত্মা ! তুমি প্রাতঃকালে আমাদের ধারণা, ধ্যান, সমাধি যুক্ত অর্থাৎ উপাসনাকাণ্ড যুক্ত, প্রাণায়াম প্রভৃতি কর্মকাণ্ড যুক্ত, জ্ঞানকাণ্ড যুক্ত এবং স্তুতি যুক্ত উপাসনা যজ্ঞকে প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করো ॥৭॥

এই মন্ত্রে শ্লেষালঙ্কার রয়েছে ॥৭॥

ভাবার্থঃ সকল মানুষের উচিত শস্যদানা প্রভৃতি সুগন্ধী, মধুর, পুষ্টিপ্রদ তথা আরোগ্যদায়ক দ্রব্যের অগ্নিতে হবন করে ও দূষণ রোধ করে বায়ুমণ্ডলকে স্বচ্ছ করা এবং এমনভাবে জ্ঞানকাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডের আশ্রয় নিয়ে সামগান করে পরমাত্মার উপাসনা করা, যা থেকে অভ্যুদয় এবং মোক্ষ লাভ হয় ॥৭॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৩।৫২।১, য়জু০ ২০।২৯।

২. দয়ানন্দর্ষিণা মন্ত্রোঽয়ম্ ঋগভাষ্যে রাজবিষয়ে, য়জুর্ভাষ্যে চ বিদ্বদ্বিষয়ে ব্যাখ্যাতঃ।

বেদমন্ত্রে পরমাত্মার স্তুতি বিষয়ক বর্ণনা

॥ ঋষিঃ মেধাতিথিঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ গায়ত্রী ॥ স্বরঃ ষড্জঃ ॥

বয়ং ঘা তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ।

ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ ॥৮॥

বয়ং ঘা তে অপি স্মসি স্তোতার ইন্দ্র গির্বণঃ।

ত্বং নো জিন্ব সোমপাঃ ॥৮॥[১]

সামবেদ ২৩০

পদার্থঃ হে **(গির্বণঃ**[২]**)** বেদবাণী দ্বারা ভজনের যোগ্য **(ইন্দ্র)** পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা ! **(বয়ম্)** আমরা **(স্তোতারঃ)** স্তোতাগণ **(ঘ)** নিশ্চয়ই **['ঋচি তু নু ঘ০' অষ্টা০ ৬।৩।১৩৬] (তে অপি)** তোমারই **(স্মসি)** হয়ে থাকি **['ইদন্তো মসি' অষ্টা০ ৭।১।৪৬]**। হে **(সোমপাঃ)** আমাদের মৈত্রী রস গ্রহণকারী ! **(ত্বম্)** তুমি **(নঃ)** আমাদের সর্বদা **(জিন্ব)** তৃপ্ত করো ॥৮॥

সরলার্থঃ হে বেদবাণী দ্বারা ভজনীয় পরমৈশ্বর্যবান পরমাত্মা ! আমরা স্তোতাগণ নিশ্চয়ই তোমারই হয়ে থাকি অর্থাৎ সর্বদা তোমারই উপাসনা করি ও পবিত্র বেদবাণী অনুসরণপূর্বক জীবন পরিচালনা করি। হে আমাদের মৈত্রী রস গ্রহণকারী ! তুমি আমাদের সর্বদা তৃপ্ত করো ॥৮॥

ভাবার্থঃ যাঁরা পরমাত্মার সাথে বন্ধুর ন্যায় সম্পর্ক স্থাপন করে, পরমাত্মাও তাদের সদা সুখী করেন ॥৮॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৮।৩২।৭ 'স্মসি' ইত্যত্র 'ষ্মসি' ইতি পাঠঃ।

২. দ্রষ্টব্যম্—১৬৫ সংখ্যকস্য মন্ত্রস্য ব্যাখ্যানম্।

বেদমন্ত্রে পরমেশ্বর মহিমা গাওয়ার জন্য মানবজাতিকে প্রেরণা দান

॥ ঋষিঃ গোষূক্ত্যশ্বসূক্তিনৌ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ উষ্ণিক্ ॥ স্বরঃ ঋষভঃ ॥

**তꣳ॑ ঽ॒ꣳ॒ ঽ॒ꣳ॒ ঽ॒ꣳ॒

॥ ঋষিঃ বামদেবঃ ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ দ্বিপদা বিরাট্ পঙ্ক্তিঃ॥ স্বরঃ পঞ্চমঃ ॥

অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কা আ স্তোভতি শ্রুতো যুবা স ইন্দ্রঃ ॥৯॥

অর্চন্ত্যর্কং মরুতঃ স্বর্কা আ স্তোভতি শ্রুতো য়ুবা স ইন্দ্রঃ ॥৯॥[১]

সামবেদ ৪৪৫

পদার্থঃ (স্বর্কাঃ) উত্তম স্তোতা, অথবা উত্তম বিধিতে বেদমন্ত্রের উচ্চারণকারী **['অর্কো মন্ত্রো ভবতি য়দনেনার্চন্তি' নিরু০ ৫।৪] (মরুতঃ)** ঋত্বিক মানব **['মরুতঃ ইতি ঋত্বিঙ্নাম' নিঘ০ ৩।১৮] (অর্কম্)** অর্চনীয় পরমেশ্বরের **['অর্কো দেবো ভবতি য়দেনমর্চন্তি' নিরু০ ৫।৪] (অর্চন্তি)** উপাসনা করেন। **(শ্রুতঃ)** বেদমধ্যে প্রসিদ্ধ অথবা শ্রুত **(য়ুবা)** সদা যুবা, যুবকের মতো অসীম বলশালী **(সঃ)** সেই **(ইন্দ্রঃ)** পরমেশ্বর তাকে **(আ স্তোভতি)** সহায়তা করেন ॥৯॥

সরলার্থঃ উত্তম স্তোতা, অথবা উত্তম বিধিতে বেদমন্ত্রের উচ্চারণকারী ঋত্বিক মানব অর্চনীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। বেদমধ্যে প্রসিদ্ধ অথবা শ্রুত সদা যুবা, যুবকের মতো অসীম বলশালী সেই পরমেশ্বর তাকে সহায়তা করেন ॥৯॥

এই মন্ত্রে অনুপ্রাস অলঙ্কার আছে, সেই সাথে পরস্পর উপকারকারী রূপ বস্তু হতে পরিবৃত্তি অলঙ্কার ব্যঙ্গ আছে ॥৯॥

ভাবার্থঃ যে মানব বেদমন্ত্রের গানপূর্বক পরমাত্মার আরাধনা করে, তাকে তিনি **(পরমেশ্বর)** অক্ষয় অবলম্বন দিয়ে অনুগৃহীত করেন ॥৯॥

টিপ্পনীঃ

১. সাম০ ১১১৪।

২.পরিবৃত্তির্বিনিময়ঃ সমন্যূনাধিকৈর্ভবেৎ। সা০ দ০ ১০।৮০ ইতি তল্লক্ষণাৎ। প্রকৃতে সমেন বিনিময়ঃ।

বেদ বাণীর মাধ্যমে পরমাত্মারই যশ-কীর্তি গায়ন

॥ ঋষিঃ বামদেবঃ ॥ দেবতাঃ অগ্নিঃ ॥ ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ ॥ স্বরঃ ধৈবতঃ ॥

তে মন্বত প্রথমং নাম গোনাং ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জানন্।

তাঁ জাঁনঁতীঁরঁভ্যঁনূষতঁ ক্ষাঁ আঁবিঁর্ভুঁবন্নরুণীঁর্যশাঁসাঁ গাঁবঃ ॥৫॥

তে মন্বত প্রথমং নাম গোনাং ত্রিঃ সপ্ত পরমং নাম জনান্।

তা জানতীরভ্যনূষত ক্ষা আবির্ভুবন্নরুণীর্যশসা গাবঃ ॥৫॥[১]

সামবেদ ৬০৬

পদার্থঃ হে অগ্রনায়ক পরমাত্মা! **(তে**[২]**)** প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ **(নাম)** তোমার প্রণব নামকে **['তস্য বাচকঃ প্রণবঃ' য়ো০ দ০ ১।২৭] (প্রথমম্)** শ্রেষ্ঠ **(অমন্বত)** বলে মান্য করে। **(গোনাং ত্রিঃসপ্ত)** আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকারের দৃষ্টিতে সপ্ত ছন্দে বা গায়ত্রী প্রভৃতি একুশ ছন্দেযুক্ত[৩] ঋকসমূহ **['গোঃ পাদান্তে' অষ্টা০ ৭।১।৫৭] (নাম)** তোমার নামকে **(পরমম্)** শ্রেষ্ঠ **(জানন্)** বলে আমাদের জানায় অর্থাৎ বর্ণনা করে। **(জানতীঃ)** তোমার নামকে সর্বশ্রেষ্ঠ জানিয়ে **(তাঃ)** সেইসব প্রসিদ্ধ **(ক্ষাঃ)** গূঢ় অর্থযুক্ত বেদ বাণীসমূহ **['ক্ষা ক্ষিয়তের্নিবাসকর্মণঃ' নিরু০ ২।৬] (য়শসা)** তোমার মহিমাগানজনিত যশ দ্বারা **(অরুণীঃ)** প্রকাশিত হয়ে **(আবির্ভুবন্)** অধ্যয়নকারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে নিজ রহস্যের অর্থ ব্যক্ত করে **['উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণোত্যেনাম্। উতো ত্বস্মৈ তন্বং১বিসস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।।' ঋক০ ১০।৭১।৪]** ॥৫॥

সরলার্থঃ হে অগ্রনায়ক পরমাত্মা! প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণ তোমার প্রণব নামকে শ্রেষ্ঠ বলে মান্য করে। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকারের দৃষ্টিতে সপ্ত ছন্দে বা গায়ত্রী প্রভৃতি একুশ ছন্দেযুক্ত ঋকসমূহ তোমার নামকে শ্রেষ্ঠ বলে আমাদের জানায় অর্থাৎ বর্ণনা করে। তোমার নামকে সর্বশ্রেষ্ঠ জানিয়ে সেইসব প্রসিদ্ধ গূঢ় অর্থযুক্ত বেদ বাণীসমূহ তোমার মহিমাগানজনিত যশ দ্বারা প্রকাশিত হয়ে অধ্যয়নকারীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে নিজ রহস্যের অর্থ ব্যক্ত করে ॥৫॥

ভাবার্থঃ বেদবাণীসমূহ সম্মিলিতভাবে যে পরব্রহ্মের মহিমা গায়ন করে এবং যে যশস্বী পরব্রহ্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করে বেদবাণী স্বয়ং যশময়ী হয়ে গেছে, সেই পরমাত্মার স্তুতি আমরা কেনই বা করব না ! ॥৫॥

টিপ্পনীঃ

১. ঋক০ ৪।১।১৬, 'তে মন্বত প্রথমং নাম ধেনোস্ত্রিঃসপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দন্। তজ্জানতীরভ্যনূষত বা আবির্ভুবদরুণীর্যশসা গোঃ' ॥ ইতি পাঠঃ।

২. 'তে' ইতি পদং প্রসিদ্ধপরামর্শকম্। ন চ যুষ্মদাদেশোঽয়মিতি মন্তব্যং পাদাদৌ তস্যাপ্রাপ্তেঃ স্বরবিরোধাচ্চ।

৩. ১। গায়ত্র্যাদি সপ্তক- গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পংক্তিঃ, ত্রিষ্টুপ্, জগতী; ২। অতিজগত্যাদি সপ্তক- অতি জগতী, শক্করী, অতি শক্করী, অষ্টি, অত্যষ্টিঃ, ধৃতি, অতিধৃতিঃ; ৩। কৃত্যাদি সপ্তক - কৃতিঃ, প্রকৃতিঃ, আকৃতিঃ, বিকৃতিঃ, সংকৃতিঃ, অভিকৃতিঃ, উৎকৃতিঃ।

পরমাত্মাকে আমাদের রক্ষা করার জন্য বেদমন্ত্রে আহ্বান

॥ ঋষিঃ ইন্দ্রো বা প্রজাপতির্বা বিষ্ণুর্বা বিশ্বামিত্রো বা ॥ দেবতাঃ ইন্দ্রঃ ॥ ছন্দঃ বিরাট্ ॥ স্বরঃ গান্ধারঃ ॥

ঈশে হি শক্রস্তমূতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্।

স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহত্ ॥৬॥

ঈশে হি শক্রস্তমূতয়ে হবামহে জেতারমপরাজিতম্।

স নঃ স্বর্ষদতি দ্বিষঃ ক্রতুশ্ছন্দ ঋতং বৃহত্ ॥৬॥

সামবেদ ৬৪৬

পদার্থঃ (শক্রঃ) শক্তিশালী পরমেশ্বর **(হি)** নিশ্চয়ই **(ঈশে)** সকল জগতের অধীশ্বর **['লোপস্ত আত্মনেপদেষু' অষ্টা০ ৭।১।৪১]**। **(তম্)** তাঁকে আমাদের **(ঊতয়ে)** রক্ষা করার জন্য **(হবামহে)** আহ্বান করি। কেমন পরমেশ্বরকে? **(জেতারম্)** যিনি সকল বস্তুসমূহকে জয়কারী তথা **(অপরাজিতম্)** যিনি স্বয়ং অপরাজিত। **(সঃ)** তিনি **(নঃ)** আমাদের **(দ্বিষঃ)** অভ্যন্তরীণ তথা বাহ্যিক শত্রু থেকে **(অতি স্বর্ষৎ)** অতিক্রান্ত করে দেন **['স্বরতিঃ গতিকর্মা' নিঘ০ ২।১৪]**। **(ক্রতুঃ)** জ্ঞান, কর্ম, মঙ্গলময় সংকল্প ও যজ্ঞ, **(ছন্দঃ)** গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ, রক্ষণশক্তি **['ছন্দাংসি ছাদনাৎ' নিরু০ ৭।১] (ঋতম্)** সত্য এবং **(বৃহৎ)** বৃহৎ নামক সাম আমাদের জন্য উপকারী হোক ॥৬॥

'ত্বামিদ্ধি হবামহে' (সাম ২৩৪) এই ঋকের ওপর গায়নকৃত সামকে বৃহৎ সাম বলা হয় ॥৬॥

সরলার্থঃ শক্তিশালী পরমেশ্বর নিশ্চয়ই সকল জগতের অধীশ্বর। তাঁকে আমাদের রক্ষা করার জন্য আহ্বান করি। কেমন পরমেশ্বরকে? যিনি সকল বস্তুসমূহকে জয়কারী তথা যিনি স্বয়ং অপরাজিত। তিনি আমাদের অভ্যন্তরীণ তথা বাহ্যিক শত্রু থেকে অতিক্রান্ত করে দেন। জ্ঞান, কর্ম, মঙ্গলময় সংকল্প ও যজ্ঞ, গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ, রক্ষণশক্তি সত্য এবং বৃহৎ নামক সাম আমাদের জন্য উপকারী হোক ॥৬॥

ভাবার্থঃ বিজেতা, অপরাজিত পরমাত্মার আশ্রয় নিয়ে তাঁর উপাসকও বিজয়ী তথা অপরাজিত হয়ে যায় ॥৬॥

ত্রৈতবাদের স্বরূপ

ত্রৈতবাদের অনুসারে তিনটি অনাদি তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে— ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি। এদের মধ্যে ঈশ্বর সকলের প্রেরক, নিয়ামক ও জীবগণের কর্মফলের প্রদাতা এবং প্রকৃতি অচেতন ও ভোগ্য তত্ত্ব (শ্বেতা০ ১।১২)।

এই তিনের মধ্যে ঈশ্বর আনন্দস্বরূপ (**স্বর্য়স্য চ কেবলম্**। অথর্ব০ ১০।৭।১), শরীর-রহিত, নিরাকার (**অকায়ম্**। যজু০ ৪০।৪), সর্বশক্তিমান্ (**শুক্রম্**। যজু০ ৪০।৮), অজন্মা (**অজ একপাদ্**। যজু০ ৩৪।৫৩) অনন্ত (**অনন্তম্**। অথর্ব০ ১০।৮।১২), অনাদি (**সনাতনম্**। যজু০ ১০।৮।২২), সর্বব্যাপক (যজু০ ৩২।৮), সর্বজ্ঞ (**সর্ববিৎ**। সাংখ্য০ ৩।৫৬) অজর, অমর (অথর্ব০ ১০।৮।৪৪), অভয় (**অভয়ংকর**। অথর্ব০ ১০।২১।১), পবিত্র (**পবমানঃ**। অথর্ব ১০।৮।৪০), সর্বেশ্বর (**সর্বেশ্বরঃ**। অথর্ব০ ১০।৪।১), সৃষ্টিকর্তা-পালনকর্তা-সংহারকর্তা (**জন্মাদ্যস্য য়তঃ**॥ বেদান্ত০ ১।১।২), মূর্তিশূন্য (**ন তস্য প্রতিমা অস্তি**। যজু০ ৩২।৩)।

দ্বিতীয় তত্ত্ব 'জীবাত্মা' নিত্য (**অমর্ত্য০** ঋ০ ১।১৬৪।৩৮), অজন্মা (**ন জায়তে**। গীতা০ ২।২০), কেশ থেকেও সূক্ষ্মতর, অণু-পরিমাণ (**বালাদেকমণীয়স্কমুতৈকং নেব দৃশ্যতে**। অথর্ব০ ১০।৮।২৫), কর্মফলের ভোক্তা (**পিপলং স্বাদন্তি**। অথর্ব০ ৯।৯।২০), চেতন এবং অনেক (**পুরুষবহুত্বম্** (সাংখ্য০ ১।৫১), নিত্য, চেতন ও বহুসংখ্যক (**নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চ.... বহূনাং....** । শ্বেতা০ ৬।১৩)।

ঈশ্বর ও জীবাত্মা পরস্পর অনাদিকাল থেকে স্বরূপত ভিন্ন-ভিন্ন সত্তা (**ভেদব্যপদেশাচ্চ**; বেদান্ত০ ১।১।১৭)।

প্রকৃতি তৃতীয় তত্ত্ব, এটি সম্পূর্ণ কার্য জগতের মূল উপাদান কারণ। কিন্তু এর উপাদান কারণ কেউ নেই, এটি ত্রিগুণাত্মিকা (সাংখ্য০ ১।৬১), এটি প্রলয়াবস্থাতেও বিদ্যমান থাকে (**তম্ আসীৎ**। ঋ০ ১০।১২৯।৩), ঈশ্বর দ্বারা শাসিত, জীবাত্মার ভোগের সাধন (**ভোগ্যম্**। শ্বেতা০ ১।১২) এবং জড়।

এই তিনটি তত্ত্ব পরস্পর স্বরূপ থেকে ভিন্ন এবং প্রলয়াবস্থা - সৃজনাবস্থাতে একত্রে থাকে।

জন্ম— জন্মের অর্থ নিজের মূল উপাদান কারণ থেকে প্রাদুর্ভূত হওয়া।

মৃত্যু— মৃত্যুর অর্থ নিজের উপাদান কারণে লীন হওয়া (**নাশঃ কারণলয়ঃ**। সাংখ্য০ ১।১২১)

কেবল কার্য জগতের এবং তার দ্বারা নির্মিত অন্য পদার্থসমূহ (শরীর আদি) এর জন্ম হয়, কিন্তু ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির কখনো জন্ম হয় না।

সৃষ্টি— সৃষ্টি প্রবাহ থেকে নিত্য (**য়থাপূর্বমকল্পয়ৎ**। ঋ০ ১০।১৯০।৩)। অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয় এই ক্রম অনাদি।

মোক্ষ— অবিদ্যাজনিত প্রকৃতির বন্ধন থেকে ও দুঃখ থেকে মুক্ত হওয়া এবং ব্রহ্মে অবাধ গতিতে বিচরণ করাই মোক্ষ (**ব্রহ্মলোকে মহীয়তে;** কঠ০ ১।২।১৫) জীবাত্মার কর্ম সীমাবদ্ধ, তাই তাদের ফলও স্থবির। মোক্ষে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত থাকার পর জীবাত্মার পুনরাবৃত্তি ঘটে।

ত্রৈতবাদ দর্শনে অবতারবাদকে স্বীকার করা হয়নি। জীবাত্মা কখনো ঈশ্বর হতে পারেন না, আর ঈশ্বরও কখনো জীবাত্মা হতে পারেন না। ঈশ্বর ও জীবাত্মার সম্বন্ধ উপাস্য-উপাসক, পিতা-পুত্র ও ব্যাপক-ব্যাপ্যের (যজু০ ৩২।৮)।

এই হচ্ছে সংক্ষেপে ত্রৈতবাদের দার্শনিক মান্যতা।

ত্রৈতবাদের জন্য প্রযুক্ত শব্দসমূহ

প্রাচীন সাহিত্যে ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি— এই তিনের জন্য **'ত্রয়ঃ** (অথর্ববেদ ১৮।৪।৪) **'ত্রয়ম্'** (শ্বেতা০ ১।৭ ও ১।৯), **'ত্রিবিধম্'** (শ্বেতা০ ১।১২), **'ত্রিধা'** (নারদীয় পুরাণ পূর্বার্ধ ২।২৮,৩০) **'ত্রিতয়ম্'** (মাধবাচার্য, সর্বদর্শন সংগ্রহ পৃঃ ৫৫) এবং আধুনিক সাহিত্যে **'ত্রেত'** (বেদবাণী, অংক ৬, পৃঃ ১২।১৯৫৬ সংস্করণ) শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এই শব্দসমূহের ক্রমশ বিবেচন এইপ্রকার—

(ক) **ত্রয়—** সংখ্যাবাচক **'ত্রি'** শব্দ দ্বারা তিন অবয়ব যার এই অর্থে 'তয়প' (**সংখ্যায়া অবয়বে তয়প্।** অষ্টাধ্যায়ী, ৫।২।৪২), প্রত্যয় হয়ে 'ত্রিতয়' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। বিকল্পরূপে 'তয়প্'-কে 'অয়চ' (**দ্বিত্রিভ্যাং তয়স্যায়জ্বা।** অষ্টাধ্যায়ী ৫।২।৪৩)', আদেশ হয়ে পুংলিঙ্গে **'ত্রয়ঃ'** এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে— তিনের সমূহ (**সংস্কৃত শব্দার্থ কৌস্তুভ,** পৃঃ ৫১৩)। বেদে **"ত্রয়ঃ সুপর্ণা"** (অথর্ব০ ১৮।৪।৪) শব্দের প্রয়োগ ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি— এই তিনের অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। শ্রী ক্ষেমকরণদাস ত্রিবেদী **'ত্রয়ঃ সুপর্ণা'** এর অর্থ জগতের পূর্তিকারক তিন পদার্থ ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি করেছেন।

(খ) **ত্র্যয়ম্—** এই শব্দের সিদ্ধি পূর্ববৎই হবে। নপুংসকলিঙ্গে **'ত্রয়ম্'** এইরূপ হয়ে থাকে। এর অর্থও হচ্ছে 'তিনের সমূহ'। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে এই শব্দের প্রয়োগ ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির জন্য দুটি স্থলে করা হয়েছে। সেখানে প্রথম প্রকরণের অর্থ হচ্ছে— "এই পরমব্রহ্মের গুণগান করেছি, এই ব্রহ্মচক্রে (ব্রহ্ম, জীব ও প্রকৃতি) এই তিনের প্রতিষ্ঠা রয়েছে। তিনটিই অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী (শ্বেতা০ ১।৭)।" স্বামী সত্যানন্দ এই প্রকরণের এই অর্থ স্বীকার করেছেন (একাদশোপনিষদ্ সংগ্রহ পৃঃ ৪২৪)। সেই প্রকরণের পরেই লেখা আছে— "দুটি অজ আছে 'জ্ঞ' ও 'অজ্ঞ'। 'জ্ঞ' ঈশ, 'অজ্ঞ' অনীশ। এই দুই অজন্মা ছাড়াও অন্য একটি অজা (অজন্মা) প্রকৃতি আছে। প্রকৃতি ভোক্তা জীবাত্মার জন্য ভোগ্য অর্থে, পরমেশ্বর বিশ্বরূপ, অনন্ত, শুভাশুভ কর্মের কর্তা। এই তিনটিই মহান। সাধক এই তিনটিকেই জানেন (শ্বেতা০ ১।৯)। এখানে দুটি 'অজ' এবং আরেকটিকে 'অজা' বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তিন তত্ত্ব অনাদি। 'অজ' এর অর্থ জীবাত্মা এবং পরমাত্মাও (সংস্কৃত হিন্দি কোষ, পৃঃ ১২)। অজার অর্থ অনাদি

প্রকৃতি প্রসিদ্ধ (সংস্কৃত হিন্দি কোষ, পৃঃ ১২)। এখানে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি— এই তিনের জন্য **'ত্রয়ম্'** শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

(গ) **ত্রিবিধম্—** তিন তত্ত্বের নির্দেশক **'ত্রিবিধম্'** শব্দ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদদে ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। এই তিন তত্ত্বকে ব্রহ্ম (মহান) বলে লেখা হয়েছে— এই সম্পূর্ণ জগতে ভোক্তা (জীবাত্মা), ভোগ্য (প্রকৃতি) এবং প্রেরক (পরমাত্মা) এই তিনটিই ব্রহ্ম অর্থাৎ মহান (**শ্বেতা০ ১।১২**)।

উপনিষদে 'ব্রহ্ম' শব্দ 'মহান' অর্থবোধক (**দেখুন ড. রাজেন্দ্র কুমারজীর লেখা "উপনিষদ্ তত্ত্বদর্শন"– বিশ্ব জ্যোতি পত্রিকা, পৃঃ ১৫০**) এবং অনেকার্থক রয়েছে। তার অর্থ কেবল পরমাত্মাই গ্রহণ করা উচিত নয়। জগতে জড় চেতনাদি মহান তত্ত্ব রয়েছে, সেসবের জন্য প্রসঙ্গানুসারে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ উপনিষদে বিদ্যমান। ঋষিগণের দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক উভয় তত্ত্ব ব্রহ্ম অর্থাৎ মহান। এক বিস্তৃত তালিকা ব্রহ্ম শব্দ সম্বন্ধীয় উপনিষদে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে অনেক অর্থে প্রযুক্ত 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা উপনিষদের ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ভাব স্পষ্ট হয়ে যায়। উপনিষদের এই রহস্যকে বোঝার পর এটি স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে যে, ভোক্তা জীবাত্মা, ভোগ্য প্রকৃতি এই উভয়ের প্রেরক শক্তি পরমাত্মা— এই তিনটিই ব্রহ্ম = মহান; এই তিন তত্ত্বকে উপনিষদে **'ত্রিবিধম্'** শব্দে অভিহিত করা হয়েছে।

উপনিষদে মহান অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ

ব্রহ্ম য়দোঙ্কার (প্রশ্ন০ ৫।২)

সর্ব্বং খলিদ্বং ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য০ ৩।১৪।১)

ধ্যানং ব্রহ্মেতি (ছান্দোগ্য০ ৭।৬।২)

আশাং ব্রহ্মেতি (ছান্দোগ্য০ ৩।১৪।৩)

আকাশ শরীরং ব্রহ্ম (তৈত্তিরীয়০ ১।২)

আকাশো ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য০ ৩।১৮)

অন্নং ব্রহ্মেতি (ছান্দোগ্য০ ৭।৯।২)

বাগ্ বৈ ব্রহ্মেতি (বৃহদা০ ৪।১।২)

প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (ঐতরেয়০ ৩।১।৩)

আদিত্য ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য০ ৩।১৯)

অপো ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য০ ৭।১০।২)

চক্ষুর্বৈ ব্রহ্ম (বৃহদা০ ৪।১।৪)

মনো ব্রহ্ম (তৈত্তিরীয়০ ৩।৪)

বাচং ব্রহ্মেতি (ছান্দোগ্য০ ৭।২।২)

তেজো ব্রহ্ম (ছান্দোগ্য০ ৭।১১।২)

হৃদয়ং বৈ ব্রহ্মেতি (বৃহদা০ ৪।১।৭)

তপো ব্রহ্ম (তৈত্তিরীয়০ ৩।৪)

য়শ্চিত্তং ব্রহ্মেতি (ছান্দোগ্য০ ৭।৫।৩)

স্মরং ব্রহ্মেতি (ছান্দোগ্য০ ৭।১৩।২)

বিদ্যুৎ ব্রহ্মেতি (বৃহদা০ ৫।৭।১)

(ঘ) **ত্রিধা—** প্রাচীন সাহিত্যে 'ত্রিধা' শব্দও তিন তত্ত্ব ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির রূপে প্রযুক্ত হয়েছে। নারদীয় পুরাণে লেখা আছে— আদি সর্গে প্রকৃতি, পুরুষ (জীবাত্মা) ও কাল (পরমাত্মা) এই তিন থাকে (**নারদীয় পুরাণ, পূর্বার্ধ ২৮**)। সেখানে 'কাল' শব্দের অর্থ মহেশ্বর করা হয়েছে (**এষ শুদ্ধোঽক্ষ রোঽনন্তঃ কালরূপী মহেশ্বরঃ। নারদীয় পুরাণ, পূর্বার্ধ** ৩০)। সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তা লিখেছেন 'কাল'-কেও ব্রহ্মের একটি রূপ মানা যায়। কালের স্বরূপলক্ষণ সৎ-চিৎ-আনন্দ (**ভারতীয় দর্শন কা ইতিহাস, পৃঃ ৩৩৬**)। ত্রিধার অর্থ এই তিন ভেদ (**হিন্দি সংস্কৃত কোষ, পৃঃ ৪৪২**)।

ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি এই তিন তত্ত্বের জন্য দার্শনিক বিদ্বানগণ **'ত্রিতয়' (ঈশ্বরশ্চিচ্চেতি পদার্থ ত্রিতয়ম্ মাধবাচার্য সর্বদর্শন সংগ্রহ, পৃঃ ৩২), 'ত্রিক' (কৃষ্ণ কান্ত দ্বৈতবেদান্ত কা তাত্ত্বিক অনুশীলন, পৃঃ৩২), 'তৃত্ব' (শ্রীনারায়ণ স্বামীর লেখ- সার্বদেশিক সাপ্তাহিক, পৃঃ ৪০১, ডিসেম্বর ১৯৩), 'ত্রেত' (ঐ) এবং 'ত্রৈত' (প্রো০ সত্যব্রত- গীতাভাষ্য, পৃঃ ৪৬৪)** শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন।

(ঙ) **ত্রৈত—** প্রাচীন সাহিত্যে তিন সংখ্যাবোধক শব্দ ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। যদিও 'ত্রৈত' শব্দের প্রয়োগও প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়! কিন্তু এই শব্দ ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির অর্থে কীভাবে প্রচলিত হয়েছে এটি জানার জন্য ভাষা বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে এই শব্দের ঐতিহাসিক আলোকপাত করতে হবে। যেরূপ দার্শনিক ক্ষেত্রে প্রচলিত অদ্বৈত (**সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবতি।** শতপথ০ ১৫।৭।১।৩১) এবং দ্বৈত (**য়ত্র হি দ্বৈতমিবভবতি।** শতপথ০ ১৪।৫।৪।১৫) শব্দের মধ্যে থেকে 'অদ্বৈত' শব্দ একটি শব্দ ব্রহ্মের অদ্বৈতবাদীদের মধ্যে প্রচলিত হয়েছে তথা 'দ্বৈত' শব্দ ঈশ্বর এবং জীবাত্মার ভিন্নতার জন্য মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদে প্রযুক্ত হয়েছে। তদ্রূপ তিন অনাদি তত্ত্বের জন্য কিছু পণ্ডিতগণ দার্শনিক গ্রন্থে 'ত্রৈতবাদ' শব্দের প্রয়োগ করেছেন (**রাহুল সাংস্কৃত্যায়ন—** দর্শন দিগ্-দর্শন, পৃঃ ৪২৮)। এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধনও পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। বাবা বিষ্ণু দয়াল নিজের বহুচর্চিত লেখাতে এই ত্রৈত শব্দের প্রয়োগ করেছেন (**বেদবাণী, অংক ১০। পৃঃ ১৩।১৯৬৩ ইং**)। পণ্ডিত রামচন্দ্র দেহলবী নিজের লেখা 'আর্যসমাজের ত্রৈতবাদ' এ এই শব্দের প্রয়োগ করেছেন (**বেদবাণী অংক ৬। পৃঃ ২২। ১৯৭৫ ইং**)। ড. হরিদত্ত শাস্ত্রী 'ত্রৈতবাদের বৈদিকতা' লেখাতে এই শব্দের প্রয়োগ করেছেন (**বেদবাণী, অংক ৩। পৃঃ ১০। ১৯৬৪ ইং**)। পণ্ডিত জগদীশচন্দ্র শাস্ত্রী নিজের 'বৈদিক ত্রৈতবাদ সমর্থন' লেখনীতে এই শব্দের যোগ করেছেন (**আর্যোদয় পত্রিকা, পৃঃ ৩৩, স্বাধ্যায় অংক ২৩ আগস্ট ১৯৯৪**)। এই প্রকার অন্য ভাষ্যকারগণ (**প্রো০ সত্যব্রত, গীতাভাষ্য, পৃ ৪৬৫**) এবং পত্রকারগণও (**শ্রী রামেশ্বরদয়াল, পত্রিকা- আর্য়ো কা ত্রৈতবাদ, চতুর্থ পুষ্প ১৯৭২**) ত্রৈতবাদ শব্দের প্রয়োগ করেছেন।

ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই শব্দ একত্ব ও দ্বিত্বের বোধক অদ্বৈত ও দ্বৈত শব্দের ন্যায় ত্রিত্বের বোধনার্থে প্রচলিত হয়েছে। যেরূপ 'দ্বৈত' ও 'অদ্বৈত' শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে সেই আধারে 'ত্রৈত' শব্দের ব্যুৎপত্তি করা যেতে পারে।

'দ্বৈত' শব্দের ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত কোষে এইপ্রকার করা হয়েছে— **দ্বি + ই + ক্তঃ = দ্বীতম্ স্য ভাবঃ (স্বার্থে অণ) দ্বৈতম্ দ্বৈতমধিকৃত্যবাদঃ দ্বৈতবাদঃ (জীবেশ্বর বিভেদ নির্ণায়কে) (বাচস্পত্য ভাগ ৫, পৃঃ ৩৮৩২)** দ্বৈতের অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার পারমার্থিক ভেদ।

'দ্বৈত' এর আধারেই নঞ্ সমাস করে অদ্বৈতের ব্যুৎপত্তি **'ন দ্বৈতম্ অদ্বৈতম্'** এটি করা যেতে পারে, যার অর্থ হচ্ছে দুইয়ের ভাব রহিত কেবল এক ব্রহ্ম।

এই শব্দের আধারেই 'ত্রৈত' শব্দের ব্যুৎপত্তি এইপ্রকার করা যেতে পারে— **ত্রি + ই+ ক্তঃ ত্রীতম্ তস্য ভাবঃ (স্বার্থে অণ)** আদি বৃদ্ধি হয়ে 'ত্রৈতম্' শব্দ হয়। **(ত্রয়মধিকৃত্য বাদঃ ত্রৈতবাদ)** এই 'ত্রৈতের' সাথে সম্বন্ধিত বাদকে **'ত্রৈতবাদ'** বলে। অর্থাৎ ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতির পারমার্থিক ভেদ হচ্ছে ত্রৈতবাদ।

ত্রৈতবাদের পরিভাষা

কয়েকজন ত্রৈতবাদী আচার্য ও বিদ্বানগণের পরিভাষাতে ত্রৈতবাদের বিষয় নিম্নে লিখিত—

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী— ঈশ্বর, জীব ও জগতের কারণ— এই তিন অনাদি। জীব থেকে ঈশ্বর, ঈশ্বর থেকে জীব এবং উভয় থেকে প্রকৃতি ভিন্নস্বরূপ তিন অনাদি। **(স০ প্র০ সমু০ ৮)**

স্বামী দর্শনানন্দ— জীব, ব্রহ্ম, প্রকৃতি এই তিন অনাদি তত্ত্ব। **(উপনিষদ্ প্রকাশ, পৃঃ ১৫৯)**

পণ্ডিত লেখরাম— ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি নিজের সত্তার জন্য কারো ওপর আশ্রিত নয়, এজন্য এরা অনাদি তথা নিত্য পদার্থ **(কুলিয়াত আর্য় মুসাফির, পৃঃ ৩৮২)**।

শ্রীমৎ নারায়ণ স্বামী— প্রথম মন্তব্য বেদের ত্রৈতবাদ অর্থাৎ বেদ ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির নিত্যতার প্রতিপাদন করে **(আর্য সমাজ কিয়া হ্যায়, পৃঃ ৩৫)**।

পণ্ডিত শিবশঙ্কর শর্মা— প্রকৃতি, জীব ও ব্রহ্ম এই তিন অক্ষর, কারণ এদের বিনাশ হয় না **(বেদ তত্ত্বপ্রকাশ, পৃঃ ৩)**।

পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়— ঈশ্বর, চিৎ (জীব) ও অচিৎ (প্রকৃতি) তিনটিই তত্ত্ব। সৃষ্টির তিনটি তত্ত্বের সূচক—

(১) জীব, যার জন্য সৃষ্টি নির্মাণের আবশ্যকতা রয়েছে।

(২) প্রকৃতি, যার পরিণামস্বরূপ এই সৃষ্টি।

(৩) ঈশ্বর, যিনি নিজের জ্ঞান ও সামর্থ্য দ্বারা সৃষ্টির রচনা করতে পারেন।

যে তিন তত্ত্ব অনাদি এবং অনন্ত অর্থাৎ নিত্য হওয়া প্রয়োজন (**অদ্বৈতবাদ, পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪**)।

ড. হরিদত্ত শাস্ত্রী— ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতিকে প্রবাহ থেকে অনাদি মানা হয়ে থাকে। এটিই বৈদিক সিদ্ধান্ত (**ত্রৈতবাদ কি বৈদিকতা। বেদবাণী (পত্রিকা) অংক ৩, পৃঃ ১০**)।

শ্রী পণ্ডিত রামচন্দ্র দেহলবী— ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি অনাদি হয়েও পরস্পরের থেকে ভিন্ন। ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত সামর্থ্য। জীব ও প্রকৃতির ওপর তাঁর আধিপত্য রয়েছে (**আর্যসমাজের ত্রৈতবাদ। বেদবাণী, অংক ৩, পৃঃ ২২, এপ্রিল ১৯৫৮**)।

এই সকল বিদ্বানগণ ত্রৈতবাদে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতি— এই তিন তত্ত্বের অনাদিত্বকে স্বীকার করেছেন এবং সৃষ্টির রচনাতে এই তিন তত্ত্বের অনিবার্য অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এই তিন তত্ত্ব পরস্পর ভিন্ন এবং অনাদি। এইপ্রকার উপর্যুক্ত পরিভাষাতে ত্রৈতবাদের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে যায়।

দেশ ও কাল উভয়ই নিত্য এবং ব্যাপক, সবার সাথেই এর সম্বন্ধ রয়েছে (**ন কালয়োগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্বসম্বন্ধাৎ। সাংখ্য০ ১।১২, তথা ন দেশয়োগতোঽপ্যস্মাৎ; সাংখ্য০ ১।১৩**)। অতএব ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি এই তিনটি তত্ত্ব স্বরূপ থেকে ভিন্ন হয়েও দেশকালের অপেক্ষা ভিন্ন হতে পারে না। এই আধারে ত্রৈতবাদের সমন্বিত পরিভাষা এইপ্রকার দেওয়া যেতে পারে— যে দার্শনিক বিচারধারাতে ঈশ্বর, জীবাত্মা ও প্রকৃতি— এই তিন তত্ত্বকে অনাদি স্বীকার করা হয় এবং এই তিন তত্ত্ব নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্যের কারণে পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু দেশ (স্থান) ও কাল দ্বারা অভিন্ন, তাকে '**ত্রৈতবাদ**' বলে।